পার্থিব জীবনে

জান্নাতি সুখ

ড. খালিদ আবু শাদি

পার্থিব জীবনে জান্নাতি সুখ

ড. খালিদ আবু শাদি

রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি মহাবিশ্বের প্রতিপালক। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবির ওপর।

আশা ও ভয় মুমিনের দুই ডানা, যে দুটির ওপর ভর করে সে আখিরাতের আকাশে উড়াল দেয়। এ দুটির সাহায্যে সে নিজেকে নিয়ে যায় প্রতিটি প্রশংসিত স্থানে এবং অতিক্রম করে ফেলে কঠিন সব বাধা। ফলে জান্নাতের অভিমুখে পথচলায় তার গতিরোধ করতে পারে না প্রবৃত্তির চাহিদা কিংবা গাফিলতি। তার এবং তার গন্তব্যের মাঝখানে আড়াল হয় না প্রবৃত্তির আসক্তি ও মনোবাসনা।

মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে প্রচলিত একটি প্রশ্ন হচ্ছে :

ভয় ও আশা—এতদুভয়ের মধ্যে কোনটি উত্তম?

আবু হামিদ গাজালি ﷺ খুবই চমৎকার ও অলংকারিক ভাষায় তার উত্তর দিয়েছেন। বলেছেন :

‘এটা একটা অমূলক প্রশ্ন। এটা অনেকটা “রুটি ভালো নাকি পানি ভালো” বলার মতো। কেউ যদি প্রশ্ন করে, “রুটি ভালো নাকি পানি ভালো”, তাহলে এর উত্তরে বলা হবে, “ক্ষুধার্তের জন্য রুটি ভালো এবং পিপাসার্তের জন্য পানি ভালো। যদি কোনো ব্যক্তির ক্ষুধা ও পিপাসা দুইটাই লাগে, তখন দেখতে হবে ক্ষুধা বেশি নাকি পিপাসা বেশি। যদি ক্ষুধা বেশি হয়, তাহলে রুটি ভালো আর যদি পিপাসা বেশি হয়, তাহলে পানি ভালো। যদি দুইটাই সমান হয়, তাহলে দুইটাই সমানভাবে ভালো।”[১]

ভয় ও আশা দুজন জমজ ভাইয়ের মতো, কখনো একে অপর থেকে আলাদা হয় না। বরং আশা সম্পর্কিত যেসব ফজিলত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো একইসাথে ভয়ের ফজিলতও নির্দেশ করে। কারণ, এ দুটি একে অপরের

১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/১৬৪।

সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, যে ব্যক্তি প্রিয় বস্তুর আশা করে, সে একই সময় তার হারানোর ভয়ও করে। তার মাঝে যদি হারিয়ে ফেলার ভয় না থাকে, তাহলে সেটাকে ভালোবাসা বলা যাবে না এবং তার জন্য অপেক্ষা করাকেও আশা বলা যাবে না। সুতরাং এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রমাণিত যে, ভয় ও আশা একটির জন্য অন্যটি অপরিহার্য, কখনো একে অপর থেকে আলাদা হয় না।'[২]

এ জন্যই হারিস মুহাসিবি ﵀ আশার সংজ্ঞা দেওয়ার সময় আশা ও ভয়ের মাঝে পার্থক্য করেননি। আশার সংজ্ঞায় তিনি বলেন :

'আশা হলো, তুমি তোমার আমল কবুল হওয়ার এবং তার বিনিময়ে অধিক সাওয়াব পাওয়ার আশা রাখা এবং পাশাপাশি সে আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার অথবা অন্য কোনোভাবে আমল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ভয় করা।'[৩]

যদিও আমি আশা ও ভয়ের ব্যাপারে একই দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি, তা সত্ত্বেও এ বইয়ে আমি কেবল একটি দিকেরই পক্ষাবলম্বন করেছি। নিরপক্ষ অবস্থান নিইনি। এ বই ভয়ের ওপর আশাকে প্রাধান্য দেয় এবং ভীতিপ্রদর্শনের ওপর উদ্বুদ্ধকরণকে অগ্রাধিকার দেয়। খুব স্বল্পসংখ্যক দায়ি দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করে থাকেন। অধিকাংশ দায়ি ভয় নিয়ে কথা বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। পূর্ববর্তীদের অধিকাংশের কিতাবে তুমি ভীতিপ্রদর্শনকারী কথা বেশি দেখবে, রহমতের চেয়েআজাবের কথা বেশি পাবে, উত্তম পরিসমাপ্তির চেয়ে মন্দ পরিসমাপ্তির আলোচনা বেশি দেখবে এবং জান্নাতের চেয়ে জাহান্নাম সম্পর্কিত বর্ণনা অধিকহারে পাবে। এমনকি আমরাও যখন এ দুটি নিয়ে কথা বলি, তখন সাধারণত ভয়ের দিককেই বেশি প্রাধান্য দিই। বলি 'ভয় ও আশা', 'আশা ও ভয়' বলি না। অথচ আল্লাহর দ্বীন নম্রতা ও কঠোরতার মাঝামাঝি অবস্থান করে। আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিটির আলাদা মর্যাদা আছে। আর কেউ দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে চাইলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাকে বিজয়ী করেন। তাই মানুষ সর্বদা এমন ব্যক্তির মুখাপেক্ষী থাকে, যে তাদের নম্রতা ও মমতা দিয়ে রবের দিকে ডাকবে। ভালো কাজের প্রতি উৎসাহিত করবে।

২. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/১৬২।
৩. আদাবুন নুফুস : ১/৬৭-৬৮।

যারা আল্লাহর মর্যাদা না বুঝে তাঁর নাফরমানি করছে, তাদের বুঝিয়ে তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি করবে। সর্বোপরি, তাদের জন্য খুলবে আশার পাঠশালা, যেখানে শেখানো হবে ভালোবাসা ও লজ্জার পাঠ। সেই পাঠ পড়ে তাদের মনে আশার সঞ্চার হবে এবং নতুন করে তারা আল্লাহকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে।

বইটি সাধারণভাবে সবার জন্য লিখা হলেও, মৌলিকভাবে এটি দুই শ্রেণির লোককে সম্বোধন করে এবং তাদের সামনে তাদের মনোরোগের ব্যবস্থাপত্র পেশ করে।

এক. ওই পাপী, যার ওপর ভর করে আছে নৈরাশ্য। বছরের পর বছর পাপ করতে করতে তার অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, সে জান্নাত পাওয়াকে অলীক স্বপ্ন মনে করে এবং ক্ষমা পাওয়া অসম্ভব লক্ষ্য মনে করে।

এ বই তার মাঝে আশার সঞ্চার করবে এবং ক্ষমা ও জান্নাত পাওয়ার আশায় সে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হবে।

দুই. ওই ব্যক্তি, যে নফল আমলের ফজিলতের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে এবং ফরজ ইবাদতকেই যথেষ্ট মনে করে এবং অনেক সময় ফরজেও তার খামতি থেকে যায়।

এ বই তার মনে নফল আমলের প্রতি উৎসাহ জোগাবে। ফলে সে আমল থেকে ঝিমিয়ে পড়ার পরে আবার নবউদ্যমে আমল করতে শুরু করবে এবং আল্লাহর রহমতের চূড়ান্ত ধাপে পৌঁছানোর আশা লালন করবে।

মারিফাত বা আল্লাহর পরিচয় ব্যতীত প্রকৃত আশা হয় না। যে তার রবকে চিনে না, সে আশার আলো দেখতে পায় না। ফলে রবের প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে সে। এ বই তোমার সামনে আশার অদৃশ্য আলোকে দৃশ্যমান করবে। সে আলোয় তুমি দেখতে পাবে আল্লাহর অশেষ দয়া ও মেহেরবানি। অনুভব করবে তাঁর ভালোবাসা ও উদারতার বিশালতা। এ বইয়ে তুমি পড়বে বাস্তব জীবনের অনেক গল্প, সৎকর্মশীল মানুষের সাক্ষ্য, পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা। এমনকি সমসাময়িক কিংবা নিকট অতীতের অনেকের জীবনের

অভিজ্ঞতাও তুমি পড়বে এ বইয়ে। তাদের গল্প ও অভিজ্ঞতা তোমাকে আল্লাহর ভালোবাসার মিষ্টতা অনুভব করাবে। বাতলে দেবে শান্তি ও সুখের ঠিকানা।

এ বইয়ে আমি যে বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি, তা হচ্ছে পুণ্যকর্মের সৌন্দর্য। এটাই আশার প্রধান ফটক। এ সম্পর্কে কয়েক বছর আগে আমার একটি ছোট পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ভাবলাম, এ বিষয়ে আরও পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত বই বের করলে ভালো হবে। যেই ভাবা সেই কাজ, আমি এ বিষয়ের ওপর বিস্তৃত অধ্যয়ন শুরু করলাম। তারপর সবগুলোকে একত্রিত করে এক মোড়কে পাঠকদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। যাতে এটি পড়ে তাদের অন্তর থেকে নৈরাশ্য ও হতাশা বিদূরিত হয়ে আশার আলো উদ্ভাসিত হয়।

পাশাপাশি তোমার আশা যেন প্রবঞ্চনায় পরিণত না হয়, তার জন্য এতে আমি অন্তর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পুণ্যকর্মের বিভিন্ন নিদর্শন সংযুক্ত করেছি। ফলে তুমি শুধু পুণ্যকর্ম করেই আশায় বুঁদ হয়ে থাকবে না; বরং যাচাই করবে, তোমার পুণ্যকর্ম গৃহীত হচ্ছে কি না এবং যথাযথ পন্থায় আদায় হচ্ছে কি না? সব মিলিয়ে এ বইয়ে তুমি এমন কিছু পাথেয় পাবে, যা তোমার ইমান ও নেক আমলের যাত্রায় সহায়ক হবে।

পরিশেষে...

বইটির মূলপাঠ শুরু করার পূর্বে তোমার সামনে ইয়াহইয়া বিন মুআজ ﷺ-এর একটি সুসংবাদ শুনিয়ে দিই। তিনি প্রত্যেক তাওহিদবাদী ব্যক্তির জন্য খুবই চমৎকার ভাষায় আশা-জাগানিয়া একটি কথা বলেছেন :

'যদি কিছুক্ষণের তাওহিদ বিগত পঞ্চাশ বছরের গুনাহ মিটিয়ে দিতে পারে, তাহলে পঞ্চাশ বছরের তাওহিদ গুনাহসমূহের সাথে কী কী করতে পারে!?'[৪]

যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে প্রাণহীন জমিনে প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন, তিনি অবশ্যই আকাশ থেকে নুর প্রেরণ করে মৃত অন্তরকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন। তখন হৃদয় নতুন বসন্তের আগমনে গেয়ে উঠবে :

৪. কুতুল কুলুব : ১/৩৬৬।

'তুমি ঘটাতে পারো নতুন বসন্তের আগমন। তেমনই তুমিই পারো হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করতে। গুনাহের তাপে চৌচির হয়ে যাওয়া হৃদয় এখন হয়ে উঠবে সজীব ও উর্বর, যেভাবে শীতের বিদায়ের পর জমিন জীবন্ত ও সবুজাভ হয়ে ওঠে। প্রভু হে, তোমার কাছে আশা করতে পারে না এমন কেউ নেই। তোমার অনুগ্রহ যে সুবিশাল, সুবিস্তৃত!'

আল্লাহর কাছে আকুল আবেদন জ্ঞাপন করি, তিনি যেন আমার কথাগুলোকে রাসুল ﷺ-এর এই হাদিসের প্রতিধ্বনি বানান :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا، وَلَا تُنَفِّرُوا

> 'সহজ করো, কঠিন করো না এবং (লোকদের) সুসংবাদ দাও, আতঙ্কিত করো না।'[৫]

তাঁর কাছে ফরিয়াদ করি,

তিনি যেন এ বইকে শয়তানের সাথে আমাদের আজীবনের লড়াইয়ে সংহারক হাতিয়ার বানান। যেন এ বইকে সেসব দায়ির জন্য উত্তম পাথেয় বানান, যারা মাখলুককে সুসংবাদ দেন, তাদের অন্তরসমূহকে আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন।

যখন কবরে একাকী মাটির ওপর শুয়ে থাকব, তখন এ বই যেন আমার উপকারে আসে এবং মর্যাদাবৃদ্ধিতে কাজ দেয়। এ বই অনুযায়ী যারা আমল করবে, তাদের আমলের অসিলায় আমার জান্নাত যেন প্রশস্ত হয় এবং জান্নাতের নিয়ামত দেখে আমার হৃদয় যেন নেচে ওঠে।

সবশেষে তাঁর দরবারে আকুল আবেদন জানাই, তিনি যেন আমাকে এবং এ বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পাঠক, প্রকাশক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের তাঁর আরশের ছায়াতলে একত্রিত করেন এবং এর মাধ্যমে পাঠকের সামনে আশার সিঁড়ি উন্মুক্ত করে দেন।

- ড. খালিদ আবু শাদি

---

৫. সহিহুল বুখারি : ৬৯।
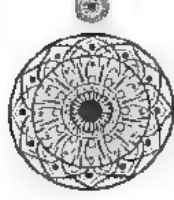
ইলমের জাকাত হলো প্রচার করা

এই বই তোমার জ্ঞানের ভান্ডারে নতুন মূলধন সংযোজন করবে। তোমাকে তার জাকাত আদায় করে দিতে হবে। ইলমের জাকাত সম্পর্কে ইবনে হিব্বান আল-বাস্তি বলেন :

'কোনো ব্যক্তি যখন ইলম অর্জন করে, তার উচিত সে ইলম দ্বারা অন্যকে উপকৃত করা। এতে ইলমে বরকত হয়। আমি আজ পর্যন্ত এমন কাউকে দেখিনি, যে ইলম নিয়ে কৃপণতা করে সে ইলম দ্বারা নিজে উপকৃত হয়েছে। পানি যতক্ষণ মাটির গর্ভে স্থির হয়ে থাকে, স্বর্ণ যতক্ষণ খনিতে পড়ে থাকে, দামি মুক্তা যতক্ষণ সাগরের গভীরে লুকিয়ে থাকে, ততক্ষণ সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। উপকার পেতে হলে সেগুলোকে বাইরে নিয়ে আসতে হয়। তদ্রূপ ইলম যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকে, তা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। উপকৃত হতে হলে ইলম প্রচার করতে হয় এবং তা দ্বারা মানুষের উপকার করতে হয়।'[৬]

তোমার ওপর আল্লাহর কী কী নিয়ামত অবতরণ করেছে?

হারিস মুহাসিবি ﷺ বলেন :

'যে ব্যক্তি তার ওপর আল্লাহর কী কী নিয়ামত আছে তা জানে না, সে তার পক্ষ থেকে আল্লাহর কাছে কী কী যাচ্ছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন হয়ে পড়ে।'[৭]

তুমি যদি জানতে না পারো, সকাল ও সন্ধ্যায় তোমার ওপর আল্লাহর কী কী নিয়ামত অবতীর্ণ হচ্ছে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তিনি কী কী উপকার তোমার জন্য করছেন, তাহলে ধরে নেবে তোমার কলব অন্ধ হয়ে গেছে। এই অন্ধত্ব

---

৬. রওজাতুল উকালা : পৃ. ৪১-৪২।

৭. আদাবুন নুফুস : পৃ. ১৭৬।

তোমাকে ভালো-খারাপের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ে বাধা সৃষ্টি করবে। জান্নাতি কাজ ও জাহান্নামি কাজে পার্থক্য নিরূপণ করতে বাধা দেবে। অন্তরের অন্ধত্বই সবচেয়ে খারাপ অন্ধত্ব। সুতরাং তোমার অন্তর যদি অন্ধ হয়ে যায়, তাহলে প্রতিমুহূর্তে কী কী আমল তোমার থেকে আল্লাহর কাছে যাচ্ছে, যা চিহ্নিত করতে সে ব্যর্থ হবে।

এই বই আল্লাহর সুপ্ত নিয়ামতের ওপর আলোর কিরণ ফেলবে, যাতে তুমি তা দেখতে পেয়ে তার মিষ্টতা অনুভব করতে পারো। তখন তুমি সে নিয়ামতের বিনিময়ে ভালো ভালো আমল আল্লাহর কাছে পাঠানোর প্রস্তুতি নিতে পারবে। তিনি যেমন তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তেমনই তুমি তাঁর কথা মান্য করে তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে পারবে। যেভাবে তিনি তোমাকে অন্য অনেকের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তেমনই তুমি তাঁকে সকল কিছুর ওপর অগ্রাধিকার দিতে পারবে।

একটি শর্ত

আমি এ বইয়ে যেসব কথার অবতারণা করেছি, সেগুলো যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে না পড়ো, তাহলে শুধু শুধু তোমার সময় নষ্ট হবে এবং আমার পরিশ্রম বৃথা যাবে।

আশার পাল্লা ভারী

হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا ابْنَ آدَمَ، قُمْ إِلَيَّ أَمْشِ إِلَيْكَ، وَامْشِ إِلَيَّ أُهَرْوِلْ إِلَيْكَ

'হে আদম-সন্তান, আমার জন্য দাঁড়াও, আমি তোমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসব। আমার দিকে হেঁটে হেঁটে এসো, আমি তোমার দিকে দৌড়ে যাব।'[৮]

৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৫৯২৫।

বইটি উপকারী নাকি ক্ষতিকর?

রাবি ﷺ বলেন, 'আমি শাফিয়ি ﷺ-কে একাধিকবার বলতে শুনেছি :

"যা মুখস্থ করা হয়েছে, তা ইলম নয়; ইলম হলো যা দ্বারা উপকার লাভ হয়েছে।"'[৯]

এ বই তখনই উপকারী হবে, যখন তুমি এখানে যা বলা হয়েছে, সে অনুযায়ী আমল করবে। তখন এই বই দ্বারা তুমি যেমন উপকৃত হবে, তোমার আশপাশের লোকেরাও উপকৃত হবে। তুমি উপকৃত হবে এ বই অনুযায়ী আমল করে এবং অন্যরা উপকৃত হবে তোমার ইলম ও আমলের প্রতি তাদের দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যমে।

সারকথা হলো, আমি এ বইয়ে যেসব কথার অবতারণা করেছি, সেগুলো যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে না পড়ো, তাহলে শুধু শুধু তোমার সময় নষ্ট হবে এবং আমার পরিশ্রম বৃথা যাবে।

সুধারণার সুফল

জুননুন মিসরি ﷺ বলেন :

'বান্দা আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখে, অথচ আল্লাহ তার প্রতি করুণা করেন না—এমনটা হওয়া অসম্ভব।'[১০]

কথা বেশি কাজ কম

একদা আবু জাফর মানসুর সুফইয়ান সাওরি ﷺ-কে তলব করলেন। সুফইয়ান সাওরি মহলে প্রবেশ করলে আবু জাফর তাঁকে বললেন, 'আমাকে উপদেশ দিন, হে আবু আব্দুল্লাহ।' তিনি বললেন, 'আপনি যা জানেন, সে অনুযায়ীই তো আমল করেন না। নতুন উপদেশ দিয়ে কী লাভ হবে?' এ কথা শুনে মানসুর লা-জবাব হয়ে গেলেন।[১১]

---

৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/১২৩।
১০. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/৩৮৪
১১. আল-ইকদুল ফারিদ : ১/৫৫।

রবের প্রতি সুধারণা রাখো

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন :

'সেই সত্তার শপথ—যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, বান্দা যদি আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখে, আল্লাহ তার ধারণা অনুযায়ী তাকে দান করেন। কেননা, সকল কল্যাণের ভান্ডার তো তাঁরই হাতে।'[১২]

বক্ষ্যমাণ বইটি তোমাকে যথাযথ পন্থায় আল্লাহর প্রতি সুধারণা লালন করতে শেখাবে। যথাযথ পন্থায় আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা মানে, উত্তম আমল ও চেষ্টা-মেহনতের সাথে আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা। আমল খারাপ, কিন্তু ক্ষমার আশা আছে—এমন সুধারণা নয়।

ভালোবাসার আসর

বিশিষ্ট ওয়ায়িজ মুহাম্মাদ বিন সুবাইব (যিনি ইবনুস সাম্মাক নামে পরিচিত) ﷺ-এর মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসলো, তখন তিনি বললেন :

'হে আল্লাহ, আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি জীবনে যত আসর ও মজলিশ কায়িম করেছি সবকটির উদ্দেশ্য ছিল মাখলুকের প্রতি আপনার ভালোবাসা কামনা করা এবং মাখলুকের মনে আপনার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করা।'[১৩]

এ বইটিকে তুমি ইবনুস সাম্মাকের পদ্ধতিতে পাঠ করো। মাখলুকের প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার আশায় এবং মাখলুকের মনে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে বইটি প্রচার-প্রসার করো। এর ফলে তোমার ও তোমার সঙ্গীদের পরিণাম উত্তম হবে।

---

১২. হুসনুজ জন : পৃ. ৯৬।
১৩. তারিখু বাগদাদ : ২/৪৪৯।

তোমার প্রতি বেশি অনুগ্রহশীল কে? তোমার রব, নাকি পিতামাতা?

সুফইয়ান সাওরি ﷺ বলেন :

'আমি এটা একদমই চাই না যে, আমার হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আমার পিতামাতার ওপর অর্পণ করা হোক। কেননা, আমার পিতামাতার চেয়ে আমার রব আমার প্রতি বেশি করুণাময়।'[১৪]

দুই প্রত্যাশার ব্যবধান

সৃষ্টির প্রতি আশা-ভরসা—সে যতই বড় আর শক্তিশালী হোক—তা মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, কোনো মানুষ অনেক সময় তোমার উপকারের কথা ভাবে; কিন্তু তা তার অজান্তে তোমার ক্ষতি করে বসে। কেউ তোমাকে সুখী করতে গিয়ে অসুখী করে দেয়। কেউ তোমার ভালো করতে গিয়ে খারাপ করে বসে। অনেক সময় তোমার কল্যাণ করার চেষ্টা করে; কিন্তু সফল হয় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর প্রতি আশা-ভরসা মানে মহা শক্তিশালীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন, যাঁকে কোনো কিছুই অপারগ করতে পারে না; অত্যন্ত উদার সত্তার কাছে আশা করা, যাঁর কাছে চেয়ে কেউ বঞ্চিত হয় না এবং দুআ করে খালি হাতে ফিরে না; এমন এক মহাজ্ঞানীর ওপর ভরসা করা, যিনিই একমাত্র জানেন, কীসে তোমার উপকার আর কীসে তোমার ক্ষতি।

একটি গুনাহ চাপা পড়ে যায় দুটি অনুগ্রহের মাঝে!

আলি ﷺ বলেন :

'যে ব্যক্তির গুনাহ আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে গোপন রেখেছেন, আখিরাতে সে গুনাহ ফাঁস করে দেওয়া আল্লাহর মহান উদারতার পরিপন্থী। আর যে ব্যক্তির গুনাহের কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতে শাস্তি দিয়েছেন, তাকে আখিরাতে দ্বিতীয়বার শাস্তি দেওয়া তাঁর ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের পরিপন্থী।'[১৫]

---

১৪. হুসনুজ জন : ১/৪৫।
১৫. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/১৫২।

হে পাপের আবরণে আচ্ছাদিত ভাই...

যার কল্যাণে তুমি রাত ও দিন অতিবাহিত করো, তাঁর গোপন অনুগ্রহ এবং সুন্দর কর্মগুলো নিয়ে চিন্তা করে দেখো! তুমি তাঁর প্রেমে পাগল না হয়ে থাকতে পারবে না। কী সুন্দর তাঁর ব্যবস্থা দেখো! তুমি পাপ করেছ; কিন্তু সে পাপ তিনি গোপন রেখেছেন! তার নামগন্ধও প্রকাশ হতে দেননি! ফলে মানুষ তোমার এমন প্রশংসা করেছে, যার যোগ্য তুমি নও। তারা জানতেই পারেনি, তোমার ভেতরে কদর্যতায় ভরা। এমন উদারতা ও অনুগ্রহ কোনো মানুষের কাছে কি আশা করতে পারো, যারা তোমার দোষ গোপন রাখে না, তোমার অপরাধ ক্ষমা করে না এবং তাদের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কোনো অবস্থার ওপর তুমি নিরাপদ বোধ করতে পারো না?

সত্য আশা ও মিথ্যা আশা

মুআজ বিন জাবাল ﷺ বলেন :

'অচিরেই কুরআন মানুষের মনে পুরাতন হয়ে যাবে, যেভাবে কাপড় পুরাতন হয়ে জীর্ণশীর্ণ হয়ে যায়। তারা কুরআন পড়বে; কিন্তু তাতে কোনো স্বাদ পাবে না। বাঘের অন্তরের ওপর ভেড়ার চামড়া পরাবে তারা। তাদের কাজ হবে শুধুই আশা করা। আশার সাথে ভয় মিশ্রিত থাকবে না তাদের মাঝে। আমলে অসম্পূর্ণতা রেখে তারা বলবে, "সামনে পুষিয়ে নেব।" আর বদ আমল করে বলবে, "আমাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে; কারণ, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করি না।"'[১৬]

প্রভুর উদারতা

হাসান বিন আলি ﷺ কাবার একটি খুঁটি আঁকড়ে ধরে বলেন :

'প্রভু হে, আপনি আমাকে নিয়ামত দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন; কিন্তু আমি কৃতজ্ঞতা আদায় করিনি। আপনি আমাকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন; কিন্তু আমি ধৈর্যধারণ করতে পারিনি। তা সত্ত্বেও আপনি আমার নিয়ামত ছিনিয়ে নেননি

১৬. আত-তাজকিরাহ বি আহওয়ালিল মাওতা ওয়াল আখিরাহ : ১/১২৩০।

এবং বিপদ স্থায়ী করেননি। কারণ, উদার সত্তা থেকে তো উদারতাই প্রকাশ পায় এবং নির্দয় সত্তা থেকে নির্দয়তাই প্রকাশ পায়।'[১৭]

আল্লাহই সকল কল্যাণের আধার

এক বেদুইন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাকে বলা হলো, 'তুমি তো মারা যাবে।' তিনি বললেন, 'মৃত্যুর পর আমাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে?' তারা বলল, 'আল্লাহর কাছে।' তিনি বললেন, 'তাহলে অসুবিধা কী? আমি তো তাঁর কাছেই যাচ্ছি, যাঁর কাছেই আছে সকল কল্যাণ ও অনুগ্রহ।'[১৮]

১৭. সিরাজুল মুলুক : ১/১০৯।
১৮. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৪৬৬।

বিপদের সময় দৃঢ়পদ থাকা

আল্লাহ বলেন, (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ) 'আমি মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।'[১৯] আমাদের প্রত্যেকে এ দুনিয়ায় বিপদগ্রস্ত। পঙ্কিলতার আলয়ে পরিচ্ছন্নতা কামনা করে যে, সে এ আলয় চিনে না এবং এখানে থাকার যোগ্য নয়। তবে হে মুমিন, তোমার ইমান তোমাকে রক্ষা করেছে এবং পূর্বের কৃতিত্ব তোমাকে মুক্তি দিয়েছে। ফলে পেরেশানি ও দুর্যোগের ঝড় তোমার পরোপকারের শিলাখণ্ডের ওপর আছড়ে পড়ে গতি হারিয়েছে। ফলে অন্যরা যখন হতাশায় কাঁদে, তুমি তখন সফলতার হাসি হাসো। তোমার হৃদয়মন তখন শান্ত ও স্থির থাকে।

এটা সেই স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা, যেটাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দার ভীতি ও অস্থিরতার সময় তার অন্তরে ঢেলে দেন। এটা প্রথমে হৃদয়ে অনুভূত হয়। পরবর্তী সময়ে তা শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কঠিন বিপদের মুহূর্তেও তার তনুমন এক আশ্চর্যজনক নিশ্চিন্ততা ও প্রশান্তিতে অবগাহন করে। এই প্রশান্তি তখনই অর্জিত হয়, যখন বান্দা বিপদ-বিপর্যয়কে তার গুনাহের কাফফারা মনে করে। মর্যাদা বৃদ্ধিকারী এবং পাপের পঙ্কিলতা থেকে পবিত্রতা দানকারী মনে করে। এই প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা অর্জন করেছিলেন বলেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বন্দীর শিকলে আবদ্ধ থাকাবস্থাতেও এমন উক্তি করতে পেরেছিলেন, যা দুশমনদের হিংসার অনলে ঘি ঢেলে দিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন :

'শত্রুরা আমার কীই বা ক্ষতি করবে?! আমার জান্নাত আমার হৃদয়ে। আমার সাথে আছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবির সুন্নাহ। যদি তারা আমাকে হত্যা করে, সেটা হবে আমার জন্য শাহাদাত। যদি বন্দী করে রাখে, তা হবে আমার জন্য রবের সাথে একান্তে সময় কাটানোর সুযোগ। প্রকৃত রুদ্ধ তো সেই, যে

---

১৯. সুরা আল বালাদ, ৯০ : ৪।

নিজের রব থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রকৃত বন্দী সেই, যে নিজের প্রবৃত্তির কাছে বন্দী হয়ে আছে।'

বন্দিশালার মধ্যে তিনি বলতেন :

'যদি আমি এই দুর্গ পরিমাণ স্বর্ণ দান করি, তবুও বন্দিত্বের এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না। আমার শত্রুরা আমাকে বন্দী করার মাধ্যমে আমার জন্য যে কল্যাণের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তার প্রতিদান দেওয়ার সাধ্য আমার নেই।'

গ্রেফতার করার পর যখন তাঁকে প্রাচীরঘেরা বন্দিশালায় আবদ্ধ করা হলো, তখন তিনি প্রাচীরের দিকে তাকিয়ে তিলাওয়াত করলেন :

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ

> 'অতঃপর উভয় দলের মাঝখানে খাড়া করা হবে একটি প্রাচীর, যার একটি দরজা হবে। তার অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আজাব।'[২০]

তাঁর এই চমৎকার ইমানি শক্তির বর্ণনা দিয়েছেন তাঁরই সুযোগ্য শাগরিদ ইবনুল কাইয়িম ﵀। তিনি এটাকে জান্নাতের পূর্বে জান্নাত এবং সর্বমহান নিয়ামতের পূর্বে মহান নিয়ামত বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন :

'আল্লাহর ইলমের কসম, আমি তাঁর চেয়ে উত্তম জীবনযাপন করতে কাউকে দেখিনি। অথচ তাঁর জীবন ছিল নানা প্রতিকূলতা ও সংকীর্ণতায় ভরা। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতার উপকরণ তাঁর ছিল না। দুঃখ-দুর্দশা ও অভাব-অনটনের উপকরণে ভরা ছিল তাঁর জীবন। এসব ছাড়াও বন্দিত্ব এবং বিভিন্ন দিক থেকে হুমকি-ধমকি ও কষ্ট পাওয়া ছিল তাঁর জীবনের নিয়মিত রুটিন। এতসব সত্ত্বেও তাঁর জীবন ছিল সর্বাধিক সুন্দর, তাঁর মন ছিল সবচেয়ে নিশ্চিন্ত, প্রশান্ত ও আনন্দিত। তাঁর মনোবলও ছিল অন্য সবার চেয়ে শক্তিশালী। প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততার দ্যুতি ঠিকরে বের হতো তাঁর চেহারা থেকে। যখন চারিদিক থেকে

---

২০. সুরা আল-হাদিদ, ৫৭ : ১৩।

দুশ্চিন্তা ও ভীতি আমাদের গ্রাস করে নিত এবং আমরা মানুষের ভুল ধারণার শিকার হওয়ার কারণে পৃথিবী আমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসত, তখন আমরা তাঁর কাছে যেতাম। তাঁকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে আমাদের সকল পেরেশানি ও দুশ্চিন্তা এক নিমিষেই গায়েব হয়ে যেত। মনে অনুভব করতাম এক অপার্থিব প্রশান্তি ও সুদৃঢ় মনোবল।

পবিত্র সে সত্তা, যিনি তাঁর বান্দাদের মৃত্যুর পূর্বেই জান্নাতের সুখ আস্বাদন করান এবং আমলের ঘর দুনিয়াতেই তাদের জন্য জান্নাতের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেন। ফলে যতক্ষণ তারা আমলে মগ্ন থাকেন, জান্নাতের মৃদুমন্দ বাতাস ও সুবাসে তারা সুবাসিত হতে থাকেন।'[২১]

তিনি তাঁর জীবনে এমন কঠিন কঠিন বিপদের মুখোমুখি হয়েছেন, কোনো লোহা যদি তার মুখোমুখি হতো, তাহলে মোমের মতো গলে যেত; টগবগে যুবক এমন বিপদের মুখোমুখি হলে বুড়ো হয়ে যেত।

বলা হয়ে থাকে, তিনি আজীবন এক বিপদ থেকে অন্য বিপদে, এক বিপর্যয় থেকে আরেক বিপর্যয়ে স্থানান্তরিত হয়েছেন। তবে তাঁর নেক আমলের বরকত তাঁকে কঠিন বিপদের সময়ে অবিচল থাকার পাথেয় জুগিয়েছে। যেন দুঃখের পরে সুখ আসে—নামক পুস্তিকাটি তিনি ইন্দ্রিয় ও বিবেক-বুদ্ধি সব নিয়ে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। এভাবে সত্যিই একসময় তাঁর দুঃখ লাঘব হয়েছিল, দূরীভূত হয়েছিল বিপদের কালো মেঘ।

এ জন্যই বলা হয়, বিপদের মুখোমুখি হওয়া ছাড়া বান্দার ইমানের পরীক্ষা হয় না এবং অন্তরের গোপন অবস্থা প্রকাশিত হয় না। ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

'মনের ভেতরের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয় বিপদের মুহূর্তে।'[২২]

সম্ভবত তাঁর নানামুখী পুণ্যকর্মের কারণে তাঁকে কেন্দ্র করে একটি অলৌকিক কারামাত প্রকাশ পেয়েছিল। তা হচ্ছে : তিনি যখন মিসরের কারাগারে বন্দী ছিলেন, তখন একটি মুসলিম জিন তাঁর আকৃতি ধারণ করে দামেস্কে তাঁর

---

২১. আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব : পৃ. ৪৮।
২২. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৩/৯২-৯৩।

ভূমিকা পালন করেছিলেন। চলুন, অদ্ভুত সেই ঘটনাটি সরাসরি ইমামের জবানিতেই শুনি :

'যখন আমি মিসরের কারাগারে বন্দী ছিলাম, তখন হুবহু আমার মতো এক ব্যক্তি উত্তর অঞ্চলে তাতারিদের নিকট যাওয়া-আসা করছিল। লোকটি নিজেকে ইবনে তাইমিয়া বলে পরিচয় দিচ্ছিল সবাইকে। সেখানকার আমিরের সন্দেহ হলো। কারণ তখন আমি বন্দী ছিলাম। তাই সে মিসরে প্রতিনিধি পাঠাল যাচাই করার জন্য। আমাকে মিসরে বন্দী দেখে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ল। আসল কাহিনি হলো, তাতারিরা যখন দামেস্কে আগমন করত, তখন আমি তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতাম। তাদের কেউ কালিমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে সাধ্য অনুযায়ী খাবারদাবার দিয়ে আপ্যায়ন করতাম। যখন আমি বন্দী হয়ে মিসরে চলে আসলাম, তখন একটি জিন আমার আকৃতি ধারণ করে আমার ভূমিকা পালন করতে শুরু করল। সে আমার ভক্ত ছিল। তার ধারণা অনুযায়ী সে এভাবে আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছিল। তা ছাড়া আমার আকৃতিতে কাজ করলে মানুষ মনে করবে, স্বয়ং আমিই এসব করছি। ফলে কাজ অধিক ফলপ্রসূ হবে।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর কিছু লোক আমাকে বলল, "আপনি লোকটিকে জিন বলছেন কেন? ফেরেশতাও তো হতে পারে?" তখন আমি বললাম, "না। সে কোনোভাবেই ফেরেশতা হতে পারে না। কারণ, ফেরেশতারা মিথ্যা বলেন না। অথচ লোকটি জেনেশুনে নিজেকে ইবনে তাইমিয়া বলে পরিচয় দিয়েছিল।"'[২৩]

স্বাধীন বন্দী

এই যে অন্তরের প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা—এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ নিয়ামত ও গুপ্ত অনুদান। এটা এমন এক মূল্যবান সম্পদ, যা বস্তুবাদীরা অনুভবই করতে পারে না। তবে যখন তাদের কর্মের দরুন তাদের ওপর বিপদ আসে অথবা তাদের আবাসের আশপাশে বিপদ আপতিত হয়, তখন বস্তুবাদীরাও আত্মিক প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততার মর্ম ও মাহাত্ম্য বুঝতে পারে। কিন্তু

---

২৩. মাজমুউল ফাতাওয়া : ২০/৯।

মুমিনের হৃদয়ে এই গুণটি বদ্ধমূল হয়ে থাকে, বিপদ ও দুর্দশা যতই কঠিন ও জটিল হোক। এমনকি তাদের অনেকে হাতে-পায়ে শিকলাবদ্ধ হয়েও আলি বিন জাহামের মতো উচ্চকণ্ঠে গায় :

'আমি বন্দী হয়েছি, তবে এই বন্দিত্বই আমার শেষ নয়, প্রতিটি ধারালো তরবারি কিছু সময় খাপবদ্ধ থাকে। পূর্ণিমার চাঁদ কিছুদিন ক্রমশ হ্রাস পায় ঠিকই; কিন্তু কিছুদিন পর নতুন আঙ্গিকে আবার ফিরে আসে। জেলবন্দীর মনে যদি অধৈর্যের কদর্যতা না থাকে, তাহলে জেলখানা তার জন্য গোলাপশোভিত একটি মহল। যে মহল মর্যাদাবানের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। যেখানে শুভাকাঙ্ক্ষীরাই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে, তাকে কারও কাছে যেতে হয় না।'

অন্তরসমূহের চাবি একমাত্র আল্লাহর হাতেই আছে। তিনিই মুমিনের অন্তরে এই অপার্থিব প্রশান্তি সঞ্চার করেন। ফলে বন্দিশালা হয়ে যায় তার কাছে বিনোদনপার্ক। বন্দিত্ব হয়ে ওঠে উপভোগ্য নির্জনতা। শিকল-বেড়ির ঝনঝনানি তার কানে বাঁশির সুরের মতো বাজে।

হীরার দীপ্তি

সময়ের পরিক্রমায় মানুষ নানাবিধ সমস্যা ও বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। এটাই দুনিয়ার নীতি। দুনিয়ার এই পঙ্কিলতা কখনো সাফ হবে না। তখন আমাদের অনেকেই খেয়া হারিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। কেউ প্রবল ঝড়ের সামনে সুউচ্চ পাহাড় ও সুদৃঢ় ঢেউয়ের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। এই শক্তি তারা মনের ভেতর থেকে পায়, যা একজন ব্যক্তি তার দীর্ঘ ইমানি সফর থেকে অর্জন করে এবং প্রভুর সাথে সম্পর্ক ও তাঁর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টির মাধ্যমে পোক্ত করে নেয়।

বিপদ একটি তুফান, যা মানুষের অন্তরে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। যে হৃদয়ের রবের সাথে দৃঢ় সম্পর্ক থাকে, এই তুফানে সে হৃদয় ভেঙে পড়ে না। যে হৃদয় দুর্বল, তা মুসিবতের গলনাধারে গলে যায় এবং জানবাজি রাখার ময়দানে ব্যর্থতা স্বীকার করে পরাজয় মেনে নেয়।

এ জন্যই তো বলা হয়, ইবাদত ও আনুগত্য একটি গুপ্ত সম্পদ, বিপদের আগুনে প্রজ্বলিত হওয়া ব্যতীত তার দীপ্তি প্রকাশ পায় না। বান্দা ইবাদতের প্রকৃত মূল্য তখনই অনুধাবন করতে পারে, যখন তার খারাপ সময় আসে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট, উত্তম ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। তিনি ইরশাদ করেন :

مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلٰى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّٰى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّبِ

'নাপাককে পাক থেকে পৃথক করে দেওয়া পর্যন্ত আল্লাহ এমন নন যে, ইমানদারগণকে সে অবস্থাতেই রাখবেন, যাতে তোমরা রয়েছ।'[২৪]

জামাখশারি আল্লাহর এই নীতির ব্যাখ্যায় বলেন :

'আল্লাহ তাআলা তোমাদের মিশ্রিত অবস্থায় রেখে দেন না; বরং উত্তম ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে দেন। তা এভাবে যে, তোমাদের ওপর তিনি এমন কঠোর বিধান আরোপ করেন, যার ওপর কেবল আল্লাহর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ নিষ্ঠাবান বান্দারাই ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে পারেন যেমন : জিহাদে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া, আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করা ইত্যাদি। এ পরীক্ষা তোমাদের মনের আকিদা-বিশ্বাসের মাপকাঠি এবং হৃদয়ের গোপন অবস্থার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসেবে হাজির হয়। ফলে তোমরা একজন অপরজনের মনের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারো। তবে তা দলিলের ভিত্তিতে; মনের অবস্থা জানার যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। কারণ এ যোগ্যতা একচেটিয়াভাবে কেবল আল্লাহরই আছে।'[২৫]

নিরাপত্তা ও সুস্থতার সময় সব মানুষ একসমান। যখন বিপদ-বিপর্যয় ও অসুস্থতার আঘাত আসে, তখন বিভিন্ন বর্ণ, প্রকার ও শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তি তাদের কৃত আমল অনুযায়ী হয়। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে হাসান বসরি ﷺ এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন :

---

২৪. সুরা আলি ইমরান, ৩ : ১৭৯।
২৫. আল-কাশশাফ : ১/৪৪৫।

'ভালো সময়ে সকল মানুষ সমান থাকে। যখন খারাপ সময় আসে, তখন তাদের মাঝে স্পষ্টরূপে পার্থক্য প্রতিভাত হয়।'[২৬]

দৃঢ় বিশ্বাস বিপদের প্রতিষেধক

নিশ্চিন্ততা অন্তরের সুদৃঢ় বিশ্বাসের ফসল, আমাদের মাঝে যার বীজ বপন করেছেন নবিজি ﷺ। অতঃপর তিনিই তার পরিচর্যা করেছেন, তাকে শক্ত করেছেন। ফলে তা পুষ্ট হয়েছে এবং স্বীয় কাণ্ডের ওপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে। সাহাবিদের সাথে প্রতিদিনের দেখা-সাক্ষাতে রাসুল ﷺ তাঁদের বিশ্বাসের পরিচর্যা করতেন। তার একটি চমৎকার নিদর্শন দেখো নিচের গল্পে :

রাসুল ﷺ-এর প্রতিদিনকার মজলিশে সাহাবিদের একটি দল উপস্থিত থাকতেন। তাঁদের একজন প্রতিদিন মজলিশে আসার সময় নিজের শিশুসন্তানকে পিঠে বহন করে নিয়ে আসতেন এবং তার সামনে বসাতেন। একদিন শিশুটি মারা গেল। ছেলের শোকে লোকটি মজলিশে আসাই ছেড়ে দিলেন। রাসুল ﷺ তার অনুপস্থিতি টের পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, অমুককে দেখতে পাচ্ছি না কেন?' তাঁরা জানালেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, তার ছেলেটি মারা গেছে।'

রাসুল ﷺ লোকটির সাথে দেখা করে তার ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি ছেলের মৃত্যুসংবাদ জানালে রাসুল ﷺ তাকে সান্ত্বনা দিলেন। অতঃপর বললেন :

'হে ভাই, তুমি কোনটা চাও? তুমি কি এটাই চাও যে, তার দ্বারা এ জীবনে উপকৃত হবে, না এটা চাও যে, আগামীকাল তুমি জান্নাতে গিয়ে তাকে জান্নাতের ভেতরে তোমার জন্য দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে?'

লোকটি বললেন, 'হে আল্লাহর নবি, আমি চাই যে, সে আমার আগে জান্নাতে গিয়ে আমার জন্য দরজা খুলে দেবে।'

---

২৬. সাইদুল খাতির : পৃ. ২৮৪।

রাসুল ﷺ বললেন, 'এটাই হবে।'[২৭]

সুবহানাল্লাহ, কী চমৎকার পরিচর্যা! এভাবেই তিনি গড়ে তুলেছিলেন মানবেতিহাসের শ্রেষ্ঠ প্রজন্মকে। তাদের মনে গেঁথে দিয়েছিলেন, এখানে যা হারিয়েছে ওখানে তা অনেকগুণে লাভ করবে। আজকে যত কষ্ট পাচ্ছে, তার বিনিময়ে আগামীকাল সুখ-শান্তিতে ভরে উঠবে। দুনিয়ার একাকিত্ব ও নির্জনতার বিনিময়ে আখিরাতে মিলবে উত্তম সঙ্গীদের সাহচর্য।

প্রকৃত মুমিনের মনে বিপদের মুহূর্তে উক্ত মানসিকতাই কাজ করে। যার মধ্যে এ মানসিকতা অনুপস্থিত, বিপদের মুহূর্তে সে ভেঙে পড়ে। দুঃখের পরে সুখের আগমনকে সে অনেক দূরে মনে করে। এভাবে কঠিন মুহূর্তে অনেক সময় নিজের মহামূল্যবান ইমানটাই হারিয়ে ফেলে।

একজন ভালো মুসলিম এবং একজন পাপিষ্ঠ মুসলিম—বিপদ তাদের দুজনের মধ্যে কেমন ক্রিয়া করে এবং দুঃখ-দুর্দশাকে তাদের কে কেমন চোখে দেখে, তার তুলনামূলক বর্ণনা দিয়েছেন বিপদ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সাহাবি আম্মার বিন ইয়াসির ؓ :

'একজন প্রকৃত মুসলিম যখন বিপদে আক্রান্ত হয়, তখন তার গুনাহসমূহ গাছের পাতার মতো ঝরে যায়। পক্ষান্তরে একজন কাফির অথবা পাপিষ্ঠ মুসলিম যখন বিপদে পড়ে, তার অবস্থা হয় বিচারবুদ্ধিহীন প্রাণীর মতো—যাকে বেঁধে রাখা হলে বুঝতে পারে না কেন বাঁধা হলো, ছেড়ে দেওয়া হলে বুঝতে পারে না কেন ছেড়ে দেওয়া হলো।'[২৮]

তেমনিভাবে পাপিষ্ঠ ব্যক্তি অনুভব করতে পারে না, কেন তার ওপর বিপদ এসেছে আর কেনই বা তা তুলে নেওয়া হয়েছে। তার অন্তর্চক্ষু অন্ধ। বিপদ সম্পর্কে তার বিশ্লেষণ যথার্থ নয়। দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদকে সে দুনিয়ার মানদণ্ডে পরিমাপ করে। এর সাথে আখিরাতের সংশ্লিষ্টতা সে দেখতে পায় না। অপরদিকে একজন প্রকৃত মুসলিম তার সম্পূর্ণ বিপরীত।

---

২৭. সুনানুন নাসায়ি : ২০৮৮।
২৮. শুআবুল ইমান : ১২/৩১১।
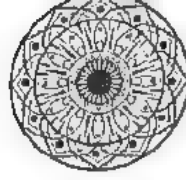
আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব

তুমি তাঁর সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছ, তিনিও তোমার সাথে বন্ধুত্ব করেছেন। তুমি তাঁকে অগ্রাধিকার দিয়েছ, তিনিও তোমাকে অন্যদের চেয়ে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিয়ামত দান করেছেন। তবে তাঁর সাথে তোমার বন্ধুত্ব এবং তোমার সাথে তাঁর বন্ধুত্ব, তাঁর প্রতি তোমার অনুদান এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুদান—এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এমনকি তুমি যা করতে পেরেছ, তাও তাঁর অনুগ্রহেই করতে পেরেছ। তবুও তিনি তোমাকে তার প্রতিদান দিয়েছেন। ফলে তোমার অনুগ্রহ তাঁর অনুগ্রহের নিচে চাপা পড়ে গেছে। তুমি হেঁটে হেঁটে তাঁর দিকে গিয়েছ, তিনি দৌড়ে এসে তোমায় বরণ করে নিয়েছেন।

সহিহ বুখারিতে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেন :

> مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ،
>
> "যে ব্যক্তি আমার কোনো বন্ধুর সাথে শত্রুতা করবে, তার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হলো তা, যা আমি তার ওপর ফরজ করেছি। (অর্থাৎ ফরজের দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করা আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।) আর আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমেও আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে,

পরিশেষে আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শোনে; তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে; তার হাত হয়ে যাই, যা দ্বারা সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। আর সে যদি আমার কাছে কিছু চায়, আমি তাকে দিই এবং সে যদি আমার আশ্রয় চায়, আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় দিই।...'[২৯]

বিস্ময়কর এক হাদিস! যেখানে অল্প কয়েকটি শব্দে পূর্ণাঙ্গ ইমানের সকল দিক তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমে ইমানের সর্বোচ্চ স্তরের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে যে, তা আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব। অতঃপর উন্নত অলংকারিক ভাষায় বললেন, এই স্তরে পৌঁছানোর পথ হলো, ফরজ ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করা এবং নফলের প্রতি যত্নবান হওয়া। তারপর উক্ত স্তরে উপনীতদের পুরস্কারের ঘোষণা দিয়ে বললেন যে, তারা আল্লাহর ভালোবাসা লাভ করবেন। এরপর বলা হয়েছে যে, এই ভালোবাসা লাভ করার পর তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঠিক কর্মসম্পাদনকারী হয়ে যাবে। এরপর বলা হলো, তাদের জন্য আরও একটি চমৎকার পুরস্কার রয়েছে। সেটি হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাদের দুআ কবুল করবেন।

কারা সেই বাছাইকৃত দল? কারা সেই কামেল মহাপুরুষ? আরবি ভাষায় তাদের 'অলি' বলা হয়েছে। 'অলি'র দুটি অর্থ রয়েছে :

এক. আরবি الوَلْي (ওয়ার মধ্যে জবর এবং লামের মধ্যে সুকুন)-এর অর্থ, নৈকট্য। এ অর্থ হিসেবে শহরের তত্ত্বাবধায়ককে আরবিতে 'ওয়ালিল বালাদ' বলা হয়। অনুরূপভাবে এতিমের দায়িত্বশীল, প্রতিবেশী, সন্তানের পিতা ও অভিভাবককেও 'অলি' বলা হয়। সুতরাং এ অর্থ হিসেবে 'অলি' হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করেছেন। ওই ব্যক্তিই বাদশাহর নিকটবর্তী হতে পারে, যে সর্বাবস্থায় তার আনুগত্য করে। এমনকি নিজের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে হলেও তার আদেশ মেনে চলে। ফলে নিজের স্বার্থের ওপর বাদশাহর স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। বিনিময়ে সে বাদশাহর প্রিয়ভাজনে পরিণত হয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনের ধারক-বাহকদের নিজের আপনজন ও বিশেষ লোক

২৯. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২।

বলে অভিহিত করেছেন। তাদের কাছে টেনে নিয়েছেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন নিয়ামত দানে ভূষিত করেছেন, যেন তারা তাঁর একান্ত আপনজন।

দুই. 'অলি' অর্থ সাহায্যকারী। কোনো কিছুর 'অলি' বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে তার হিফাজত করে এবং তার থেকে অনিষ্টকে দূর করে। যেমন, আমাদের রব বলেন :

وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

'বস্তুত, তিনিই সাহায্য করেন সৎকর্মশীল বান্দাদের।'[৩০]

আল্লাহ তাআলা এই শ্রেণির লোকদের দেখাশোনা করেন। এক পলকের জন্যও তাদেরকে নিজেদের জিম্মায় ছেড়ে দেন না। যখন তোমার প্রভু তোমার দেখাশোনা করবেন, তখন কারও কি সাধ্য আছে তোমার ক্ষতি করার? বিশেষ করে বিপদ ও দুর্যোগের সময় যদি তিনি তোমার তত্ত্বাবধান করেন, তাহলে আর ভয় কীসের? এটাই উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-কে নিশ্চিন্ত ও নির্ভার রেখেছিল, যখন তাঁর জীবন-সায়াহ্নে মাসলামা বিন আব্দুল মালিক তাঁকে বলেছিলেন :

'আমিরুল মুমিনিন, যদি আপনি আমার ব্যাপারে অথবা আপনার সন্তানদের মধ্যে আমার সমকক্ষ যারা আছে, তাদের কারও ব্যাপারে (পরবর্তী খলিফা নির্বাচন বিষয়ে) অসিয়ত করে যেতেন!'

তিনি তাঁকে ধরে বসিয়ে দিতে বললেন। অতঃপর বললেন, 'তুমি তাদের ব্যাপারে আমাকে অসিয়ত করে যেতে বলছ। কিন্তু আমি তাদের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর সোপর্দ করেছি, যিনি কিতাব নাজিল করেছেন এবং সৎকর্মশীলদের দেখাশোনা করেন। আমার সন্তানরা হয়তো এমন ব্যক্তির মতো হবে, যে আল্লাহকে ভয় করে, তখন আল্লাহই তাদের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। অথবা পাপে নিমজ্জিত ব্যক্তির মতো হবে, তখন আমি তাদের কাউকে খলিফা বানানোর অসিয়ত করে তার পাপের শক্তি জোগাব না।'[৩১]

---

৩০. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ১৯৬।
৩১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৩৭১।

এই শ্রেণির লোকদের আল্লাহ তাআলা এমন মর্যাদা দান করেছেন, যা অন্য কাউকে দেননি। তাদের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের শত্রুদের নিজের শত্রু বলে আখ্যায়িত করেছেন। শুধু এতটুকুই নয়, বরং...

তারা কারও প্রতি রাগান্বিত হলে তিনিও তার প্রতি রাগান্বিত হন!

একদা আবু বকর ﷺ বিলাল, সুহাইব ও সালমান ﷺ-এর পাশ দিয়ে গমন করলেন। আবু বকরের সাথে আবু সুফইয়ান ছিলেন। আবু সুফইয়ান তখনও কাফির ছিলেন। সময়টা ছিল হুদাইবিয়া-সন্ধি পরবর্তী যুদ্ধবিরতির সময়। আবু সুফইয়ানকে দেখে এই তিনজন নির্যাতিত মুসলিমের মনে পড়ে গেল, মক্কায় থাকতে তাঁদেরকে আবু সুফইয়ান কী কী কষ্ট দিয়েছিলেন সব তাই তাঁরা তাকে সম্বোধন করে বললেন, 'মুসলিমদের তরবারি এখনো আল্লাহর শত্রুর ঘাড় থেকে যা নেওয়ার তা নেয়নি (অর্থাৎ তোমার হিসাব এখনো বাকি আছে)।' এতে আবু বকর ﷺ রেগে গেলেন। কারণ তিনি উত্তম আচরণের মাধ্যমে আবু সুফইয়ানকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইছিলেন। কোনো কটু কথা বলে তাকে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করতে চাইছিলেন না। তাই তিনি রাগতকণ্ঠে তাঁদের বললেন, 'একজন কুরাইশ নেতা ও সম্মানিত ব্যক্তিকে এমন কথা বলা তোমাদের উচিত হয়নি।' অতঃপর রাসুল ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ উল্টো আবু বকর ﷺ-কে বললেন, 'হে আবু বকর, তুমি (তাঁদের শাসিয়ে) যদি তাঁদেরকে রাগান্বিত করে থাকো, তাহলে তোমার রবকেও রাগান্বিত করেছ!'[৩২]

কী সে বিষয়, যা মানুষকে এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, সে রাগান্বিত হলে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হন; অথচ আল্লাহর রাজত্বে অণু পরিমাণ কারও অংশ নেই। মাখলুকের মধ্য থেকে কেউই তাঁর সামান্যতম সাদৃশ্য রাখে না!? হ্যাঁ, এটা সেই মর্যাদা, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য নিবেদিতপ্রাণ

৩২. দেখুন, সহিহু মুসলিম : ২৫০৪, মুসনাদু আহমাদ : ২০৬৪০।

প্রিয় বান্দাদের দান করেন, যারা তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টিকে সকল কিছু থেকে অগ্রাধিকার দেন।

রাসুল ﷺ-এর মুখ থেকে এমন বাক্য শোনার সাথে সাথেই আবু বকর ؓ তাঁদের কাছে ছুটে আসলেন। এসে বললেন, 'ভাইয়েরা, আমার কথায় কি তোমরা রাগ করেছ?' তাঁরা বললেন, 'না। আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন, প্রিয় ভাই।'[৩৩]

আল্লাহর বন্ধুদের মধ্যে অনেকের অবস্থা এমন যে, তাদের কোনো শান-শওকত ও আড়ম্বরপূর্ণ বেশভূষা থাকে না। থাকে না কোনো সম্পদ ও পদবি। মানুষের ভিড়ে তারা অজ্ঞাত ও অখ্যাত হয়ে থাকেন। কেউ তাদের তেমন চেনে না। তবে ঊর্ধ্বলোকের বাসিন্দাদের কাছে তারা সুখ্যাত। সৃষ্টির মানদণ্ডে তাদের ওজন হালকা হলেও স্রষ্টার মানদণ্ডে তারা ভারী। আবু উমামা ؓ থেকে বর্ণিত নবিজির হাদিসে কেমন ব্যক্তিকে আল্লাহর সর্বোত্তম বন্ধু ও সর্বাধিক নিকটতর বান্দা বলা হয়েছে দেখো :

রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لَمُؤْمِنٌ خَفِيفُ الْحَاذِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ، أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السِّرِّ، وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ»، ثُمَّ نَقَرَ بِإِصْبَعَيْهِ فَقَالَ: «عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهُ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ قَلَّ تُرَاثُهُ»

'আমার বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঈর্ষার যোগ্য সেই মুমিন ব্যক্তি, যার অবস্থা খুবই হালকা (ধন-সম্পদ এবং পরিবারের সদস্যসংখ্যা কম) এবং যে নামাজে মনোযোগী, সুচারুরূপে তার প্রভুর ইবাদত করে, একান্ত নিভৃতেও তাঁর অনুগত থাকে, মানুষের মাঝে অখ্যাত, তার দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করা হয় না। ন্যূনতম প্রয়োজনমাফিক তার রিজিক, তাতেই ধৈর্যধারণ করে।'

---

৩৩. সহিহ মুসলিম : ২৫০৪।

তারপর রাসুল ﷺ তাঁর হস্তদ্বয় দিয়ে ইঙ্গিত করে বললেন, 'অল্পসময়ে তার মৃত্যু হয়। তার জন্য ক্রন্দনকারীর সংখ্যা কম হয়, তার রেখে যাওয়া সম্পদও হয় খুব সামান্য।'[৩৪]

তাদের যারা কষ্ট দেয়, তাদের থেকে তিনি প্রতিশোধ নেন

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀-এর বিশিষ্ট ছাত্র ইমামুস সুন্নাহ আহমাদ বিন নাসর-এর সাথে যারা শত্রুতা করেছিল, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রত্যেকের থেকে বদলা নিয়েছেন। বিস্ময়কর উপায়ে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন।

তা এভাবে যে, খলিফা ওয়াসিক বিল্লাহ আহমাদ বিন নাসরকে হত্যা করার পর থেকে বুকের মধ্যে তীব্র ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। তখন আরেক হত্যাকারী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক আজ-জাইয়াত তার কক্ষে প্রবেশ করল। ওয়াসিক তাকে বললেন, 'হে আব্দুল মালিকের ছেলে, আমি বুকের মধ্যে আহমাদ বিন নাসর হত্যাকাণ্ডের শাস্তি অনুভব করছি।' সে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারুক। আমিরুল মুমিনিন ওয়াসিক তো একজন কাফিরকেই হত্যা করেছেন।'

এরপর তার কাছে হারসামা প্রবেশ করল। তাকে বললেন, 'হারসামা, আমি বুকের মধ্যে আহমাদ বিন নাসর হত্যাকাণ্ডের শাস্তি অনুভব করছি।' হারসামা উত্তর দিল, 'আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ আমার শরীরকে টুকরো টুকরো করুক। আমিরুল মুমিনিন ওয়াসিক তো একজন কাফিরকেই হত্যা করেছেন।'

এরপর খলিফার কাছে আহমাদ বিন দাউদ আসলে তাকেও একই কথা বললেন। উত্তরে আহমাদ বিন দাউদ বলল, 'আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা আমাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করুক। আমিরুল মুমিনিন ওয়াসিক তো একজন কাফিরকেই হত্যা করেছেন।'

৩৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৪৭।

খলিফা মুতাওয়াক্কিল বলেন, 'জাইয়াতকে আমি পুড়িয়ে মেরেছি। হারসামা পালিয়ে গিয়ে মরুবাসী হয়ে গিয়েছিল। একদিন খুজাআ কবিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় গ্রামের এক লোক তাকে চিনে ফেললেন। তখন লোকটি বলে উঠলেন, 'হে খুজাআ সম্প্রদায়, এ সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের চাচাতো ভাই আহমাদ বিন নাসরকে হত্যা করেছে।' তখন লোকেরা তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। ইবনে আবু দাউদের পরিণতিও তাদের মতো হয়েছিল—আল্লাহ তাআলা তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে নিজ চামড়ার মাঝেই আটকে রেখেছিলেন।[৩৫]

তাদের হিফাজত করেন

বিশিষ্ট দায়ি মুহাম্মাদ দাসুকি আব্দুন নাসিরের কারাগারে বন্দী ছিলেন। আমাদের ধারণামতে, তিনি ছিলেন আল্লাহর অলি ও মুত্তাকি বান্দাদের অন্যতম। তাঁকে মরূদ্যানের কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। এই কারাগার ছিল মূলত শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে বিক্ষিপ্ত কিছু তাঁবু। এই মরুভূমিতে তারিশা (Cerastes cerastes) নামের এক ধরনের বিষধর সাপের উপদ্রব আছে। এই সাপ অন্যান্য সাপের চেয়ে মারাত্মক। অন্যান্য সাপ তো চলার পথে গায়ের ছাপ রেখে যায়; কিন্তু এই সাপ নিজের পার্শ্বের ওপর ভর দিয়ে চলে বিধায় মাটিতে তার কোনো চিহ্ন থাকে না। পার্শ্বের ওপর ভর দিয়ে চলে বলে এই সাপকে লিবিয়াতে 'জান্নাবি' বলা হয়। ৭০ সেমি লম্বা এই সাপের মাথায় দুটি শিং থাকে। সে পুরো শরীর মাটির ভেতর লুকিয়ে রেখে কেবল শিংদুটি বের করে রাখে। এ জন্য সাপটিকে 'দাফিন'ও বলা হয়। এই সাপের একটি বৈশিষ্ট্য হলো, সে এক লাফে কয়েক মিটার যেতে পারে এবং তার কাছাকাছি শিকারকে খুব সহজে ধরে ফেলতে পারে। তার বিষ খুব ভয়াবহ এবং তার কোনো ভ্যাকসিনও নেই। তাই কোনো মানুষ এই সাপের দংশনের শিকার হলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যায়। দংশনের পর বিষ ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে আক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলা ছাড়া তার কোনো চিকিৎসাও নেই।

৩৫. তাহজিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল : ১/৫১০-৫১১।

এই কারাগারে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ভাইয়েরা নিজ নিজ অসিয়তনামা লিখে ফেললেন এবং মালাকুল মাওতকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলেন। প্রথমদিন তারিশা একজন সৈনিকের ওপর আক্রমণ করল। চিকিৎসা দেওয়ার পূর্বেই সৈনিকটি মারা গেলেন। অতঃপর মৃত্যুবাহী সাপ সেনাছাউনির নিকটে চলে আসলো এবং বন্দীদের একদম কাছে চলে আসলো। পরেরদিন তারিশা কামড় বসিয়ে দিল মুহাম্মাদ দাসুকির পায়ে। সঙ্গীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে আক্রান্ত পা দ্রুত কেটে ফেলার প্রস্তুতি নিলেন। চারিদিকে কান্নার রোল পড়ে গেল। কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও ভাই মারা যাননি। এরচেয়েও আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটল, যা কেউ কল্পনাও করতে পারেনি। সকল নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ভাই বেঁচে গেলেন এবং দংশনকারী সাপ মারা গেল! হ্যাঁ, তারিশা মরে গিয়ে নিথর দেহ হয়ে পড়ে রইল![৩৬]

এটা কি একজন নেককার বান্দার কারামাত? না আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুর হামলাকারী থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন? না সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তরসমূহকে সত্যের ওপর অবিচল রাখার জন্য এমনটি করেছেন? না সবকটিই?

আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুদের এভাবেই রক্ষা করেন এবং তাদের শত্রুদের থেকে এভাবেই প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাই পশ্চিমা মুজাহিদ আব্দুল কারিম খাত্তাবি আল্লাহর একজন বন্ধুর হত্যাকাণ্ডের শাস্তির ব্যাপারে যে হুমকি দিয়েছেন, তা মোটেই অমূলক নয়। ইমাম বান্না ﷬-এর শাহাদাতের পর তাঁর শোকগাথায় তিনি লিখেছেন :

'আফসোস মিসর ও মিসরবাসীর জন্য! বান্নাকে হত্যা করার বিনিময়ে তাদের দিকে ধেয়ে আসছে ধ্বংস! তারা আল্লাহর একজন বন্ধুকে হত্যা করেছে। বান্না যদি আল্লাহর বন্ধু না হন, তাহলে আল্লাহর কোনো বন্ধুই নেই।'

---

৩৬. হাজি আলি নোয়াইতো (ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রথম সারির নেতা) এর অপ্রকাশিত ডায়েরি থেকে।

আল্লাহর বন্ধুত্বের স্তরে পৌঁছানোর সেতু

আল্লাহর বন্ধুদের উপরিউক্ত মর্যাদা ও ফজিলতের বিবরণ শোনার পর মনের মধ্যে উক্ত স্তরে পৌঁছার এবং তাদের দলভুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়। রূপবতী ও গুণবতী মেয়েকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চাইলে মোহরানা প্রদানে কার্পণ্য করা যায় না। মৌমাছির হুলের আঘাত সহ্য করা ছাড়া মধু সংগ্রহ করা যায় না। উচ্চ মর্যাদা চাইলে রাতদিন পরিশ্রম করতে হয়। কষ্ট ও মেহনতের পরিমাণ অনুযায়ী সফলতা ধরা দেয়। তেমনই আল্লাহর সাথে বন্ধুত্বের মর্যাদা লাভ করার জন্য মেহনত করতে হয়। অমানুষিক কোনো মেহনত নয়, কেবলমাত্র দুটি কাজ করতে হয় :

ফরজ ইবাদতসমূহ আঁকড়ে ধরা এবং নফলের প্রতি যত্নবান হওয়া।

কিয়ামতের দিন আমলসমূহ সংখ্যা ও পরিমাণের ভিত্তিতে গণনা করা হবে না। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে ওজন করা হবে। কারণ, হিসাব-নিকাশের জন্য দাড়িপাল্লা রাখা হবে, গণনাযন্ত্র নয়। মোটকথা, নেক আমলসমূহ ওজন করা হবে, গণনা করা হবে না। ফলে অনেক সময় একটি নেক আমল ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্বের গুণের কারণে হাজার হাজার নেক আমলের চেয়ে ভারী হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বান্দার নেক আমলসমূহের মধ্যে ফরজ ইবাদতগুলোই সবচেয়ে ভারী, ফরজ নফলের চেয়ে ভারী এবং আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় ও নিকটতর। বরং আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত নফল আমলসমূহ কবুল করেন না, যতক্ষণ না ফরজসমূহ আদায় করা হয়। ফরজই ইবাদতের মূলভিত্তি। আর বুদ্ধিমান ব্যক্তি সর্বপ্রথম ভিত্তির প্রতিই গুরুত্ব দেয়। কারণ, ভিত্তি নড়বড় হলে ধ্বংস অনিবার্য।

এ জন্যই ইবনে হুবাইরা ﷺ বলেছেন, 'নফল আমলসমূহকে নফল (অতিরিক্ত) বলার কারণ হচ্ছে, তা ফরজের পরে অতিরিক্ত হিসেবে আদায় করা হয়। সুতরাং যদি ফরজ ভালোভাবে আদায় করা না হয়, নফলের সাওয়াব পাওয়া যাবে না।'[৩৭]

---

৩৭. ফাতহুল বারি : ১১/৩৪৩।

তবে ফরজ ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে আদায় করা হলেই আল্লাহর দরবারে তা গৃহীত হয়। এ জন্যই মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে আবু বকর ﵁ উমর ﵁-কে ডেকে অসিয়ত করলেন :

'আল্লাহকে ভয় করুন, হে উমর আর জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলার জন্য দিনে পালনীয় কিছু আমল আছে, সেগুলো রাতে আদায় করলে কবুল হবে না। কিছু আমল রাতে পালনীয়, দিনের বেলা তা কবুল হবে না।'[৩৮]

ফরজের ওপর নফলকে প্রাধান্য দেওয়াকে ইবনে আতা ﵀ প্রবৃত্তির অনুসরণের মধ্যে গণ্য করেছেন। বলেছেন, 'প্রবৃত্তির অনুসরণের একটি নিদর্শন হলো, ঐচ্ছিক বিষয়াবলির প্রতি আগ্রহ এবং আবশ্যকীয় বিষয়াবলির প্রতি অনীহা।'[৩৯]

আবু হামিদ গাজালি ﵀ এটাকে প্রতারিত ও বিভ্রান্তদের আলামত বলেছেন :

'ভালো কাজসমূহের ক্রমধারা ঠিক না থাকা (অর্থাৎ ফরজের আগে নফলকে গুরুত্ব দেওয়া) এক ধরনের বিভ্রান্তি।'[৪০]

যে ব্যক্তি নফলের প্রতি খুব যত্নশীল, ফরজের প্রতি তার শিথিলতা ও অনীহা কখনো কাম্য নয়। সুতরাং যার ওপর মানুষের কর্জ আছে, কর্জ পরিশোধ না করে সদাকা করা তার উচিত নয়। যার নিজের শরীর আহত, অন্য আহতের চিকিৎসা করা তার জন্য অনুচিত। অনুরূপভাবে যার ফরজে ঘাটতি রয়ে গেছে, ফরজ পরিপূর্ণ না করে নফল নিয়ে পড়ে থাকা তার জন্য ঠিক নয়।

এ জন্যই আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ﵀ ফরজ ও নফলের যথাযথ পার্থক্য নিরূপণ করে প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়াকে নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। ফলে শয়তান কখনো তাঁকে ধোঁকা দিতে পারেনি। কোনোভাবে প্ররোচিত করতে সক্ষম হয়নি। এ সম্পর্কিত তাঁর চমৎকার রায়টি শুনে দেখো :

---

৩৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/১০০।
৩৯. হুকমু ইবনি আতা।
৪০. আসনাফুল মাগরুরিন : ১/৫৯।

'সন্দেহযুক্ত একটি দিরহাম ফিরিয়ে দেওয়া এক লক্ষ, দুই লক্ষ এমনকি ছয় লক্ষ দিরহাম সদাকা করার চেয়ে আমার নিকট পছন্দনীয়।'[৪১]

সন্দেহযুক্ত দিরহামের ব্যাপারে এমন কথা! সেটা যদি হারাম দিরহাম হয়, তাহলে কেমন হবে!?

এর কারণ হচ্ছে, হারাম দিরহাম থেকে বেঁচে থাকা ফরজ, যেখানে ছয় লক্ষ দিরহাম সদাকা করা নফল। আর নফলের ওপর ফরজ প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

এ জন্যই হাসান বসরি ﷺ অত্যাচারী দানশীলদের ওপর নিজের সকল রাগ ঝেড়ে দিয়ে বলেন :

'হে মিসকিনকে সদাকা দানকারী, সদাকা দেওয়ার পূর্বে ওই ব্যক্তির প্রতি দয়া করো, যার প্রতি তুমি জুলুম করেছ।'[৪২]

তারপর ওয়াহাব বিন ওয়ারদ তোমাকে এই ফরজ (হালাল খাওয়া) নষ্ট করা থেকে সতর্ক করেছেন। খুব আন্তরিকতা নিয়ে তিনি বলেছেন :

'যদি তুমি এই খুঁটির মতো স্থির হয়ে ইবাদতে দাঁড়িয়ে থাকো, কিন্তু তোমার পেটে হালাল ঢুকছে নাকি হারাম তার কোনো পরোয়া নেই তোমার, তাহলে এই ইবাদত তোমার কোনো কাজে আসবে না।'[৪৩]

এ কারণেই আল্লাহর সৎকর্মশীল বান্দারা নফলের চেয়ে ফরজ ইবাদতের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতেন। হিশাম বিন উরওয়া বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা ফরজ নামাজে অধিক সময় ধরে দাঁড়াতেন। নফলে ফরজের মতো দীর্ঘ সময় দাঁড়াতেন না। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'ফরজ হচ্ছে মূলধন।'[৪৪]

এ জন্য সালাফগণ ফরজ নামাজের মধ্যে অধিকহারে দুআ করতেন। দীর্ঘ সময় নিয়ে দুআ করতেন। আওন বিন আব্দুল্লাহ তাঁর মূল্যবান উপদেশের মধ্যে বলেন :

---

৪১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৩২৬।
৪২. আল-ইশরাফ ফি মানাজিলিল আশরাফ : পৃ. ১৪৫।
৪৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/১৫৪।
৪৪. তারিখু বাগদাদ : ৮/২৫১।

'তোমাদের যেসব প্রয়োজন আছে, তা আল্লাহর কাছে ফরজ নামাজ পড়াকালীন চেয়ে নাও। কারণ, নফল নামাজের ওপর যে রকম ফরজ নামাজের ফজিলত রয়েছে, তেমনই ফরজ নামাজে যে দুআ করা হয়, তা নফল নামাজের দুআ অপেক্ষা অধিক ফজিলতপূর্ণ।'[৪৫]

ফরজের দুই শাখা

ফরজ দুই প্রকার : আদেশসূচক ও নিষেধসূচক

আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন, তা মেনে চলা এবং যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাঞ্ছনীয়। উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ খুতবার মধ্যে বলতেন, 'সর্বোত্তম ইবাদত হলো, ফরজসমূহ আদায় করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকা।'[৪৬]

বর্তমান সময়ে বহুল প্রচলিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় হচ্ছে :

- জিহ্বার গুনাহ : মিথ্যা, পরচর্চা, পরনিন্দা, গালাগালি ইত্যাদি।
- কানের গুনাহ : যা শোনা হারাম তা শোনা।
- অন্তরের গুনাহ : অহংকার, আত্মম্ভরিতা, আমিত্ব, হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রতারণা ইত্যাদি।

অন্তরের এই গুনাহসমূহের ভয়াবহতা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা জেনে নাও, যে পর্যালোচনায় এই গুনাহসমূহ থেকে বেঁচে থাকাকে সবচেয়ে বেশি জরুরি বলা হয়েছে। এবার তনুমন দিয়ে ইবনে তাইমিয়া ﵀-এর সেই পর্যালোচনাটি শোনো :

'অহংকার, আত্মম্ভরিতা ও লোকদেখানোর গুনাহ মদপান করার গুনাহের চেয়ে ভয়াবহ। যে ব্যক্তি মদপান করে, তবে অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় লালন করে,

৪৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/২৫৩।
৪৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/২৯৬।

সে ওই ব্যক্তির চেয়ে আল্লাহর রহমতের অধিক নিকটবর্তী, যে লোকদেখানোর জন্য রোজা রাখে এবং তা নিয়ে অহংকার ও অহমিকায় ভোগে।'[৪৭]

যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকে, সে 'সর্বাধিক ইবাদতকারী' উপাধি পাওয়ার যোগ্য। মর্যাদার এই মালা তার গলায় পরিয়েছেন খোদ রাসুল ﷺ। ইরশাদ করেছেন :

اتَّقِ المَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ

> 'নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকো; মানুষের মধ্যে সর্বাধিক ইবাদতকারী হয়ে যাবে।'[৪৮]

এই হাদিসটি তুলনামূলক শ্রেষ্ঠ আমল নির্ণয়ের মূলনীতি, যেটাকে পরবর্তী হকপন্থী উলামায়ে কিরাম উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করেছেন। তাদের অন্যতম হলেন মুআবিয়া বিন কুররা মুজানি ﵀। তিনি সত্তর জন সাহাবির সান্নিধ্য পাওয়া একজন হকপন্থী আলিম। তাঁদের থেকে তিনি সেই বক্তব্য শিক্ষা করেছেন, যার সারসংক্ষেপ তিনি হাসান বসরি ﵀-এর একটি মজলিশে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমরা হাসান বসরি ﵀-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। সেখানে আমাদের মাঝে কোন আমল সর্বোত্তম এ সম্পর্কে আলোচনা হলো। সবাই একবাক্যে তাহাজ্জুদকেই সর্বোত্তম আমল বললেন। কিন্তু আমি বললাম, "নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত থাকাই সর্বোত্তম আমল।" আমার কথা শুনে হাসান ﵀-এর ভুল ভাঙল। তিনি বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, এটাই যথার্থ অভিমত।"'[৪৯]

এ জন্য সালাফগণ ওয়াজ করার সময় নিষিদ্ধ ও বর্জনীয় বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি যে পরিমাণ গুরুত্ব দিতেন, আদিষ্ট ও পালনীয় বিষয়সমূহের প্রতি সে পরিমাণ গুরুত্ব দিতেন না। মালিক বিন দিনার ﵀ উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে এই নিয়ম অনুসরণ করতেন। তিনি বলতেন, 'আমি তোমাদেরকে এমন আমলও করতে বলি, যা আমি করি না। কিন্তু যখন আমি তোমাদেরকে কোনো

৪৭. আর-রাদ্দু আলাশ শাজিলি : ১/৬৫।
৪৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৩০৫।
৪৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/১৫১।

বিষয় থেকে নিষেধ করি, তা থেকে আমি অবশ্যই বিরত থাকি। কেননা, যদি আমি তা থেকে বিরত না থাকি, তাহলে কিয়ামতের দিন আমি মহামিথ্যুক হিসেবে গণ্য হব। উপদেশদানের জন্য সালাফগণের এমন পন্থা অবলম্বন মূলত নবি ﷺ-এর হাদিসের অনুসরণ। হাদিসের মধ্যে তিনি প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরজের দুই শাখা তথা পালনীয় ও বর্জনীয় বিষয়সমূহের জন্য সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইরশাদ করেছেন :

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ،

> 'আমি যেসব বিষয় থেকে তোমাদের নিষেধ করেছি, তা থেকে বেঁচে থাকো। আর যেসব বিষয় পালন করার নির্দেশ দিয়েছি, তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী তা পালন করো।'[৫০]

এই হাদিসের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বাঁচার ক্ষেত্রে কোনো ধাপ ও কাটছাঁট নেই। কারণ, হারামের দরজা সামান্য খুলে দেওয়া হলেই শয়তান প্রবেশ করে কলবের কর্তৃত্ব নিয়ে নেবে। এ জন্য রাসুল ﷺ সুদৃঢ় নির্দেশ দিয়েছেন : (فَاجْتَنِبُوهُ) 'তা থেকে বিরত থাকো।'

বান্দা হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বেঁচে থাকার মাধ্যমে 'সিদ্দিক' স্তরে উপনীত হয়। এটা সাহল তুসতারি ﷺ-এর অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ মন্তব্য। তিনি নেককার ও বদকার উভয় শ্রেণির লোকদের কাজকর্ম ও আচার-আচরণ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে এ সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। হিলইয়াতুল আওলিয়া নামক কিতাবে তাঁর সেই যুগান্তকারী মন্তব্যটি এসেছে এভাবে :

'নেক আমল ভালো-খারাপ উভয় প্রকারের লোক করে থাকে; কিন্তু গুনাহ পরিত্যাগ করে কেবল 'সিদ্দিক' স্তরে উপনীত লোকেরাই।'[৫১]

জান্নাতুল ফিরদাওসের জন্য প্রতিযোগিতাকারীদের প্রতি দারুণ একটি উপদেশ দিয়েছেন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ—যেন তারা প্রতিযোগিতার ময়দানে

---

৫০. সহিহু মুসলিম : ১৩৩৭।
৫১. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১০/২১১।

দৃঢ়পদ থাকতে পারে। কেমন যেন এর মাধ্যমে তিনি প্রতিযোগীদের হাত ধরে জান্নাতিদের প্রথম সারিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন :

'যে (জান্নাত অর্জনের প্রতিযোগিতায়) অক্লান্ত আমলকারী ব্যক্তির চেয়ে আগে যেতে চায়, সে যেন গুনাহ থেকে বিরত থাকে। কারণ, অক্লান্ত আমলকারীরা যেসব আমল নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে, তার কোনোটাই গুনাহের স্বল্পতার চেয়ে উত্তম নয়।'[৫২]

আমাদের এই সময়ে যেসব ফরজ বিধান মানুষের কাছে গুরুত্ব হারিয়েছে, তন্মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে ন্যায়বিচার তথা প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার অধীনস্থদের প্রতি ইনসাফ করা। রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী-আমলা ও মেম্বার-চেয়ারম্যানের ওপর যেমন জনগণের প্রতি সুবিচার করা ফরজ, তেমনই প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর নিজ নিজ পরিবার ও অধীনস্থদের প্রতি ইনসাফ করা ফরজ। কিয়ামতের দিন ইনসাফ ও ন্যায়বিচার অনেকের ক্ষেত্রে আমল পরিমাপের মানদণ্ডে অন্য অনেক ইবাদতের চেয়ে ভারী ও কার্যকর প্রমাণিত হবে। ইবনুল কাইয়িম ﵀ এ সম্পর্কে বলেন :

'দায়িত্বশীল ব্যক্তি—যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করার জন্য নির্বাচিত করেছেন—জালিম থেকে মজলুমের হক আদায় করার উদ্দেশ্যে অথবা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে তার এক ঘণ্টার মজলিশ আরেকজন সাধারণ ব্যক্তির কয়েক বছর ইবাদতের চেয়ে উত্তম।'[৫৩]

---

৫২. কিতাবুজ জুহদ : ১/২২।

৫৩. উদ্দাতুস সাবিরিন ওয়া জাখিরাতুশ শাকিরিন : ১/১১৪-১১৫। ২ নং ফায়দা : ইবনুল কাইয়িম ﵀ এ সম্পর্কে আরও কয়েকটি উদাহরণ দিয়েছেন : যে সম্পদশালী ব্যক্তির মন সদাকা করতে চায় না; কিন্তু সে মনের বিরোধিতা করে উদারহস্তে সদাকা করে, তার সদাকা রাতের নফল নামাজ এবং দিনের নফল রোজার চেয়ে উত্তম। একজন বাহাদুর ও জানবাজ মুজাহিদের জিহাদের ময়দানে এক ঘণ্টা অতিবাহিত করে আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলা করা হজ, রোজা, সদাকা ও অন্যান্য নফল ইবাদত অপেক্ষা উত্তম। একজন প্রকৃত আলিম, যে সুন্নাহ, হালাল-হারাম, ভালো-মন্দ সবকিছু ভালোভাবে জেনে মানুষের মাঝে বসবাস করে, তাদের দ্বীন শিক্ষা দেয় এবং উত্তম উপদেশ দেয়, তার এ কাজ তার একাকী নির্জনে বসে নফল নামাজ পড়া, তাসবিহ পাঠ করা ও কুরআন তিলাওয়াত করা অপেক্ষা উত্তম।

পথের মধ্যখানে

ফরজ আমলসমূহ নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করলে সফলতার মহাসড়কের ঠিক মাঝখানে থাকবে তুমি। এই সড়কের শেষপ্রান্তে তোমার জন্য অপেক্ষা করবে প্রভুর ভালোবাসা ও নৈকট্য। তোমার মনে সৃষ্টি হবে প্রিয়তমের সাক্ষাৎ লাভের অব্যক্ত কামনা। তোমার মাঝে সৃষ্টি হবে দৃঢ় প্রত্যয়, যা তোমাকে অপেক্ষমাণ সুখ-সমৃদ্ধি ও জান্নাতের পথে পথ চলতে সাহায্য করবে, অবিরাম পথচলা তোমার জন্য সহজ করে দেবে এবং সফরের কষ্ট-ক্লেশ থেকে ভুলিয়ে রাখবে।

তবে এই যাত্রায় তোমাকে সাথে রাখতে হবে সততার পাথেয়। তোমার দৃঢ়তা ও অটলতাই সে সততার প্রমাণ বহন করবে। এ জন্যই ইবনে হাজার আসকালানি ﷺ অলি তথা আল্লাহর প্রকৃত বন্ধুর সংজ্ঞায় লিখেছেন :

'আল্লাহর অলি বলতে ওই ব্যক্তিকেই বোঝায়, যে আল্লাহকে জানে, তাঁর ইবাদতের ওপর অটল ও অবিচল থাকে এবং একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করে।'[৫৪]

এর জন্য চাই নিরবচ্ছিন্নতা ও অবিচলতা

আল্লাহর কাছে ইবাদত গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্নতা শর্ত। এমনকি নফলের মধ্যেও নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে হয়। জোশে এসে দুয়েক দিন বা দুয়েক সপ্তাহ আমল করল, এরপর ছেড়ে দিল—এমন আমলের দাম আল্লাহর কাছে খুব একটা নেই। হাদিসের শব্দের দিকে খেয়াল করো :

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

> 'আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এভাবে একসময় আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি...।'[৫৫]

হাদিসের শব্দ থেকে এ কথা একদম স্পষ্ট হয় যে, নিরবচ্ছিন্নতা ছাড়া আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হবে না। আসলে ইবাদতে নিরবচ্ছিন্নতা ব্যতীত অন্তর

---

৫৪. ফাতহুল বারি : ১১/৩৪২।
৫৫. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২।

আলোকিত হয় না। এ জন্যই যুগশ্রেষ্ঠ দুনিয়াবিমুখ সাধক আবু সুলাইমান দারানি ﵀ বলেন :

'নিরবচ্ছিন্নতার আলাদা একটা প্রতিদান আছে। আমরা যারা এক রাত ইবাদত করে দুই রাত ঘুমিয়ে কাটাই, এক দিন রোজা রেখে দুই দিন ছেড়ে দিই, এভাবে আমাদের অন্তরসমূহ আলোকিত হবে না।'[৫৬]

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিকপ্রাপ্ত আমলের ওপর নিরবচ্ছিন্নতা ধরে রাখতে না পারার পেছনে দুটি কারণ : আমাদের চিরাচরিত স্বভাব ভুলে যাওয়া অথবা সংকল্পের দুর্বলতা।

মূলত এ দুটি আমাদের পিতা আদম ﵇-এর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি আমরা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا

> 'আমি তো ইতিপূর্বে আদমকে নির্দেশ দিয়েছিলাম; কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে সংকল্পে দৃঢ় পাইনি।'[৫৭]

এখানে স্বভাবতই কারও মনে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, কেউ নিজ পিতার অনুরূপ হলে অপরাধের কী আছে?

কিন্তু এখানে দেখতে হবে, আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে তোমার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তোমাকে অটলতা ও নিরবচ্ছিন্নতার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তা ছাড়া এর বিনিময়ে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়। একজন মুমিনের জন্য আল্লাহর ভালোবাসা লাভের চেয়ে উত্তম পুরস্কার আর কী হতে পারে!? আল্লাহর ভালোবাসা এমন এক অদ্ভুত বিষয়, যা সাধারণ বিবেক দ্বারা অনুভব করা যায় না। আল্লাহ যেমন বড় ও মহিমান্বিত, তেমনই তাঁর ভালোবাসাও অনেক অনেক বড় নিয়ামত। আল্লাহকে চিনে এমন হৃদয় ব্যতীত

---

৫৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/২৭১।
৫৭. সুরা তহা, ২০ : ১১৫।

তা অনুভব করা যায় না। আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারা যেকোনো মাখলুকের জন্য অনেক বড় সফলতা ও উন্নতি।

তিনি প্রথমে ফরজের কল্যাণে তোমার কাজকে ভালোবাসেন। যেমন, হাদিসে এসেছে :

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ

> 'আমার বান্দা যে সমস্ত জিনিস দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে আমার নিকট প্রিয়তম জিনিস হলো তা, যা আমি তার ওপর ফরজ করেছি।'[৫৮]

অতঃপর নফলের কল্যাণে তিনি সরাসরি তোমাকেই ভালোবাসেন। যেমন তিনি বলেন :

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

> 'আমার বান্দা নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এভাবে একসময় তাকে আমি ভালোবেসে ফেলি।'[৫৯]

অর্থাৎ নফলের মাধ্যমে বান্দা ইমানের ধাপ অতিক্রম করে ইহসানে উন্নীত হয়।

একটি সংশয় ও তার নিরসন

সংশয় : আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের সেতু নফল কেন? ফরজ কেন নয়? ভালোবাসার পাখি নফলের ডানা ছাড়া গন্তব্য অভিমুখে উড়াল দিতে পারে না কেন?

নিরসন : উলামায়ে কিরাম এর উত্তর দিয়েছেন, বান্দা সাধারণত ফরজ আদায় করে আল্লাহর শাস্তির ভয়ে। কিন্তু নফল ইবাদত করে তাঁর নৈকট্য হাসিলের নিয়তে। যেহেতু নফলের সময় তার নিয়ত অধিক নিষ্ঠাপূর্ণ থাকে, তাই নফলই আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের কারণ হয়।

---

৫৮. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২।
৫৯. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২।

একটি উদাহরণ :

তোমার একজন পরিচারক তোমার সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। কোনো আদেশ অমান্য করে না। কোন কোন বিষয় তোমার অপছন্দ, তা জেনে নিয়ে সেসব থেকে বিরত থাকে। তোমার পছন্দের কাজগুলো যথাযথভাবে আদায় করে। তুমি কি তার মজুরি পুরোপুরি বুঝিয়ে দেবে না তাকে? আবার এই পরিচারক যদি আরও বেশি চতুর ও বুদ্ধিমান হয়, ফলে তুমি আদেশ করার আগেই তোমার পছন্দনীয় কাজগুলো ঠিকঠাকভাবে করে ফেলে এবং নিষেধ করা ছাড়াই তোমার অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে, তখন তোমার বিবেক কি তাকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তাকে ভালোবাসার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে না? কোনো সময় সে যদি তোমার থেকে অধিক পারিশ্রমিক চায়, তুমি কি না দিয়ে থাকতে পারবে?

আল্লাহ তাআলা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি মহান ও উদার। তাই তাঁর আবশ্যকীয় বিধানসমূহ পালন করার পাশাপাশি কোনো বান্দা যদি অতিরিক্ত হিসেবে নিয়মিত নফল আমল করে, তাহলে তিনিও অতিরিক্ত প্রতিদান হিসেবে সে বান্দাকে তাঁর ভালোবাসায় সিক্ত করেন।

নেতৃত্বের অধীনে প্রতিপালন

নবি ﷺ তাঁর সাহাবিদের স্বীয় কর্মের মাধ্যমে ইবাদতের ওপর অটল থাকার শিক্ষা দিতেন। আয়িশা ؓ বর্ণনা করেন :

'রাসুল ﷺ যখন কোনো আমল করতেন, তার ওপর অটল থাকতেন।'[৬০]

আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি এমন করতেন। এরপর আয়িশা ؓ পূর্বের কথাকে আরও সুদৃঢ় করে বলেন :

'তিনি কখনো তাহাজ্জুদ পরিত্যাগ করতেন না। কোনোদিন অসুস্থ হলে কিংবা ক্লান্তি আসলে বসে বসে তাহাজ্জুদ পড়তেন।'[৬১]

---

৬০. সহিহু মুসলিম : ৭৪৬, সুনানু আবি দাউদ : ১৩৬৮।
৬১. সুনানু আবি দাউদ : ১৩০৭।

তবে মাঝেমধ্যে অসুস্থতা কিংবা ঘুমের কারণে রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারতেন না। তখন কি তাহলে তিনি তাহাজ্জুদ ছেড়ে দিতেন? আল্লাহর কসম, তিনি কক্ষনো এমন করতেন না। হাদিসের অন্য একটি রিওয়ায়াতে শেষের দিকে আয়িশা ﵂ কী বলছেন শোনো :

'কোনো রাতে যদি অসুস্থতা কিংবা ঘুমের কারণে তাহাজ্জুদ পড়া সম্ভব না হতো, পরের দিন দিনে বারো রাকআত নামাজ আদায় করে দিতেন।'[৬২]

নবিজি ﷺ কোনো আমল শুরু করলে তার ওপর অটল ও অবিচল থাকতেন, এর আরও একটি প্রমাণ হলো, নবিজি ﷺ ঘুমানোর উদ্দেশ্যে যখন বিছানায় যেতেন, সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে হাতের তালুতে ফুঁ দিতেন, অতঃপর শরীরের যতটুকু হাত পৌঁছানো সম্ভব, ততটুকুতে হাত মালিশ করতেন। মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতার সময়েও তিনি এ আমলের ওপর অটল ছিলেন। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﵂-ই এর সাক্ষ্য দিয়েছেন :

'মৃত্যুর পূর্বে নবিজি ﷺ যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন আমি তাঁর শরীরে সুরা ফালাক ও সুরা নাস পড়ে ফুঁ দিতাম এবং তাঁর হাত দিয়ে শরীরে বুলিয়ে দিতাম, যেভাবে তিনি সুস্থ অবস্থায় নিজে নিজে করতেন।'[৬৩]

নবিজি ﷺ-এর উক্ত আমলের ব্যাখ্যায় আবু সুলাইমান দারানি ﵀ বলেন :

'কোনো নফল আমল ছুটে গেলে তা কাজা আদায় করে দাও। এতে তোমার মাঝে নফল ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা তৈরি হবে না।'[৬৪]

এটি একটি জীবন্ত উপদেশ। এই উপদেশ তোমার মাঝে পরিপূর্ণতার অভ্যাস গড়ে তুলবে এবং অপূর্ণ বিষয়গুলো সম্পূর্ণ করে নেওয়ার মানসিকতা সৃষ্টি করবে। ফলে শিথিলতামুক্ত মানসিকতা নিয়ে তুমি বেড়ে উঠবে এবং ধাপে ধাপে উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে।

---

৬২. সহিহ মুসলিম : ৭৪৬।

৬৩. আত-তালিকাতুল হিসান আলা সহিহি ইবনি হিব্বান : ৬৫৫৬, আস-সিলসিলাহ আস-সাহিহাহ : ৩১০৪। আয়িশা ﵂ নিজের হাত না বুলিয়ে রাসুল ﷺ-এর হাত দিয়ে বুলাতেন। এর কারণ হলো, রাসুল ﷺ-এর হাত ছিল অধিক বরকতপূর্ণ।

৬৪. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/২৬১।

শিক্ষার্থীদের প্রতিভা

নবিজির এ শিক্ষা হাতেকলমে শিখে নিয়েছিলেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরা। জীবনের কঠিনতম সময়ে কিংবা যুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও এ শিক্ষা তাঁরা ভুলে যাননি। আলি ﵁-এর কর্মে তার প্রমাণ দেখো :

রাসুল ﷺ আলি ও ফাতিমা ﵄-কে ঘুমানোর পূর্বে ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' এবং ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। আলি ও ফাতিমা ﵄ কেউই সেদিনের পর থেকে এ আমল ছাড়েননি। এমনকি আলি ﵁ বলেন, 'নবিজির মুখ থেকে এ আমলের কথা শোনার পর থেকে আজ অবধি কোনোদিন তা ছাড়িনি, এমনকি সিফফিন যুদ্ধের রাতেও না!'[৬৫]

এ ঘটনা আমাদেরকে যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে ওজর-আপত্তিকে প্রশ্রয় না দেওয়া এবং অলসতার ডাকে সাড়া না দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

এমনই ছিল সাহাবিদের অবস্থা। আর এমন হবে না-ই বা কেন? তাঁরা তো 'নুবুওয়াত বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন! যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শিক্ষা হচ্ছে : যেহেতু জিকির বা আল্লাহর স্মরণ উত্তম ইবাদত, তাই তার ওপর অটল ও নিরবচ্ছিন্ন থাকাও উত্তম আমল।

এ জন্য রাসুল ﷺ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, কোনো জিকির শুরু করার পর তা যেন আর ছেড়ে না দিই।[৬৬] কেননা, অটলতা ও নিরবচ্ছিন্নতার মাধ্যমেই জিকিরের প্রকৃত উদ্দেশ্য তথা সব ধরনের পরিস্থিতিতে আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনে চলা বাস্তবায়িত হয়। এই অনড়তা ও নিরবচ্ছিন্নতায় স্বয়ং নবি ﷺ আমাদের আদর্শ। তিনি সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও কসম করে বলেন :

---

৬৫. সহিহুল বুখারি : ৫৩৬২, সহিহু মুসলিম : ২৭২৭।

৬৬. ৩ নং ফায়দা : আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ হচ্ছে নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর জিকির করা। ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা প্রতিটি বিষয়ের জন্য একটি মাধ্যম রেখেছেন, আর ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম হচ্ছে নিয়মিত জিকির করা। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা কামনা করে, সে যেন অধিকহারে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে আল্লাহর জিকির করে।' (আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব : পৃ. ৬১)

وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً

'আল্লাহর কসম, আমি প্রতিদিন সত্তর বারের বেশি গুনাহ মাফ চাই এবং তাওবা করি।'[৬৭]

অতঃপর ভাষার মধ্যে অলংকারিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে বলেন :

مَا أَصْبَحْتُ غَدَاةً قَطُّ إِلَّا اسْتَغْفَرْتُ اللهَ فِيهَا مِائَةَ مَرَّةٍ

'যত সকালে আমি উপনীত হয়েছি, প্রতিটিতেই একশ বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।'[৬৮]

সময়ের পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা

নিয়মিত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে আমল করা সহজ হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা সময়ের মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রেখেছেন। বিশেষ কোনো দিন বা মাসকে একটু বেশি ফজিলত দিলেও, বাকি সময়গুলোকে একদম ফজিলতমুক্ত রাখা হয়েছে এমনও নয়। ফলে জুমআর দিনের আলাদা বৈশিষ্ট্য এবং রমাদান মাসের বিশেষ ফজিলত অন্য সময়ে ইবাদত করা থেকে অনুৎসাহিত করে না।

নিচে সময়ের সামঞ্জস্যতার কয়েকটি উপমা দেওয়া হলো :

- জুমআর দিনে দুআ কবুল হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে ঠিকই, কিন্তু এমন একটি সময় প্রতিটি রাতেও রাখা হয়েছে।[৬৯] যেমন, রাসুল ﷺ-এর সুসংবাদ বাণীতে এসেছে :

---

৬৭. সহিহুল বুখারি : ৬৩০৭।

৬৮. আল-মুজামুল আওসাত : ৩৭৩৭।

৬৯. সহিহ হাদিসে এসেছে : 'জুমআর দিনের বারো ঘণ্টার মধ্যে এমন একটি সময় আছে, যে সময়ে আল্লাহর কোনো বান্দা তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি অবশ্যই তা দান করেন। সুতরাং উক্ত সময়টিকে তোমরা আসরের পরের সময়ে অনুসন্ধান করো।' (সুনানু আবি দাউদ, সুনানুন নাসায়ি, সহিহুল জামি : ৮১৯০)

৪ নং ফায়দা : ইমাম নববি ؒ বলেন, 'এই হাদিস প্রমাণ করে, প্রতিটি রাতে দুআ কবুল হওয়ার বিশেষ একটি সময় আছে। সাথে সাথে এই হাদিস রাতের প্রতিটি অংশে দুআ করার প্রতি উৎসাহিত করে; যাতে কবুল হওয়ার সেই ক্ষণটি পাওয়া যায়।' (শারহুন নববি : ৬/৩৬)

إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ

'নিশ্চয় রাতে এমন একটি প্রহর আছে, কোনো মুসলিম বান্দা যদি ঠিক সে প্রহরে আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কোনো কল্যাণ কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তার চাওয়া পূরণ করেন। এই প্রহর প্রতিটি রাতে রয়েছে।'[৭০]

- অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলা যদিও রমাদানকে ফরজ রোজার জন্য বাছাই করেছেন; কিন্তু ঠিক তার পরের মাস শাওয়ালে বিশেষ ছয়টি রোজা বরাদ্দ রেখেছেন। শাওয়াল শেষ হতে না হতেই জিলহজের নয় রোজা। এর পরপরই আল্লাহর মাস মহররমের রোজা, যেটি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় রোজা। সবই তোমাকে নিয়মিত রোজা রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য রাখা হয়েছে।

- এভাবে রাসুল ﷺ শাবান মাসে সবচেয়ে বেশি রোজা রাখতেন। কারণ জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'এই মাসটি রজব ও রমাদানের মাঝামাঝি হওয়ায় অধিকাংশ মানুষ এ মাসে রোজা রাখতে গাফিলতি করে। তাই আমি রোজা রেখে এই মাসটিকে আবাদ রাখতে চাই। যাতে দ্বীনের জন্য ত্যাগ দেওয়ার ধারাবাহিকতা টিকে থাকে এবং বছরের অন্য মাসসমূহের তুলনায় এর মর্যাদা কমে না যায়।'

এবার তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ সময়ের পারস্পরিক সামঞ্জস্যতা কীভাবে তোমাকে আমলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর কারণে প্রতিটি দিনে ও মাসে ইবাদত করার ইচ্ছা তোমার মনে জাগরূক থাকে। কোনো দিন বা মাসকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে অন্য সময়গুলোতে অবহেলা করার প্রবণতা তৈরি হয় না তোমার মনে। ফলে সময়ের প্রতিটি ক্ষণের সাথে তোমার একপ্রকার বন্ধুত্ব ও বোঝাপড়া সৃষ্টি হয় এবং ইবাদতের মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য গড়ে ওঠে। তবে এটা তখনই হবে, যখন তুমি আল্লাহ তাআলা

৭০. সহিহ মুসলিম : ৭৫৭।

তোমাকে যে ইবাদত করার তাওফিক দান করেছেন, তার ওপর নিরবচ্ছিন্ন ও অনড় থাকবে।

পরিবেশের ভারসাম্য

তোমার চতুষ্পার্শ্বে অন্তর্দৃষ্টি বুলাও। দেখো, জগতের সবকিছুই তোমার প্রতিপালকের সামনে অবনমিত ও অনুগত। এই অনুভূতি তোমাকে নেক আমলের ওপর অটল ও অবিচল থাকতে সহায়তা করবে। এ জন্যই মাহান ﷺ বলতেন :

'তোমার কি লজ্জা করে না যে, যে বাহনের ওপর তুমি সওয়ার হও এবং যে কাপড় তুমি পরিধান করো, সেগুলো তোমার চেয়ে অধিক পরিমাণে আল্লাহর জিকির করে? এই লজ্জা যদি তোমার মাঝে থাকে, তাহলে তুমি কখনো "আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" জিকির থেকে বিরত থাকতে পারো না।'[৭১]

প্রকৃত মুমিন বোঝে, এই সুপ্রশস্ত জগতের সাথে খাপ খাওয়াতে হলে তাকে ভালো আমল করতে হবে। সুতরাং তুমি যদি ভালো কর্মের ওপর অনড় ও অবিচল থাকো, তাহলে জড়জগৎ, প্রাণিজগৎ ও আসমান-জমিনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে এবং সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত এই বিশ্বজগতের সঙ্গে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপন করতে পারবে। কিন্তু যদি তোমার ভালো কাজের ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়, তখন এই বিশাল বিশ্বজগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলা থেকে তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে এবং দ্রুত ফিরে না আসলে সম্পূর্ণরূপে ছিটকে পড়ে যাবে।

---

৭১. ৫ নং ফায়দা : মাহান খুব বেশি জিকির করতেন। এ জন্য তাঁর জীবনের সমাপ্তি ঘটেছিল খুব সুন্দরভাবে। এ সম্পর্কে বনি হানিফার মুয়াজ্জিন ইবরাহিম বর্ণনা করেন, 'হাজ্জাজ মাহান হানাফিকে তাঁর ঘরের দরজায় শূলিতে চড়ানোর নির্দেশ দিলেন। যখন তাঁকে গাছের সাথে বাঁধা হলো, তখন তাঁর মুখে ছিল 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আলহামদুলিল্লাহ' জিকির। তিনি হাতের সাহায্যে গুণে গুণে উনত্রিশ বার জিকির করার সাথে সাথেই তাঁকে মেরে ফেলা হলো। মৃত্যুর সময় তাঁর হাত উনত্রিশ নির্দেশক অবস্থায় ছিল এর এক মাস পর আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম। তখনও তাঁর হাত উনত্রিশ নির্দেশক অবস্থায় ছিল।' তিনি আরও বলেন, 'রাতের অন্ধকারের সময় তাঁর পাশে চেরাগের মতো একটি আলো দেখা যেত।' (সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৪২)

ভালো কাজ বন্ধ করে দেওয়ার ভয়ংকর প্রভাব

কোনো আমল শুরু করে তা বন্ধ করে দেওয়া থেকে রাসুল ﷺ নিষেধ করেছেন এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আবদুল্লাহ বিন আমর ﷺ-কে দেওয়া উপদেশে তিনি ইরশাদ করেছেন :

لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ

> 'ওই ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে তাহাজ্জুদ পড়া শুরু করে আবার বন্ধ করে দিয়েছে।'[৭২]

এ জন্য আধ্যাত্মিক চিকিৎসকগণ তাদের পূর্বঅভিজ্ঞতার আলোকে আমল বন্ধ করে দেওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে তোমাকে সতর্ক করেছেন এবং আমল শুরু করার পর তার ওপর অটল ও অবিচল থাকার প্রতি জোর দিয়েছেন। আদেশসূচক ক্রিয়া ব্যবহার করে তারা বলেন :

'নফলকে ফরজের মতো গুরুত্ব দাও এবং গুনাহকে কুফরের মতো ভয়ংকর মনে করো।'

কারণ তারা খুব ভালোভাবে বোঝেন যে, এটা ছাড়া আমলের ওপর অটল থাকা সম্ভব নয়। এদিকে এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ইবাদতের স্বাদ অনুভব না হলে তার ওপর অটল থাকা যায় না। একসময় না একসময় তা বন্ধ হয়ে যায়। তাই ইবাদতের স্বাদ অনুভব করার ব্যবস্থা নিতে হবে। সালাফদের অভিজ্ঞতা বলে, মনের ওপর জোর দিয়ে একনাগাড়ে আমল করে যাওয়া ইবাদতের স্বাদ সৃষ্টি হওয়ার উপায়।

কেউ গুপ্তধন হাতে পাওয়ার পর স্বেচ্ছায় তা হাতছাড়া করে ফেলল, শীর্ষচূড়ায় পৌঁছানোর পর ছিটকে পড়ল এবং উৎকৃষ্টকে ভোগ করার পর তার বিনিময়ে নিকৃষ্টকে বেছে নিল। এমন ব্যক্তির বোকামি দেখে সালাফগণ বিস্ময়ে হতবাক। আবু সুলাইমান দারানি ﷺ বলেন :

---

৭২. সহিহুল বুখারি : ১১৫২।

'যে ব্যক্তি ইবাদতে স্বাদ পায় না, তাকে নিয়ে আমার আশ্চর্য লাগে না, তবে যে ব্যক্তি ইবাদতের স্বাদ অনুভব করার পর তা ছেড়ে দিয়েছে, সে এই স্বাদ ছাড়া কীভাবে থাকতে পারে, তা নিয়ে আমার খুব আশ্চর্য লাগে।'[৭৩]

কাজেই প্রত্যেক মুমিনকে ইবাদতের স্বাদ অর্জন করাকে লক্ষ্য নির্ধারণ করে আমল করে যেতে হবে। শুরুতে একটু কষ্ট হবে, তবে কিছুদিন পর তা অভ্যাসে পরিণত হবে এবং ভালো লাগতে শুরু করবে। এভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমল করতে করতে একসময় তার স্বাদের মিষ্টতায় অবগাহন করতে শুরু করবে তুমি।

যে ব্যক্তি কোনো আমল শুরু করার পর তা ছেড়ে দিল, সে যেন উন্নতির পথ থেকে পেছনে সরে আসলো এবং নিজের এতদিনের প্রচেষ্টাকে জবাই করে দিল। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে তার ওপর অটল ও অবিচল রইল, সে অবশ্যই পার্থিব জান্নাতের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যাবে। এতক্ষণে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, আল্লাহর কাছে নিয়মিত আমল পরিমাণে কম হলেও এত প্রিয় কেন?

তোমার মনে এ প্রশ্ন আসতেই পারে যে, নফল ছেড়ে দিলে তো কোনো গুনাহ নেই, তবুও নফল ছেড়ে দেওয়াটা এত ভয়াবহ কেন?

নিচের আলোচনায় এর উত্তর আসছে :

৭৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/২৬২।

নফল মজবুত দুর্গ

হে ভাই, নফল ত্যাগ করার ভয়াবহতম পরিণতি হচ্ছে তোমার ওপর শয়তান নিজের প্রভাব খাটানো এবং তোমার ফরজ নষ্ট করার সুয়োগ পেয়ে যায়। কারণ নফল হচ্ছে একটি মজবুত দুর্গ, যা ফরজের ভূমিকে শত্রুর আগ্রাসন থেকে রক্ষা করে এবং তার মূল্যবান সম্পদ চুরি হওয়া থেকে হিফাজত করে।[৭৪] ফলে শত্রু যখন তোমার নিকটে চলে আসে, তখন নফলের অস্ত্রের মুখে পড়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়।

নফলের প্রাচীর তোমাকে শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হতে সাহায্য করে। কেননা, যে ব্যক্তি কেবল ফরজ আদায় করে, শয়তান যদি তার ফরজের ওপর হঠাৎ আক্রমণ করে বসে, তখন সে তা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়। ফলে শয়তান ধাপে ধাপে তার ফরজের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে এবং তদস্থলে হারাম ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু যে ব্যক্তির ধনভান্ডারে নফলের মজুদ আছে, তখন শয়তান লুট করতে এসে যদি কিছু নিয়ে যেতে পারে, তা নফল থেকেই নিতে পারে। ফরজ তথা মূলধন সম্পূর্ণ সুরক্ষিত থাকে। ফলে সে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যায়। এ জন্যই বলা হয়, ফরজের ঘাটতি পূরণের জন্যই নফলের প্রবর্তন করা হয়েছে। একটি হাদিস এই বক্তব্যকে সুদৃঢ় করে। যেখানে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন যখন বান্দার নামাজের হিসাব নেওয়া হবে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাদের বলবেন (انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوا بِهَا فَرِيضَتَهُ؟ ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ) : 'দেখো, এই বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কি না, যা দ্বারা ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করতে পারবে?' তারপর এভাবে জাকাতসহ অন্যান্য আমলের হিসাব করা হবে।'[৭৫]

(ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ) 'তারপর এই পদ্ধতিতে অন্যান্য আমলের হিসাব নেওয়া হবে।' কথাটি আরেকবার পড়ো। এ থেকে বোঝা যায়, প্রত্যেক ফরজ ইবাদতের নফল ভার্সন রয়েছে।

---

৭৪. ৬ নং ফায়দা : ইবনুল কাইয়িম ﷺ মনে করেন, পুণ্যকর্ম পাপকর্মকে প্রতিহত করে এবং ভালো কাজ খারাপ কাজকে বাধাগ্রস্ত করে। তাই তিনি বলেন, 'গুনাহের মূল হচ্ছে, ওয়াজিব (অবশ্যপালনীয় আমলসমূহ) আদায় না করা, নিষিদ্ধ কর্ম করা নয়।' (আল-মাদারিজ : ২/১৫৬)

৭৫. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৬১৪, সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৪২৬।

- পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের নফল ভার্সন হচ্ছে তাহাজ্জুদ, মধ্যদিনের নামাজ, বিতির এবং ফরজ নামাজের পূর্বে ও পরে নির্ধারিত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ নামাজ।
- জাকাতের নফল ভার্সন হচ্ছে সদাকা, করজে হাসানা[৭৬] ও ঋণ মাফ করা।[৭৭]
- রমাদানের রোজার নফল ভার্সন হচ্ছে নফল রোজাসমূহ, যার মধ্যে রয়েছে শ্বেত দিনসমূহের (প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের) রোজা[৭৮], সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা, আরাফাত দিবসের রোজা, আশুরার (১০ মহররম) রোজা ইত্যাদি।
- হজের নফল ভার্সন হচ্ছে উমরা এবং অন্যের পক্ষ থেকে হজ করা।

এখন নিশ্চয় তোমার সামনে চূড়ান্ত সফলতা অর্জনের রোডম্যাপ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

---

৭৬. ৭ নং ফায়দা : করজ দেওয়া বা করজ মাফ করে দেওয়া সম্পর্কে অনেক সাহাবি ও সালাফের রায় হলো, এটা সদাকা করার চেয়ে উত্তম। কেননা, নবি ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি পরিশোধে অক্ষম কোনো ঋণগ্রহীতাকে (তার সচ্ছলতা আসা অবধি) অবকাশ দেবে, সে ঋণ পরিশোধ করার সময় হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ঋণের পরিমাণ সদাকা করার সাওয়াব পাবে। অতঃপর ঋণ পরিশোধ করার সময় হওয়ার পরে সময় বাড়িয়ে দিলে প্রতিদিন সে পরিমাণ সদাকা করার সাওয়াব পাবে।' (মুসনাদু আহমাদ, সুনানু ইবনি মাজাহ, সহিহুল জামি : ৬১০৮)

৭৭. মুসনাদে আহমাদ ও সহিহ মুসলিমে আবু কাতাদা ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি পরিশোধে অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে অবকাশ দেবে (পরিশোধের মেয়াদকাল বাড়িয়ে দেবে), অথবা ক্ষমা করে দেবে (ঋণ মাফ করে দেবে), কিয়ামতের দিন সে আরশের ছায়াতলে স্থান পাবে।' (সহিহুল জামি : ৬৫৭৬)

৮ নং ফায়দা : মুনাবি ﷺ বলেন, 'কারণ, ঋণপরিশোধে অক্ষম হওয়া দুনিয়াতে মানুষের জন্য বড় একটি দুর্দশা ও মুসিবত। তাই কেউ যদি কোনো ব্যক্তি থেকে দুনিয়ার এই বিপদ দূর করে দেয়, কিয়ামতের দিন তার আখিরাতের বড় বিপদ দূর হয়ে যাবে। অর্থাৎ কিয়ামতের ভয়াবহ কষ্ট থেকে সে রেহাই পাবে এবং সম্মানিত স্থানে স্থান পাবে। এ জন্যই সালাফগণ বলেন, "অনেক সময় নফল আমলের সাওয়াব ও প্রতিদান ওয়াজিব আমলের সাওয়াবের চেয়ে বেশি হয়।"' (ফাইজুল কাদির : ৬/৩০৩)

৭৮. রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখে, সে যেন সারাজীবন রোজা রাখে।' (মুসনাদু আহমাদ, সুনানুত তিরমিজি, সহিহুল জামি : ৬৩২৪) অন্য একটি হাদিসে রাসুল ﷺ সেই তিনদিন নির্ধারিত করে দিয়েছেন : 'প্রতিমাসের তিনটি রোজা রাখা মানে আজীবন রোজা রাখা। সেই তিনদিন হচ্ছে, শ্বেত দিনসমূহ তথা (চান্দ্রমাসের) ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।' (সুনানুন নাসায়ি, বাইহাকি, সহিহুল জামি : ৩৮৪৯)

একটি চমৎকার নফল ইবাদত

ইলম অর্জন করা অন্য অনেক নফল ইবাদতের চেয়ে একটি উৎকৃষ্ট নফল ইবাদত। সহিহ হাদিসে এসেছে :

فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ

> 'আমার কাছে ইবাদতের আধিক্যের চেয়ে ইলমের আধিক্য বেশি প্রিয়।'[৭৯]

আবু দারদা ﷺ বিষয়টি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি বলেন, 'রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে একটি মাসআলা শিখা আমার কাছে অধিক প্রিয়।'[৮০]

উম্মাহর আরও দুজন নেতৃস্থানীয় আলিম সুফইয়ান সাওরি ও শাফিয়ি ﷺ দৃঢ় কণ্ঠে বলেন :

'ফরজের পরে ইলম অর্জন করার চেয়ে উত্তম কোনো আমল নেই।'[৮১]

ইবনুল জাওজি ﷺ 'তালবিসু ইবলিস' নামক কিতাবের শুরুতে ইবাদতে আগ্রহী লোকদের ইলম অর্জনের ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি বসরার ইমাম মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহর একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

'ইলমের আধিক্য ইবাদতের আধিক্য অপেক্ষা উত্তম।'

শামের বিখ্যাত আবিদ ইউসুফ বিন আসবাতের একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন :

'ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা সত্তরটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চেয়ে উত্তম।'

---

৭৯. মুসনাদুল বাজ্জার : ২৯৬৯, মুসতাদরাকুল হাকিম : ৩১৪, সহিহুল জামি : ৪২১৪।
৯ নং ফায়দা : ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'আমলের সাওয়াব সেই আমলের উপকারিতা ও ফায়দার ভিত্তিতে হয়।

৮০. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ১/৯।

৮১. জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাজলিহি : ১/১২৩-১২৪।

ইরাকের ইয়াকুত খ্যাত মুআফি বিন ইমরানেরও একটি কথা উল্লেখ করেছেন :

‘একটি হাদিস লিপিবদ্ধ করা আমার কাছে এক রাত তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে বেশি প্রিয়।’[৮২]

বদরুদ্দিন বিন জামাআহ ﷺ ইলমপিপাসুদের দারুণ একটি কথা উপহার দিয়েছেন। সেখানে তিনি ইলম অর্জনের ফজিলত ও গুরুত্বের ছয়টি কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন :

‘আল্লাহর জন্য ইলম অর্জন করা নামাজ, রোজা, তাসবিহ, দুআ প্রভৃতি শারীরিক ইবাদতের চেয়ে উত্তম। কেননা :

- ইলমের উপকারিতা তার অর্জনকারীকে যেমন অন্তর্ভুক্ত করে, তেমনই সাধারণভাবে সকল মাখলুককেও অন্তর্ভুক্ত করে।
- ইলম অন্যান্য ইবাদতকে সংশোধন করে। সুতরাং সেগুলো ইলমের প্রতি মুখাপেক্ষী এবং নির্ভরশীল। কিন্তু ইলম সেগুলোর প্রতি মুখাপেক্ষী নয়।
- তদুপরি, হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী আলিমগণ নবিগণের উত্তরসূরি। আবিদগণের ব্যাপারে এমন কথা বলা হয়নি।
- ইলমের ব্যাপারে সাধারণ লোকদের ওপর আলিমের আনুগত্য করা ওয়াজিব।
- ইলমের প্রভাব তার ধারকের মৃত্যুর পরেও জীবিত থাকে; কিন্তু অন্যান্য নফলের প্রভাব তার আদায়কারী মারা যাওয়ার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যায়।
- ইলম বাকি থাকলে শরিয়াহ জীবিত থাকবে এবং উম্মাহর নিদর্শনসমূহ সুরক্ষিত থাকবে।’[৮৩]

---

৮২. তালবিসু ইবলিস : পৃ. ১২১।

৮৩. তাজকিরাতুস সামি : পৃ. ১৩।

১০ নং ফায়দা : ইবনে হাজম ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি ইলম নিয়ে কৃপণতা করে, সে সম্পদ নিয়ে কৃপণতাকারী ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক নিকৃষ্ট। কেননা, যে ব্যক্তি সম্পদ নিয়ে কৃপণতা করে, সে এমন বস্তু নিয়ে কৃপণতা করে, যা খরচ করলে কমে যায়। কিন্তু কৃপণ আলিম এমন বস্তু নিয়ে কৃপণতা করে,

আল্লাহর ভালোবাসার স্তরে পৌঁছানোর লক্ষণ

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, নিয়মিত নফল ইবাদতের ফলে অর্জিত চূড়ান্ত সফলতা হচ্ছে আল্লাহর ভালোবাসা। তবে সফলতার এই স্তরে উপনীত হওয়ার আলামত কী? খোদ আল্লাহই জানিয়ে দিচ্ছেন তার আলামত :

'আমি তার কান, চোখ, হাত ও পা হয়ে যাই!'

- ফলে তোমার কান তার রবের নির্দেশ মেনে চলে, শয়তান ও মন্দকর্মের নির্দেশ দানকারী নফসের কথা শোনে না। যেহেতু কান দিয়ে যা-ই প্রবেশ করে, তা-ই কলবে স্থানান্তরিত হয়, তা-ই তোমার জীবিত কলব খুব সতর্ক থেকে আল্লাহর বিধানবিরোধী বিষয়গুলোকে প্রতিহত করে। ফলে এরপর থেকে কান কেবল বিধিসম্মত বিষয়গুলোকেই গ্রহণ করে। তাই যেকোনো ধরনের ভ্রান্ত চিন্তা ও বিভ্রান্ত মানহাজের ব্যাপারে তোমার কান বধির এবং কলব তালাবদ্ধ হয়ে থাকে।

- তোমার চোখ দূরদর্শী হয়। কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর ওপর তা নিবদ্ধ হয় না। অজান্তে নিবদ্ধ হলে দ্রুত ফিরে আসে। তুমি সবকিছু আখিরাতের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শুরু করো। ফলে যেসব বিষয় আখিরাতের ধনভান্ডার সমৃদ্ধ করে তা তোমার চোখে সুন্দর দেখায়, আর যেসব বিষয় আমল পরিমাপের মানদণ্ডে তোমার সাওয়াবের পাল্লা হালকা করবে, তা অসুন্দর দেখায়। চোখের এই ক্ষমতা তুমি এ জন্যই লাভ করেছ যে, তুমি দৃষ্টিকে সংযত ও অবনত রেখেছ। ফলে আল্লাহ তাআলা তোমার দৃষ্টিকে দূরদর্শী করে দিয়েছেন। অপরদিকে অন্যজন তার দৃষ্টিকে বিক্ষিপ্ত ছেড়ে দিয়েছে। যেখানে ইচ্ছা নিবদ্ধ করেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদর্শিতা ছিনিয়ে নিয়েছেন।

যা যতই খরচ করুক, ফুরায় না।' (আল-আখলাকু ওয়াস সিয়ার : ১/২২)

- যেদিকে গেলে তোমার রব অসন্তুষ্ট হন, তোমার পা সেদিকে অগ্রসর হয় না। আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং সৃষ্টির সেবার প্রতি ধাবিত হয়। দাওয়াহ ও কল্যাণের অলিগলিতে বিচরণ করে। অকল্যাণ, জুলুম, জালিমের সহায়তা ও পাপিষ্ঠদের প্রাঙ্গণে আনাগোনা করে না।

- তোমার হাত আল্লাহর পথে অবিরাম লিখে চলে। কাজ করে। কষ্ট সহ্য করে। এতটুকুই নয়; বরং জালিমের জুলুম প্রতিহত করতে ব্যবহৃত হয় তোমার হাত। অসহায়দের সাহায্যে এগিয়ে যায়। জুলুম ও সীমালঙ্ঘনে অংশ নেয় না। হারাম স্পর্শ করে না। চুরি করে না। খিয়ানত করে না।

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হলে তুমি সত্যিকার অর্থে তাঁর দাসে পরিণত হবে। তাঁর বিধিনিষেধের সামনে নিরঙ্কুশ আত্মসমর্পিত হবে। ফলে তোমার সম্পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে সেসব বিষয়ের প্রতি, যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। যেসব বিষয় তাঁর অপছন্দনীয়, সেসব থেকে দূরে থাকবে। হালাল দিয়েই তোমার হয়ে যাবে, হারামের দিকে পা বাড়ানোর প্রয়োজন হবে না। আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্যে যতটা সুখ অনুভূত হবে, অন্য কারও নৈকট্যে ততটুকু হবে না।

অধিকাংশ মানুষ ইবাদতের ওপর অটল থাকার ক্ষেত্রে যে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং ভালো ও মন্দ কর্মের ব্যাপারে যে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে, তার সমাধান এটাই। অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য ও সান্নিধ্যে সুখ অনুভব করা। সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হলে ভালো-মন্দের মধ্যকার দ্বিধাবোধ কেটে গিয়ে ভালোর ওপর স্থিরতা সৃষ্টি হয়। ফিতনা ও অশ্লীলতার এ যুগে এটাই চরম আকাঙ্ক্ষিত বিষয়।

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হলে তোমার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত হবে। আল্লাহপ্রেম তোমার হৃদয়ের কর্তৃত্ব নিয়ে নেবে। ফলে তুমি সেটাই দেখতে পাবে, যা আল্লাহর পছন্দনীয়। তা-ই শুনতে পাবে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। আসলে মনের অবস্থা এমন হওয়াটাই আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা থাকার প্রমাণ।

প্রেমিকা আবলার প্রতি কবি আনতারার ভালোবাসা কত গভীর ছিল, তা জানলে আল্লাহপ্রেমের দাবিদার বান্দাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। কবি বলেন :

‘তোমাকে আমার তখনও মনে পড়েছে, যখন বর্শা আমার রক্ত চুষছিল এবং আমার ভারতীয় শুভ্র তরবারি থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরছিল। তখন আমার মনে হয়েছিল তরবারির গায়ে চুমু এঁকে দিই। কারণ, তা তোমার হাস্যময়ী উষ্টদ্বয়ের মতো ঝিকমিক করছিল।’

দেখো, যুদ্ধের উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেও কবি তার প্রিয়তমাকে ভুলে থাকতে পারেননি। বরং শত্রুর তরবারি ও বর্শার চমকে প্রেয়সীর হাসিমুখ দেখতে পেয়েছেন। এই যদি হয় সৃষ্টির প্রতি সৃষ্টির ভালোবাসা, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, তাহলে স্রষ্টার প্রতি আমাদের প্রেম-ভালোবাসা কেমন হতে হবে!? তদুপরি, তিনি আমাদের কেবল স্রষ্টাই নন; বরং তিনি আমাদের এমন প্রভুও বটেন, যিনি আমাদের দান করেছেন অসংখ্য অগণিত নিয়ামত; যিনি আমাদের ভালোবেসেছেন আমরা তাঁকে ভালোবাসার পূর্বে; আমাদের স্মরণ করেছেন আমরা তাঁকে স্মরণ করার আগে এবং আমাদের তাঁর প্রিয়জন করেছেন; অথচ তাঁর প্রিয়জন হওয়ার কোনো যোগ্যতাই আমাদের নেই!

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হওয়ার আরেকটি নিদর্শন হচ্ছে অবস্থার পরিবর্তন ও উন্নয়ন। তার কয়েকটি স্বরূপ এখানে তুলে ধরা হলো :

- কুরআন তিলাওয়াত করার প্রাথমিক অবস্থা থেকে কুরআন বুঝে পড়া, কুরআন নিয়ে পরিশোধিত ও প্রভাবিত হওয়া এবং কুরআন তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করার অবস্থায় উন্নীত হওয়া।
- রাগ দমন করার অবস্থা, মন্দ আচরণকারীকে ক্ষমা করা এবং তার সাথে সদাচরণ করায় পরিবর্তিত হওয়া।
- দায়িত্ববোধ থেকে জাকাত আদায় করার অবস্থা থেকে আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করতে আনন্দ অনুভব করা অবস্থায় উন্নীত হওয়া।
- আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট সহ্য করা ও ধৈর্যধারণ করার অবস্থা উন্নত হয়ে তাকদিরের ফয়সালার ওপর আনন্দিত হওয়ার অবস্থা আসা।

শেষকথা :

জেনে রাখো, আল্লাহর অলি বা বন্ধু হওয়ার জন্য একদম গুনাহমুক্ত থাকা শর্ত নয়। বরং গুনাহ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে কম্পন অনুভব করা এবং গুনাহের ওপর অটল না থেকে দ্রুত সত্য দিলে তাওবা করে নেওয়া যথেষ্ট। প্রকৃত অলি গুনাহকে তা-ই মনে করে, যেমনটা ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেছেন :

'নিষিদ্ধ স্বাদ যখন গ্রহণ করা হয়, তখন তা হয় কদর্যতা-মিশ্রিত। গ্রহণ করার পর হয়ে পড়ে ব্যথা-যন্ত্রণা সৃষ্টিকারী।'[৮৪]

সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান

নিয়মিত নফল ইবাদতের সর্বোচ্চ প্রতিদানের কথা এখনো বলা হয়নি। এই প্রতিদান তা অর্জনকারীর জন্য সুমহান মর্যাদা ও অকল্পনীয় সুখের মোহনা। তা হচ্ছে, সে যা-ই চাইবে, তা-ই পেয়ে যাবে :

وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ

'সে যদি আমার কাছে চায়, আমি তাকে অবশ্যই দান করব।'[৮৫]

এবং যা থেকে সে বেঁচে থাকতে চাইবে, তা তার থেকে দূর হয়ে যাবে :

وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

'আর যদি সে কোনো কিছু থেকে আমার কাছে পানাহ চায়, আমি তাকে অবশ্যই পানাহ দেবো।'[৮৬]

কাঙ্ক্ষিত বস্তু পাওয়া এবং অপছন্দনীয় বস্তু থেকে বেঁচে থাকা—দুনিয়াতে মানুষের এ দুটিই তো সবচেয়ে বড় কামনার বস্তু। যার এ দুটি অর্জিত হলো, সে যেন গোটা পৃথিবীটাই পেল।

৮৪. আল-ফাওয়ায়িদ : ১/১৯২।
৮৫. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২।
৮৬. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২।

উল্লিখিত গুণাবলি নিয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রকৃত অলি হয়, সে কোনো কিছুর কামনা করলে আল্লাহ তা প্রদান করেন এবং কোনো কিছু তার অপছন্দনীয় হলে আল্লাহ তাআলা তা দূর করে দেন। সে হয় আল্লাহর প্রিয়জন, নিকটজন। আল্লাহর কাছে তার জন্য থাকে বিশেষ মর্যাদার আসন। তার দুআ কবুল হয়। এই পুরস্কারদুটির ওয়াদা দেওয়ার সময় আল্লাহ তাআলা শব্দের মধ্যে অলংকারিক দৃঢ়তাসূচক দুটি অব্যয় ব্যবহার করেছেন। অথচ তাঁর ওয়াদার জন্য কথার মধ্যে দৃঢ়তাবোধক শব্দ আনার কোনো প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও তিনি বান্দাদের অন্তরে তাঁর অবারিত রহমত মুষলধারে বর্ষণ করে বিশ্বাসের ফসল উৎপাদন করতে চেয়েছেন। স্থিরতা ও নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সম্ভবত এ কারণেই জনৈক সালাফ দৃঢ়তার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে বলতে পেরেছেন :

'যদি তোমরা তোমাদের পালনকর্তার আনুগত্য করো, তাহলে তিনি তোমাদের অবাধ্য হবেন না (অর্থাৎ তোমরা তাঁর নিকট কোনোকিছু চাইলে তিনি ফিরিয়ে দেবেন না)।'

তারা দুআ কবুল হওয়ার অধিকার লাভ করেন

হাদিসে আল্লাহর প্রকৃত বন্ধুদের একটি গুণের বর্ণনায় এসেছে :

كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ

'মাথায় উশকোখুশকো চুল ও দেহে ধূলিমলিন দুখানা পুরাতন কাপড় পরিহিত এরূপ অনেক ব্যক্তি রয়েছে, যার প্রতি লোকেরা দৃষ্টিপাত করে না। অথচ সে আল্লাহর ব্যাপারে শপথ করে কোনো কথা বললে তিনি তা সত্যে পরিণত করেন। বারা বিন মালিক তাদের একজন।'[৮৭]

৮৭. সুনানুত তিরমিজি : ৩৮৫৪।
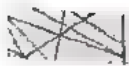
আল্লাহর কাছে একজন বান্দার অবস্থান কতটা উন্নত হলে সে আল্লাহর ব্যাপারে কসম করতে পারে! অন্য কোনো বান্দা যদি এভাবে শপথ করে, তা বেয়াদবি ও দাসত্বের শিষ্টাচারবহির্ভূত বিবেচিত হবে। কারণ, আল্লাহর জন্য কোনো কিছুই বাধ্যতামূলক নয়। তিনি মহান স্রষ্টা। যা ইচ্ছা তা-ই করার একচ্ছত্র ক্ষমতা আছে তাঁর। কিন্তু তিনি এ বান্দার সম্মানার্থে তার শপথ পূরণ করাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নিয়েছেন! অর্থাৎ সে যদি শপথ করে কোনো কিছু সংঘটিত হওয়ার কথা বলে, আল্লাহ তাআলা তা সংঘটিত করেন; যাতে তার শপথ ভঙ্গ না হয়। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর কাছে উক্ত বান্দার উচ্চ অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বহন করে।

এবার দেখি, বারা বিন মালিক ﷺ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার কীভাবে করেছেন। কী ছিল তাঁর স্বপ্ন, যার জন্য তিনি আল্লাহকে ডেকেছেন?

তা কি দুনিয়ার সম্পদ ও প্রাচুর্য?

না সুন্দরী কোনো স্ত্রী বা ফলে ফুলে সুশোভিত কোনো কানন?

না তা ছিল ক্ষমতা, প্রভাব বা রাজত্ব?

আল্লাহর কসম, তিনি এসবের কিছুই চাননি। বরং তুসতার যুদ্ধের দিন সৈন্যরা যখন পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়লেন, তখন সবাই তাঁর নিকট জড়ো হলেন। কারণ তাঁর দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর সুসংবাদের কারণে তিনি তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, 'হে বারা, আপনার রবের ওপর কসম করুন!' তখন আল্লাহর এই বন্ধু আল্লাহর নামে কসম করে আবদার জানালেন : 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নামে শপথ করে আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি, আপনি এদের প্রাণে রক্ষা করুন এবং আমাকে শাহাদাত দান করুন!' অথবা বলেছেন, 'আমাকে আপনার নবির সাথে মিলিত করুন!' নবিজি যেভাবে বলেছিলেন, সেভাবে আল্লাহ তাআলা তাঁর শপথ সত্যে পরিণত করেছেন। সবাই প্রাণে রক্ষা পেলেন; কিন্তু তিনি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে নবিজির সাথে মিলিত হলেন।

আরেকজন অলির ঘটনা :

উহুদ যুদ্ধের দিন আমর বিন জামুহ রাসুল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আজকের দিনে যে শহিদ হবে, সে কি জান্নাতে প্রবেশ করবে?' রাসুল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন, 'সেই সত্তার কসম—যাঁর হাতে আমার প্রাণ, আমি আমার পরিবারের নিকট ফিরে আসব না, যতক্ষণ না জান্নাতে প্রবেশ করি।' এ কথা শুনে উমর ﷺ-এর মনে হলো, আমর বিন জামুহ আল্লাহর ব্যাপারে শপথ করেছেন; অথচ আল্লাহর ব্যাপারে শপথ করার অধিকার বান্দার নেই। কারণ আল্লাহর জন্য কোনো কিছুই বাধ্যতামূলক নয়। বরং আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করার একচেটিয়া অধিকার রাখেন। তাই উমর ﷺ রাগান্বিত হয়ে বললেন, 'হে আমর, আল্লাহর ব্যাপারে শপথ করো না।' তখন রাসুল ﷺ বললেন :

مَهْلًا يَا عُمَرُ، فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ: مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ الْجَمُوحِ، يَخُوضُ فِي الْجَنَّةِ بِعَرْجَتِهِ.

'থামো উমর! সে ওইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যারা আল্লাহর ব্যাপারে কসম করে কোনো কথা বললে আল্লাহ তা বাস্তবায়ন করেন। সে তার খঞ্জত্ব নিয়েই (খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে) জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৮৮]

তৃতীয় আরেকজন অলি আনাস বিন নাজার ﷺ-এর ঘটনা :

তাঁর বোন রুবাইয়ি একজন মহিলার সামনের দাঁত ভেঙে দিলেন। এতে ওই মহিলার পরিবারের লোকজন এর কিসাস (দাঁতের বদলে দাঁত ভেঙে দেওয়া) দাবি করল। আনাস ও তাঁর বোন তাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু তারা ক্ষমা করতে অস্বীকার করলেন এবং রাসুল ﷺ-এর কাছে বিচার নিয়ে গেলেন।

৮৮. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৭০২৪, আত-তালিকাতুল হিসান আলা সহিহি ইবনি হিব্বান : ৬৯৮৫। ১১ নং ফায়দা : উমর ﷺ-ও এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনিও আল্লাহর নামে কসম করে একটি কথা বলেছিলেন, যা আল্লাহ তাআলা বাস্তবায়ন করেছেন। হাফসা ﷺ বলেন, 'উমর ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছিলাম, "হে আল্লাহ, আমি আপনার রাস্তায় শহিদ হতে চাই এবং আপনার নবির শহরে মৃত্যুবরণ করতে চাই।" আমি বললাম, "এটা কীভাবে সম্ভব হবে?" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ যদি চান, তাহলে তিনিই এটা সম্ভব করবেন।" (ফাতহুল বারি : ৪/৭১)

রাসুল ﷺ কুরআনের বিধান অনুযায়ী দাঁতের বদলে দাঁত ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন। তখন আনাস ﷺ বললেন :

'ইয়া রাসুলাল্লাহ, রুবাইয়ির দাঁত ভেঙে ফেলা হবে? সেই সত্তার কসম—যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, কেউ তার দাঁত ভাঙতে পারবে না!'

কথাটি তিনি আল্লাহ ও রাসুলের হুকুমের বিরোধিতা করার জন্য বলেননি। বরং এ কথা বলে তিনি মূলত মহিলার পরিবারের লোকজনকে ক্ষমা অথবা রক্তপণের ব্যাপারে সম্মত করতে চাইছিলেন।

রাসুল ﷺ বললেন, (يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ) 'আনাস, আল্লাহর কিতাব তো কিসাসের (দাঁতের বদলে দাঁত) কথা বলে।'

কিন্তু পরক্ষণেই তারা রক্তপণ নেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করল। তখন রাসুল ﷺ বললেন :

إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

> 'আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে, যারা তাঁর নামে কসম করে কোনো কথা বললে, আল্লাহ তাআলা তা সত্যে পরিণত করেন।'[৮৯]

আলিম অলিদের বিশ্বাস

আল্লাহর অলিদের স্বভাব হচ্ছে, তাঁরা উম্মাহর জন্য, উম্মাহর দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য বিশেষভাবে দুআ করতেন। তাঁদের অন্যতম হলেন শাইখুল ইসলাম উস্তাজ আবু উসমান আল-হিয়ারি। তাঁকে খোরাসানের জুনাইদ বাগদাদি বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁর বিস্ময়কর গল্পটি শোনো :

অত্যাচারী আহমাদ বিন আব্দুল্লাহ খুজুস্তানি—যে বিভিন্ন শহরের ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল—ইমাম হাইকান বিন জুহালিকে হত্যা করে

---

৮৯. সহিহুল বুখারি : ২৭০৩।

ফেলল। এরপর থেকে তার জুলুম ও কঠোরতা আরও বেড়ে গেল। তার জুলুম এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গেল যে, তার নির্দেশে একটা বর্শা মাটিতে গেঁথে দেওয়া হলো, তারপর শহরের নেতৃস্থানীয় লোকদের বলা হলো, এর চতুষ্পার্শ্বে দিরহাম ঢালো। দিরহামের স্তূপ যদি বর্শার মাথা অবধি পৌঁছে সেটাকে অদৃশ্য করতে না পারে, তাহলে সবাইকে হত্যা করা হবে। ফলে তারা নিজেদের মধ্যে এই অর্থদণ্ডের পরিমাণ ভাগ করে নিল। জনৈক ব্যবসায়ীকে তিরিশ হাজার দিরহাম দিতে বলল। কিন্তু তার হাতে শুধু তিন হাজার দিরহাম ছিল। তাই সে ওই দিরহামসমূহ নিয়ে শাইখুল ইসলাম আবু উসমান হিয়ারির নিকট আসলো। তাঁকে বলল, 'শাইখ, আপনি তো শুনেছেন, এই লোকটা কী পরিমাণ দিরহাম জমা দিতে বলেছে; কিন্তু আমার কাছে শুধু এটুকুই আছে।' শাইখ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দাও; যাতে এ দিরহামগুলো নিয়ে আমি এমন একটা কাজ করতে পারি, যা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে।' ব্যবসায়ী অনুমতি দিল। তখন তিনি ওই দিরহামগুলো গরিব ও অসহায়দের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। আর ব্যবসায়ীকে বললেন, 'আমার নিকট অবস্থান করো।' শাইখ আবু উসমান সে রাতে ভোর পর্যন্ত মসজিদে আসা-যাওয়া করলেন। ফজরের আজান দিলে তিনি খাদিমকে বললেন, 'বাজারে গিয়ে সেখানের অবস্থা দেখে আসো।' খাদিম ফিরে এসে বলল, 'সেখানে তো উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু লক্ষ করলাম না। এরপর খাদিমকে আবার বাজারে পাঠিয়ে তিনি মুনাজাত ধরলেন। মুনাজাতে আল্লাহকে কসম দিয়ে বললেন, 'আপনাকে কসম দিয়ে বলছি, যতক্ষণ না আপনি দুর্দশাগ্রস্তদের দুর্দশা দূর করবেন, আমি এখান থেকে উঠব না।' বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর খাদিম এসে খবর দিল, 'আল্লাহ তাআলা কিতালকে মুমিনদের জন্য যথেষ্ট করে দিয়েছেন। আহমাদ বিন আব্দুল্লাহর পেট বিদীর্ণ করে দেওয়া হয়েছে।' এ খবর শোনার পর আবু উসমান (ফজরের) নামাজের ইকামত দিলেন।[৯০]

তাঁর মতো আরেকজন হলেন যুগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম ও প্রখ্যাত দায়ি ইলাল্লাহ আলিমকুল সম্রাট ইজ বিন আবদুস সালাম ﷺ। 'তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ' কিতাবের প্রণেতা নিজ কিতাবের মধ্যে তাঁর আলোচনা এবং ইউরোপীয়দের

৯০. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৪/৬৫-৬৬।

দমইয়াত আক্রমণ করার সময় তাঁর দুআ কবুল হওয়া-সম্পর্কিত একটি কারামতের কথা বর্ণনা করেছেন :

ফিরিঙ্গিরা জাহাজের বহর নিয়ে মনসুরা পৌঁছে গেল এবং মুসলিমদের পরাজয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। শাইখ মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। সে সময় মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো মুসলিমদের দিকে প্রবল বেগে বাতাস বইতে লাগল। মুসলিমদের এমন করুণ অবস্থা দেখে শাইখ বাতাসের দিকে হাত দ্বারা ইশারা করে উঁচু স্বরে বললেন, 'হে বাতাস, কাফিরদের ধরো।' এভাবে কয়েকবার বলার পর বিস্ময়করভাবে বাতাস গতিপথ পরিবর্তন করে ফিরিঙ্গিদের নৌবহরের দিকে বইতে শুরু করল। ফলে অধিকাংশ ফিরিঙ্গি ডুবে প্রাণ হারাল। এমন কারামাত দেখে মুসলিম বাহিনীর মধ্য থেকে একজন বলে উঠলেন, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাহর ওই ব্যক্তিকে দেখালেন, যার জন্য তিনি বাতাসকে অনুগত করে দিয়েছেন।'[৯১]

৯১. তাবাকাতুশ শাফিয়িয়্যাহ আল-কুবরা : ৮/২১৬।
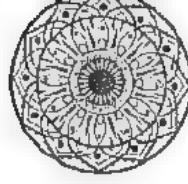
মানুষের ভালোবাসা

আল্লাহ তোমাকে ভালোবেসেছেন; ফলে লোকেরাও তোমাকে ভালোবেসেছে। তুমি তাঁর কাছে এসেছ; ফলে লোকেরাও তোমাকে কাছে টেনে নিয়েছে। কারণ তিনি ছাড়া মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও মনের কর্তৃত্ব অন্য কারও নেই। আসমান ও জমিনে তোমাকে কেবল তিনিই গ্রহণযোগ্যতা দান করতে পারেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালোবাসা দেবেন।'[৯২]

একটি হাদিসে রাসুল ﷺ এ আয়াতের খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন :

إِذَا أَحَبَّ اللهُ العَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحْبِبْهُ، فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ القَبُولُ فِي الأَرْضِ

'যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরিল ﷺ-কে ডেকে বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তুমিও তাকে ভালোবাসো।" তখন জিবরিল ﷺ-ও তাকে ভালোবাসেন। অতঃপর জিবরিল আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন, "নিশ্চয় আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তাই তোমরাও তাকে ভালোবাসো।" তখন আসমানবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে

৯২. সুরা মারইয়াম, ১৯ : ৯৬।

শুরু করেন। অতঃপর পৃথিবীতে তার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়।[৯৩]

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﷺ উল্লিখিত আয়াত ও হাদিস শোনার সাথে সাথেই বলে উঠলেন :

'যখন কোনো বান্দা নিজের অন্তর দিয়ে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়, তখন আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরের মাধ্যমে তার প্রতি মনোযোগী হন।'[৯৪]

হে সৎকর্মশীল ভাই, এই গ্রহণযোগ্যতা তোমার জান্নাতের সার্টিফিকেট এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ। তোমার ইবাদত তোমার জন্য মানুষের অন্তরসমূহ খুলে দেয়। তদ্রূপ তোমার পাপ তোমার জন্য মানুষের অন্তরসমূহকে তালাবদ্ধ করে দেয়; ফলে মানুষের মনে তোমার প্রতি অনুগ্রহ ও ভালোবাসা থাকে না। এ জন্যই আবু দারদা ﷺ মাসলামা বিন মাখলাদ আনসারি ﷺ-কে চিঠি লিখলেন :

'পরসমাচার এই যে, বান্দা যখন আল্লাহর ইবাদত করে, তখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর যখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে তাঁর মাখলুকের মাঝে প্রিয় করে তোলেন। কিন্তু যখন সে তাঁর নাফরমানি করে, তখন তিনি তাকে ঘৃণা করেন। আর তিনি যাকে ঘৃণা করেন, মাখলুকের মনেও তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন।'[৯৫]

নিচে আরেকটি হাদিসে তোমার জন্য মহা সুসংবাদ অপেক্ষা করছে। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন আবুল আসওয়াদ দুয়ালি। তিনি বলেন :

আমি মদিনায় গিয়ে উমর বিন খাত্তাব ﷺ-এর মজলিশে বসলাম। তখন উপস্থিত লোকদের পাশ দিয়ে একটি মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হলে তারা মৃত লোকটির প্রশংসা করলেন। তা দেখে উমর ﷺ বললেন, 'তার জন্য আবশ্যক হয়ে গিয়েছে।' আমি উমর ﷺ-কে বললাম, 'কী আবশ্যক হয়ে গিয়েছে?' তিনি বললেন, 'আমি তা-ই বলেছি, যা রাসুল ﷺ বলেছেন :

---

৯৩. সহিহুল বুখারি : ৩২০৯, সহিহু মুসলিম : ২৬৩৭।
৯৪. আজ-জুহদুল কবির : ১/২৯৯।
৯৫. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/২৪০।

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

"যে মুসলিমের পক্ষে তিনজন ব্যক্তি (ভালো হওয়ার) সাক্ষ্য দেবে, তার জন্য জান্নাত আবশ্যক হয়ে যায়।"

তখন আমরা বললাম, "দুজন সাক্ষ্য দিলেও কি একই কথা?" তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, দুজন সাক্ষ্য দিলেও।" এরপর একজনের ব্যাপারে আমরা জিজ্ঞাসা করিনি।'[৯৬]

এখানে কারও মনে একটি অমূলক প্রশ্ন আসতে পারে যে, দ্বিতীয় হাদিসটি প্রথম হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা, দ্বিতীয় হাদিসে মাত্র তিনজন বা দুজনের সাক্ষ্য জরুরি হওয়ার কথা বলা হয়েছে, যেখানে প্রথম হাদিসে অগণিত, অসংখ্য মুসলিমের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

আগেই বলেছি, প্রশ্নটি অমূলক। দুই হাদিসের মধ্যে কোনো ধরনের বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ নেই। কারণ, প্রথম হাদিসে গ্রহণযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে, যা কেবল মানুষের মুখে শোনার মাধ্যমেই সাব্যস্ত হয়ে যায়। তাই সেখানে অধিক লোকের গ্রহণযোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সাক্ষ্য, যার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে তার অবস্থা পূর্ণরূপে জানার পরে দেওয়া হয়। তাই সেখানে চারজন, তিনজন বা দুইজনের সাক্ষ্যই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে।

যদি তুমি তোমার রবের আনুগত্য করো, তাহলে তিনি তোমাকে প্রতিদান দেবেন। অচিরেই আল্লাহ তাআলা মাখলুকের অন্তরে তোমার প্রভাব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। ফলে তাদের জিহ্বা তোমার প্রশংসা করবে এবং পৃথিবীতে তোমার কখনো নিজেকে একা মনে হবে না। একাকিত্বের কষ্টে তোমাকে ভুগতে হবে না। এটাই মুমিনের জন্য আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আগাম সুসংবাদ। এ জন্যই কাব ﵁ বলতেন :

'দুনিয়াতে কোনো বান্দার তখনই প্রশংসা করা হয়, যখন আসমানে তার প্রশংসা করা হয়।'[৯৭]

---

৯৬. সুনানুত তিরমিজি : ১০৫৯।
৯৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৩৬৭।

তবে যার তার প্রশংসা তোমার কাজে আসবে না। তোমার ব্যাপারে তাদের প্রশংসাই তোমার কাজে আসবে, যাদের সাথে তুমি মেলামেশা করো এবং জীবন কাটাও। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে সত্যবাদী ধরা হবে তোমার প্রতিবেশীদের। এ জন্যই একটি সহিহ হাদিসে তোমার ভালো হওয়া ও খারাপ হওয়ার মানদণ্ড স্থির করা হয়েছে প্রতিবেশীর সাক্ষ্যকে। রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، وَإِذَا قَالَ جِيرَانُكَ: إِنَّكَ مُسِيءٌ فَإِنَّكَ مُسِيءٌ

'যখন তোমার প্রতিবেশীরা তোমার ব্যাপারে বলে যে, তুমি ভালো মানুষ, তাহলে তুমি ভালো মানুষ। আর যদি তারা তোমাকে খারাপ মানুষ বলে, তাহলে তুমি খারাপ মানুষ।'[৯৮]

দুনিয়াতে মানুষের প্রশংসা ও ভালোবাসার নিয়ামত আখিরাতের নিয়ামতের সুসংবাদ। যাদের অন্তরে প্রাণ আছে, ইমানের নুর আছে, তারা এটা উপলব্ধি করতে পারেন। তাদেরই একজন হলেন আলিমকুল শিরোমণি সুফইয়ান সাওরি ﵀। তিনি তোমার হৃদয়ের জন্য চমৎকার একটি বাণী উপহার দিয়েছেন :

'আল্লাহ তাআলা এমন নন যে, কোনো বান্দাকে দুনিয়াতে (মানুষের প্রশংসা ও ভালোবাসার) নিয়ামত দান করবেন; কিন্তু আখিরাতে তাকে লাঞ্ছিত করবেন। কেননা, তিনি কাউকে অসম্পূর্ণ নিয়ামত দান করেন না। যাকে দান করেন, তাকে পরিপূর্ণরূপে দান করেন। এটাকে তিনি নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছেন।'[৯৯]

এবার তুমি রাসুল ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদিসের অর্থ ও রহস্য ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে :

مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ مِائَةٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ

---

৯৮. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৫২৫, মুসনাদুল বাজ্জার : ১৬৭৫।
৯৯. উদ্দাতুস সাবিরিন : পৃ. ১৩৭।

'যে ব্যক্তির জানাজার সালাতে একশ জন (ইমানদার) লোক শরিক হয়, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[১০০]

নিঃসন্দেহে এটা তার গ্রহণযোগ্যতার লক্ষণ। এ সৌভাগ্য তখনই অর্জিত হবে, যখন তুমি আল্লাহর বিধান ও সন্তুষ্টিকে সকল কিছুর ওপর প্রাধান্য দেবে।

ভাইদের আয়নায় নিজের চেহারায় কলঙ্ক দেখতে পেলে

একজন মুমিন অপর মুমিনের জন্য আয়নাস্বরূপ। তাই কখনো যদি তোমার সঙ্গী ও ভালো লোকদের মধ্যে তোমার প্রতি পরিবর্তন ও রূঢ়তা লক্ষ করো, তাহলে ধরে নেবে, রবের সাথে তোমার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফুজাইল ﵀ বলেন :

'মাঝেমধ্যে সময় তোমার বিরুদ্ধে প্রবাহিত হয় এবং মুমিন ভাইয়েরা তোমার থেকে দূরে সরে যায়। তোমার পাপের কারণেই এমনটা হয়।'[১০১]

ঠিক এ কথাটাই রাসুল ﷺ হাদিসের মধ্যে বলেছেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ، فَإِنْ كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَنًا وُضِعَ فِي الْأَرْضِ، وَإِنْ كَانَ صِيتُهُ سَيِّئًا وُضِعَ فِي الْأَرْضِ

'আসমানের মধ্যে প্রত্যেক বান্দার খ্যাতি আছে। সুতরাং কোনো বান্দা যদি আসমানে সুখ্যাত হয়, তার সুখ্যাতি দুনিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে। আর যে বান্দা আসমানে কুখ্যাত, দুনিয়াতেও তার কুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।'[১০২]

কুখ্যাত ব্যক্তিকে মানুষ অপছন্দ করে। ঘৃণার নজরে দেখে। যদিও তাদের সাথে তার চলাফেরা খুব কম ও নিয়ন্ত্রিত হোক। মানুষের অন্তরসমূহ তাকে ভারী মনে করে। তার সাথে থাকতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। এটা একমাত্র সেই

---

১০০. আল-মুজামুল কাবির : ৫০৩, সহিহুল জামি : ৫৭১৬।
১০১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৪/৫৪।
১০২. মুসনাদুল বাজ্জার : ৯২০২।

পাপের শাস্তি, যা সে নিজের মালিকের সাথে করেছে। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে তার পাপের শাস্তি দিয়েছেন তাই তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, তুমি মানুষের দৃষ্টিতে তখনই ঘৃণিত হবে, যখন আল্লাহর দৃষ্টিতে ঘৃণিত হবে।

এমনকি আল্লাহ তাআলা ভালো লোকের কথাকে মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য করে তোলেন; যদিও সে কথা বাহ্যিকভাবে খারাপ হোক। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সাথে যার সম্পর্ক খারাপ, সে নিজের কথা মানুষের মাঝে যতই রচাতে চাক, মানুষের অন্তর সে কথা মেনে নেয় না এবং তার থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তার বাস্তব প্রমাণ দেখেছেন বিশিষ্ট ফকিহ ইবরাহিম নাখয়ি ﵀। তাই তিনি বলেন :

'যখন কোনো ব্যক্তি ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে বাহ্যিকভাবে শুনতে খারাপ লাগে এমন কোনো কথা বলে, আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে সে কথার পক্ষে অজুহাত সৃষ্টি করে দেন। ফলে তারা বলে, "লোকটি কথাটি যেভাবেই বলুক, কথা কিন্তু ভালোর জন্যই বলেছেন।" অপরদিকে, যদি কোনো ব্যক্তি খারাপ উদ্দেশ্যে সুন্দর কথা বলে, আল্লাহ তাআলা মানুষের মনে তার মনের অবস্থা জানিয়ে দেন। তাই তারা বলেন, "লোকটির কথা ঠিক; কিন্তু মতলব খারাপ।"'[১০৩]

এ জন্যই মুহাম্মাদ বিন হিব্বান আল-বুস্তি একটি সুদৃঢ় মূলনীতি দাঁড় করিয়েছেন, যা তিনি মূলত নবিজি ﷺ-এর হাদিস থেকেই চয়ন করেছেন। মূলনীতিটি নিম্নরূপ :

'যার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালো, আল্লাহ তাআলা তার বাইরের অবস্থাও ভালো করে দেন। যার অভ্যন্তরীণ অবস্থা খারাপ, আল্লাহ তাআলা তার বাইরের অবস্থাও খারাপ করে দেন।'[১০৪]

তবে বাস্তবতা হলো, তোমার অবস্থা সব সময় এক রকম থাকবে না। কখনো তুমি আল্লাহর কাছাকাছি হবে, কখনো দূরে সরে পড়বে। কখনো তিনি তোমাকে ভালোবাসবেন, কখনো তোমার প্রতি ক্রুদ্ধ হবেন। কারণ তোমার

---

১০৩. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/২২৯-২৩০।
১০৪. রওজাতুল উকালা : পৃ. ২৭।

ইমানের অবস্থা সব সময় এক ধরনের থাকবে না। দিনে ভালো তো রাতে খারাপ, রাতে ভালো তো দিনে খারাপ এ ধরনের অবস্থা হবে। তাই যেদিন তুমি আল্লাহর সকল বিধিনিষেধ মেনে চলবে, কোনোরূপ উদাসীনতা করবে না, সেদিন তুমি রবের একদম নিকটে চলে যাবে। কিন্তু পরেরদিন হয়তো তুমি শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়ে যাবে; ফলে মনের চাহিদা অনুযায়ী তুমি করে বসবে কোনো গুনাহ। তখন গতকাল যে অবস্থানে তুমি ছিলে, সেখান থেকে নিচে পড়ে যাবে।

আল্লাহর কাছে তোমার অবস্থানের উন্নতি হয়েছে নাকি অবনতি, তা মাখলুকের আচরণেই তুমি বুঝতে পারবে, যদি তোমার হৃদয়ে প্রাণ থাকে। ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ কী বলতে চেয়েছেন, তা ভালোভাবে অনুধাবন করো :

'আমি যখন গুনাহ করি, তখন তার লক্ষণ দেখতে পাই আমার সাথে আমার গাধার আচরণে।'[১০৫]

অতীত ঠিক করে দেয় ভবিষ্যতের পথ

উস্তাজ মুহাম্মাদ আহমাদ রাশিদ গুনাহের প্রভাব সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ তুলে ধরেছেন তোমার সামনে; যাতে তুমি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো এবং ভবিষ্যতে সতর্ক হতে পারো। তিনি বলেন :

'কোনো ব্যক্তি যখন রাতের বেলা কোনো অন্যায় কাজ করে, যেমন : হয়তো সে কারও গিবত করল, বা কৃপণতা করল, বা কাউকে সাহায্য করতে গড়িমসি করল, বা নামাজ দেরি করে পড়ল, বা কাউকে খারাপ উপাধি দিয়ে সম্বোধন করল, বা ভালো কাজ করতে বাধা দিল, বা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল অথবা প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে লেনদেনে নিজের স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে সাহায্য করেছে, পরদিন তার সাথে কী হবে জানো?

পরদিন যখন সে ঘুম থেকে উঠবে, তখন দেখবে স্ত্রী খুব রেগে আছে! কোনো কারণ ছাড়াই তার সাথে রূঢ় আচরণ করছে! কিছুক্ষণ পর সে বকবক করতে

১০৫. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৮/১০৯।

করতে পুরো ঘর মাথায় তুলবে। তাকে নানান ধরনের শব্দ ব্যবহার করে ভর্ৎসনা করতে শুরু করবে। অনেক সময় এমন হবে যে, তার ছেলের জুতো খুঁজতে খুঁজতে আধা ঘণ্টা চলে যাবে; ফলে তার স্কুলে দেরি হয়ে যাবে। সেদিনের খাবারে লবণ বেশি হওয়ার ফলে খেতে কষ্ট হবে। তার গাড়িটি অবাধ্য জন্তুর মতো তাকে কষ্ট দেবে, তার সময় নষ্ট করবে। চলা শুরু করার পর রাস্তার মাঝখানে লাল সিগন্যালে আটকা পড়ে যাবে। সামান্য ইস্যু নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের সাথে ঝামেলা বেধে যাবে। সব শেষ করে যখন অফিসে পৌঁছাবে, তখন অফিসের অবস্থা গোলযোগপূর্ণ দেখতে পাবে একদিকে থাকবে কাজের চাপ, অপরদিকে দেরি করে অফিসে আসার জন্য বসের রাগ। কাটা যেতে পারে মাইনেও। এরপর যখন দুপুরের খাবার খেতে যাবে, তখন দেখবে, খাবার সব পুড়ে গেছে। কারণ, স্ত্রী উনুনের ওপর পাতিল রেখে নামাতে ভুলে গিয়েছিল! এভাবে তার পুরো দিনটি কাটবে চরম বিরক্তি ও দুঃখকে সঙ্গী করে। এসবের কিছু না হলেও অন্তত এতটুকু অবশ্যই হবে যে, সে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিল। তারপর চোখে মজার ঘুম আসতেই মোবাইলটা বেজে উঠল!'[১০৬]

গুনাহ করার পর যখন তুমি তাওবা করবে এবং ভবিষ্যতে গুনাহ না করার দৃঢ় সংকল্প করবে, তখন তোমার মাঝে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখতে পাবে। তোমার অন্তর স্থিরসংকল্প ও প্রত্যয়ী হয়ে উঠবে। এতটুকু পরিবর্তনই তোমার জন্য যথেষ্ট।

এ ব্যাপারে প্রখ্যাত বুজুর্গ হাবিব আজামির ফিরে আসার গল্পটি না বললে নয় :

হাবিব প্রাথমিক জীবনে দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। নির্দ্বিধায় সুদ খেতেন তিনি। একদিন বাচ্চারা পথের ধারে খেলছিল। তিনি সেখান থেকে যাওয়ার সময় বাচ্চারা বলে উঠল, 'ওই দেখো, সুদখোর যাচ্ছে!' এতে লজ্জায় তার মাথা নুয়ে পড়ল এবং তিনি বললেন, 'প্রভু, আমার পাপ তো শিশুদের মাঝেও ফাঁস হয়ে গেল!' অতঃপর সেখান থেকে ফিরে এসে তার সমুদয় সম্পত্তি হাতে নিলেন এবং বললেন, 'প্রভু আমার, এই সম্পদের বিনিময়ে আমি নিজেকে

---

১০৬. সানাআতুল হায়াত : পৃ. ৫৭

বিক্রি করে দিয়েছিলাম। এখন আমাকে আজাদ করুন।' পরদিন সকালে তার সকল সম্পদ সদাকা করে দিলেন। তারপর থেকে তিনি ইবাদতে আত্মনিয়োগ করলেন। রোজা, কিয়ামুল লাইল, জিকির, নামাজ—সব ধরনের ইবাদতে মনোযোগী হলেন। এর কিছুদিন পর একদিন তিনি সেই শিশুদের পাশ দিয়ে গেলেন, যারা তাকে সুদখোর বলে তিরস্কার করেছিল। শিশুদের নজর যখন তার ওপর পড়ল, তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, 'চুপ হয়ে যাও, আবিদ হাবিব এসেছেন!' এ কথা শুনে তিনি কেঁদে দিলেন।[১০৭]

১০৭. তাহজিবুল কামাল ফি আসমাইর রিজাল : ৫/৩৯০।
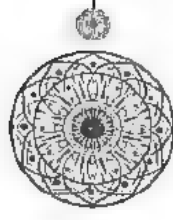
সুখের সাথে পথচলা

সুখ এ জীবনের লক্ষ্য নয়; বরং এ জীবনের পথচলাটাই সুখ। যদি সুখ জীবনের লক্ষ্য হতো, তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত বান্দা দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে থাকত। বরং প্রকৃত সুখ হলো একটি যাত্রা, যে যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে তুমি এ সুখের স্বাদ অনুভব করে থাকো। এ এক গুপ্তধন, মুমিন ছাড়া অন্য কেউ যার হদিস পায় না। এই যে স্থায়ী সুখ, তা পাওয়া যায় কেবল ইমান ও আল্লাহর নৈকট্যের প্রান্তরে।

যুগ যুগ ধরে সুখ কাঙ্ক্ষিত গুপ্তধন ও কামনার বস্তু হয়ে পৃথিবীতে বিচরণকারী সকল প্রাণীর অনুভূতির সাথে খেলা করে আসছে। তবে আল্লাহ তাআলা অকাট্য ফয়সালা করে রেখেছেন যে, তিনি তাঁর বান্দাদের দুটি সুখ অথবা দুটি শাস্তি দেবেন। সুতরাং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর নৈকট্য ও তাঁর আনুগত্যের স্বাদ অনুভবের জান্নাত পেয়ে সুখী হয়েছে, আখিরাতে সেই জান্নাত পেয়ে সুখী হবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে শাস্তি পেয়েছে, আখিরাতে সে জাহান্নামে গিয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

এ জন্যই বলা হয়, 'দুনিয়ার সুখ আখিরাতের সুখের প্রবেশপথ।' তবে দুই সুখের মধ্যে কোনোরূপ তুলনা করা সম্ভব নয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা আখিরাতের সুখ অনুভব করার জন্য আমাদের নতুনভাবে সৃষ্টি করবেন এবং আমাদের এমন অন্তর দান করবেন, যে অন্তর সে অবর্ণনীয় সুখ সহ্য করতে পারবে। যদি জান্নাতিদের সাথে তাদের দুনিয়ার অন্তরগুলো জান্নাতে চলে যায়, তাহলে তারা সুখ সইতে না পেরে মরে যাবে।[১০৮]

---

১০৮. হাদিসে এসেছে : যদি আল্লাহ তাআলা জান্নাতবাসীদের জন্য জীবন ও অমরত্ব সৃষ্টি না করতেন, তাহলে খুশিতে তারা মরে যেত। (সুনানুত তিরমিজি, সহিহুল জামি : ৭৯৯৮)

ওপরের কথা থেকে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, জান্নাতের সুখ পেতে হলে তোমাকে দুনিয়াবি সুখের পথ দিয়ে চলতে হবে, যে সুখ লুকিয়ে আছে আল্লাহর ইবাদতে।

প্রত্যেক বস্তুর কিছু মৌলিকত্ব থাকে, তেমনই সুখের পাঁচটি মৌলিকত্ব আছে :

প্রথম মৌলিকত্ব : সুখ উৎপন্ন হয় তোমার ভেতর থেকে

অর্থাৎ সুখের উৎস ও আবাসস্থল তোমার হৃদয়। হৃদয়ের মধ্যে বাইরে থেকে সুখ প্রবেশ করার কোনো পথ নেই। যুগের মহান মুজাদ্দিদ ইমাম হাসান আল-বান্নার মুখ থেকে তাঁর অধ্যয়ন, অভিজ্ঞতা, মেলামেশা ও পর্যবেক্ষণের সারকথা শোনো :

'আমি অনেক অধ্যয়ন করেছি, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, অনেক শ্রেণির লোকদের সাথে মিশেছি এবং অসংখ্য ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছি। এ দীর্ঘ সময়ের যাত্রা থেকে আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস জন্মেছে যে, সকল মানুষ যে সুখের সন্ধান করে বেড়ায়, তার উৎসমূল মূলত তাদেরই অন্তর। বাইরে থেকে অন্তরে সুখ প্রবেশ করার কোনো পথ নেই। অনুরূপভাবে যে দুঃখ-দুর্দশায় তারা জর্জরিত এবং যা থেকে তারা পালাতে চাইছে, সেই দুঃখ-দুর্দশাও তাদের নিজেদের অন্তর ও নফসের কারণে হয়।'

তাঁর কথা থেকে প্রমাণিত হয়, সম্পদ, ক্ষমতা ও খ্যাতি সুখের উৎস নয়। এ জন্যই তুমি অসংখ্য গরিব-মিসকিনের মুখে হাসির ফুলঝুরি দেখতে পাও; অথচ অনেক ধনীর হৃদয় থেকে দীর্ঘশ্বাস ও কষ্টের বিলাপ বেরিয়ে আসে। অনেক মানুষ আছে, যাদের কাছে দুকড়ি পয়সা নেই; কিন্তু তারা সুখী। আবার অনেকের কাছে কাড়ি কাড়ি টাকা আছে; কিন্তু সুখ তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। কারণ, সুখ-দুঃখ সম্পদের কারণে হয় না, তা হৃদয় থেকেই উৎসারিত হয়। হৃদয় এক অদ্ভুত বস্তু, যার ওপর আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও কর্তৃত্ব চলে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

'জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান।'[১০৯]

আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর তা মানলে কী হবে, তার স্বরূপ বাতলে দিয়েছে এ আয়াত। এ আয়াত যেন বোঝাতে চায়, আল্লাহ ও রাসুলের ডাকে সাড়া দেওয়া হচ্ছে সুখের চাবিকাঠি। আর যে এই ডাকে সাড়া না দিয়ে বিমুখতা প্রদর্শন করবে, তার হৃদয়ের দরজার কপাট বন্ধ হয়ে যাবে এবং সুখ ও তার মাঝে আড়াল পড়ে যাবে। সুতরাং আয়াতের মধ্যে আল্লাহর ডাকে সাড়া দানকারীর জন্য রয়েছে সুসংবাদ এবং বিমুখতা প্রদর্শনকারীর জন্য রয়েছে শাস্তির ধমক। তুমি কোন দলে থাকবে, সে সিদ্ধান্ত তুমিই নাও।

এবার বলো তাহলে, হৃদয়সমূহের চাবিমালার একচ্ছত্র অধিপতি কে? কে তাতে সুখ, প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততা সৃষ্টি করেন? আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি এমন আছে? তিনিই হৃদয়সমূহের একচ্ছত্র অধিপতি। হৃদয়সমূহকে তিনি ইচ্ছামতো পরিবর্তন করতে পারেন। নিচে এ সম্পর্কিত কয়েকটি গল্প উল্লেখ করেছি, সেগুলো পড়ো। অনুভব করো হৃদয় পরিবর্তনকারী মহান সত্তার ক্ষমতা :

ফুজালা বিন উমাইর। এই লোকটির মন রাসুল ﷺ-এর প্রতি হিংসা-বিদ্বেষে পূর্ণ ছিল। এমনকি মক্কা-বিজয়ের দিন তাঁকে হত্যা করার পোক্ত নিয়তও করে ফেলেছিলেন তিনি। এ নিয়ত নিয়ে তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে গেলেন। রাসুল ﷺ তখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করছিলেন তাকে দেখে রাসুল ﷺ স্বীয় পবিত্র হাত তার হিংসায় ভরা বুকের ওপর রাখলেন। নিমিষেই তার হিংসার অনল নিভে গেল। পরবর্তী সময়ে মনের অবস্থা পরিবর্তন করে দেওয়া এই ক্ষণ প্রসঙ্গে ফুজালা বলেন, 'আল্লাহর কসম, আমার বক্ষ থেকে তাঁর হাত সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই তিনি আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন।'

সুমামা বিন উসাল। ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে তাঁর মনোজগতে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়, রাসুল ﷺ-কে তার বিবরণ দিয়েছেন সুন্দর অলংকারিক ভাষায় :

---

১০৯. সুরা আল-আনফাল, ৮ : ২৪।

'হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর কসম, এই জমিনে আপনার চেহারাই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ঘৃণিত; কিন্তু এখন আপনার চেহারাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়। আমার দৃষ্টিতে আপনার দ্বীনের চেয়ে ঘৃণিত কোনো দ্বীন ছিল না; কিন্তু এখন আপনার দ্বীনই আমার একমাত্র পছন্দনীয় দ্বীন। আপনার শহর আমার নিকট সবচেয়ে নিন্দিত শহর ছিল, এখন এই শহরই আমার সর্বাধিক প্রিয় ভূখণ্ড।'

মনোজগতের এই বিপ্লব শুধু পুরুষদের মধ্যে হয়েছে এমন নয়; বরং অনেক মেয়ের মাঝেও এ ধরনের বিপ্লব সাধিত হয়েছে। হিন্দ বিনতে উতবার ঘটনা তারই প্রমাণ। ইসলাম গ্রহণ করার পর রাসুল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, একটা সময় ছিল যখন আমি চাইতাম আপনার শিবিরকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করুন। কিন্তু এখন মনেপ্রাণে চাই, আপনার শিবিরকে আল্লাহ সম্মানিত করুন।'

এই বিপ্লবের রহস্য কী? চোখের পলকেই এমন অবিশ্বাস্য পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব হলো? আল্লাহ ছাড়া কারও পক্ষে কি এটা সম্ভব?

কোন সে সত্তা, যিনি হৃদয়সমূহ থেকে ঘৃণার আবরণ সরিয়ে ভালোবাসার পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন? আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কি এমন অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে?

দুই দলের প্রতি বার্তা

যাদের অন্তর ইমানের প্লাবনে প্লাবিত এবং যাদের অন্তর ইবাদতের রঙিন বাগানে বিচরণ করে, তাদের উদ্দেশে এটি একটি শক্তিশালী বার্তা। এই বার্তা তাদের বলে :

কোনো শক্তি তোমাদের কাছ থেকে সুখ কেড়ে নিতে পারবে না। পারবে না তোমাদের জীবনের শান্তি বিনষ্ট করতে। যদি পৃথিবীর সকল শক্তি একত্রিত হয়ে তোমাদের হাসিমুখগুলো মলিন করে দিতে চায়, তাদের সে চেষ্টা সফল হবে না। তোমাদের ইমান তোমাদের জীবিত রাখবে এবং তোমাদের অন্তরে প্রাণশক্তি জোগাবে। তাই তো দৃপ্ত গলায় কারজাভি গেয়ে উঠেছেন :

'আমার বিশ্বাসের ছায়াতলে আমার সুখের আবাস বানিয়েছেন প্রভু

কোনো অপশক্তি আমার জীবনে দুঃখ আনতে পারবে না কভু।'

অনুরূপভাবে এটি সেসব লোকের প্রতিও বার্তা, যাদের হৃদয় পাপ-পঙ্কিলতার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। এই বার্তা তাদের উদ্দেশে বলে :

হে প্রবৃত্তি ও অনিষ্টের জলাভূমিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ভাই, হে অনেক দিন ধরে আল্লাহ থেকে পালিয়ে বেড়ানো প্রিয় ভাই, আল্লাহমুখী বান্দাদের হৃদয়ে যখন রহমতের বারিধারা বর্ষিত হয়, তখন তা থেকে বঞ্চিত হওয়া অভাগা ব্যক্তি, এই বার্তা তোমার জন্য। চোখ খুলে দেখো, তোমার হিদায়াতের চাবি তোমার সামনেই আছে। তোমার মনোবিপ্লবের মুহূর্তটি তোমারই হৃদয়ের কোনো এক কোণে লুকিয়ে আছে। ধ্বংসের অতল তল থেকে ফিরে আসা তোমার জন্য অনেক সহজ। এর জন্য তোমাকে বেশি কিছু করতে হবে না। শুধু সত্য দিলে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হবে এবং দীর্ঘ সময় ধরে চোখের পানি ঝরাতে হবে যিনি ওপরে আলোচিত লোকদের কুফরের নখের থাবা থেকে কেড়ে নিয়েছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে এবং তোমার মতো একত্ববাদে বিশ্বাসীদের গাফিলতির ঝোপ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসবেন। এতক্ষণ যা বললাম, তা-ই তোমার হিদায়াতের চাবি। হাতে নাও। খুলে ফেলো হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার। হৃদয়ে আলোর আগমন ঘটুক। বিলীন হোক সকল অন্ধকার।

সুখ আল্লাহর তরফ থেকে বিশেষ প্রতিদান, যা তিনি সেসব বান্দাকে দান করেন, যারা তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অন্য সকল বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। এ সুখ এতটাই মূল্যবান ও উপভোগ্য যে, এক ভাই নিজের সুখের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

'আমরা এমন সুখ ও স্বাদের মধ্যে আছি যে, এ ব্যাপারে যদি রাজা-বাদশাহরা জানতে পারে, তাহলে তারা তরবারি নিয়ে আমাদের সাথে লড়াই করতে ছুটে আসবে।'

দ্বিতীয় মৌলিকত্ব : দুনিয়ার সুখ বিরক্তিকর

এটাই দুনিয়াবি সুখের স্বভাব। দুনিয়া চরম বিরক্তিকর একটা জিনিস। তার সুখ পরিত্যাগযোগ্য; দীর্ঘদিন উপভোগ্য নয়। জুবরান খলিল এটাকে খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন তার কবিতায় :

'দুনিয়ার সুখ সে তো এক অশরীরী ছায়ামূর্তি, যাকে কল্পনা করা যায়; কিন্তু ধরা দেয় না। যদি তার শরীরও থাকত, তবুও মানুষ তাকে নিয়ে চরম বিরক্তিবোধ করত। সেই নদীর স্রোতের মতো, যা প্রবলবেগে সমতল ভূমির দিকে ছুটে চলে; কিন্তু যখনই তার নাগাল পায়, গতি মন্থর হয়ে যায় এবং মাটির সাথে মিশে নোংরা হয়ে যায়। মানুষ সুখ অনুভব করে সুরক্ষিত বিষয়ের নাগাল পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়; কিন্তু যখন তা হাতে চলে আসে, তখন তার প্রতি অবহেলা চলে আসে।'

ভেবে দেখো, কাল্পনিক সুখের অপেক্ষায় তোমার জীবন দ্রুতই শেষ হয়ে যাচ্ছে। মেনে নিলাম, একসময় সুখ তোমার হাতে ধরা দেবে, তবে কয়েকদিন যেতে না যেতেই তা চরম বিরক্তিকর ঠেকবে তোমার কাছে। তখন তুমি অন্য সুখের সন্ধানে বিভোর হয়ে যাবে। সেটা পাওয়ার কয়েকদিন পরেই তার প্রতি বিরক্তি চলে আসবে এবং নতুন সুখের সন্ধানে লেগে যাবে। এভাবে মরীচিকার পেছনে ছুটতে ছুটতে তোমার জীবনগাড়ি থেমে যাবে একসময়। আমার কথার যথার্থতা যাচাই করার ইচ্ছা হলে তোমার স্মৃতির ডায়েরিটা আবার পড়ো। দেখো, পার্থিব কত সুখ তুমি পেয়েছিলে; কিন্তু একটাকেও এখন আর সুখ মনে হয় না। সবকিছুকেই কেমন যেন বিরক্ত লাগে।

ইবনুল জাওজি ﷺ যথার্থই বলেছেন :

'যা-ই দখলে আসে, তা-ই বিরক্তিকর ঠেকে। মানুষ যখনই তার কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করে, কিছুদিন পর সেটার প্রতি বিরক্তি চলে আসে এবং নতুন কিছুর প্রতি মন ধাবিত হয়। এই বিরক্তি অনেক ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত বস্তুর দোষ প্রকাশিত হওয়ার কারণে হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে কেবল হাতের নাগালে আসার কারণে হয়। মন শুধু ওই বস্তুর প্রতিই আকৃষ্ট থাকে, যা এখনো হাতে আসেনি।'[১১০]

---

১১০. সাইদুল খাতির : পৃ. ২৩৭ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।

এ ব্যাপারে বাস্তব মূলনীতিটা জেনে নাও :

'প্রত্যেক পার্থিব লক্ষ্য সীমিত। অর্জন হওয়ার কিছুদিন পরেই তার প্রতি বিরক্তি চলে আসে।'

হে পার্থিব সুখ প্রত্যাশী ভাই, দুনিয়াবি সুখ-উপভোগ যদি বৈধও হয়, তবুও তা তোমাকে সাময়িকভাবে সুখে রাখতে পারবে। সময়ের সাথে সাথে এই সুখ বিলীন হয়ে যাবে। যেখানে বৈধ সুখের এ অবস্থা, সেখানে অবৈধ সুখের কথা কী আর বলব? এ সুখ তোমাকে স্থায়ীভাবে আনন্দ দেওয়ার পরিবর্তে তোমার জীবনটা বিষিয়ে তুলবে। তাই পার্থিব সুখকে কখনো প্রকৃত সুখ বলা যায় না। প্রকৃত সুখ সেটাই, যা আবু হামিদ গাজালি ﷺ তাঁর দীর্ঘ সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন :

'নিজের প্রবৃত্তিকে নিজের অধীনে আনতে পারার মধ্যেই সকল সুখ নিহিত। দুঃখ মানে নিজের ওপর প্রবৃত্তির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।'[১১১]

তৃতীয় মৌলিকত্ব : সুখের আড়ালে দুঃখ

অনেক সময় সুখের আড়ালে লুকিয়ে থাকে দুঃখ। মুক্তির আড়ালে লুকিয়ে থাকে ধ্বংস। সচ্ছলতা হয় সংকীর্ণতার বাহন। তাই অনেক সময় এমন হয় যে, মাসের পর মাস তুমি সুখের উপকরণ মনে করে একটি লক্ষ্যের প্রতি ছুটে বেড়াও; অথচ বাস্তবে তা দুঃখের ঠিকানা। কবি ঠিকই বলেছেন :

'প্রত্যেকে যে যার মতো চেষ্টা করে যায় কষ্ট দূর করে সুখের আগমন ঘটাতে। কিন্তু অনেক সময় ভুল হয়ে যায়। সুখ মনে করে দুঃখকেই বরণ করে নেয়।'

একজন ব্যক্তি কোনো মেয়ের মাঝে সুখ দেখতে পায়। ফলে সে তাকে বিয়ে করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। তাকে নিয়ে একটি সুখের নীড় পাতার স্বপ্নে বিভোর হয়। কিন্তু বিয়ের পর অবস্থা পাল্টে যায়। অপেক্ষমাণ সুখটি দুঃখ হয়ে আসে তার জীবনে। স্বপ্নের ভালোবাসা খোলস খুলে পরিণত হয় শত্রুতায়।

---

১১১. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/৮৫।

আরেক ব্যক্তি প্রলুব্ধকর বেতনের অংক দেখে কোনো চাকরির মাঝে সুখ দেখতে পায়। কিন্তু জয়েন হওয়ার পর নিষ্ঠুর বসের শাসন এবং শরীর ও মন ক্লান্ত করে দেওয়া একগাদা কাজের চাপে সে কল্পিত সুখের আর দেখা মেলে না।

পবিত্র কুরআন এ বাস্তবতার প্রতি নির্দেশ করে ইরশাদ করছে :

> وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
>
> 'তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়; অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়; অথচ তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত, আল্লাহই জানেন, তোমরা জানো না।'[১১২]

এ জন্য আল্লাহ তাআলা ইসতিখারার (বিশেষ পদ্ধতিতে কল্যাণ অনুসন্ধান) প্রবর্তন করেছেন। রাসুল ﷺ তাঁর সাহাবিদের এর প্রতি খুব উৎসাহিত করেছেন। ইসতিখারার বিশেষ দুআটিকে কুরআনের সুরার মতো করে শিখিয়েছেন। জাবির رضي الله عنه বর্ণনা করেন :

রাসুল ﷺ যেভাবে আমাদের কুরআনের সুরা শিখাতেন, সেভাবে আমাদের প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাপারে ইসতিখারা করার নিয়ম শিখাতেন।[১১৩] সে হিসেবে এক ব্যক্তিকে তিনি ইসতিখারার সুন্নাহসম্মত পদ্ধতি শিখিয়েছেন এভাবে যে, সে প্রথমে অতিরিক্ত দুই রাকআত নামাজ পড়বে। অতঃপর এই দুআটি পড়বে :

> اللهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا

---

১১২. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২১৬।
১১৩. তাখরিজুল কালিমিত তাইয়িব : ১১৬।

الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার ইলমের মাধ্যমে কল্যাণ প্রত্যাশা করছি। আপনার শক্তির মাধ্যমে শক্তি প্রার্থনা করছি। আপনার বিরাট অনুগ্রহের ভান্ডার থেকে ভিক্ষা যাচনা করছি। কেননা, আপনি শক্তি রাখেন, আমি রাখি না; আপনি জানেন, আমি জানি না। আপনিই অদৃশ্য সম্পর্কে জানেন। হে আল্লাহ, যদি আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি আমার জন্য দ্বীনি, দুনিয়াবি ও পরিণামের দিক দিয়ে কল্যাণকর, তাহলে এটা আমার জন্য স্থির করে দিন। আর যদি জানেন যে, এই বিষয়টি আমার জন্য দ্বীন, দুনিয়া ও পরিণামের দিক দিয়ে অকল্যাণকর, তাহলে এটাকে আমার থেকে দূর করে দিন এবং আমাকে তার থেকে দূরে রাখুন। আর কল্যাণ যেখানেই হোক, তা আমার জন্য ব্যবস্থা করে দিন। অতঃপর আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে তুলুন।'[১১৪]

দুআ পড়ার পূর্বে নামাজ পড়ার হিকমত সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বলেন :

'কোনো উত্তম আমলের পরে দুআ কবুল হওয়ার আশা বেশি থাকে। আর নামাজের চেয়ে অধিকতর উপকারী কোনো আমল নেই। কারণ নামাজের মধ্যে আল্লাহর বড়ত্বের বর্ণনা, গুণকীর্তন এবং তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা প্রদর্শনের অপূর্ব সম্মিলন ঘটে।'

আগের যুগে আরবরা কোনো কাজ করবে কি করবে না—সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয়ের ওপর ভরসা করত। ইসলাম সে প্রথার বিলুপ্তি ঘটিয়ে তার চেয়ে অধিক কার্যকর উপায় হিসেবে ইসতিখারার প্রবর্তন করে।

---

১১৪. সহিহুল বুখারি : ৬৩৮২।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'আল্লাহ তাআলা তাদের আগের ভ্রান্ত প্রথার পরিবর্তে দুআ দান করেছেন—যার মধ্যে রয়েছে তাওহিদ, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা ও দাসত্বের প্রকাশ এবং নিরঙ্কুশ ভরসা। এ দুআর মাধ্যমে এমন সত্তার কাছে প্রার্থনা করা হয়, যিনি ব্যতীত অন্য কারও কল্যাণ আনার এবং অকল্যাণ দূর করার শক্তি নেই। তিনি এমন এক সত্তা, যিনি বান্দার জন্য রহমতের দ্বার খুলে দিলে তা বন্ধ করার সাধ্য কারও নেই; আর বন্ধ করে দিলে খোলার সাধ্য কারও নেই; হাতের রেখা, গ্রহ-নক্ষত্র, লক্ষণ—যতকিছুর সাহায্যই নিক না কেন। বস্তুত দুআই হচ্ছে শুভলক্ষণ। তবে তা আল্লাহর তাওফিকপ্রাপ্ত সৌভাগ্যবানদের জন্য শুভলক্ষণ। কপালপোড়া মুশরিকদের জন্য নয়, যারা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে।'[১১৫]

এই ইসতিখারার মাধ্যমেই সাহাবিগণ রাসুল ﷺ-এর দাফনের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হয়েছিলেন। আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

'রাসুল ﷺ-এর অফাত হয়ে গেল। সে সময় মদিনায় একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি বগলি কবর খনন করতেন। আরেকজন ছিলেন যিনি সিন্দুকি কবর খনন করতেন। সাহাবিগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলেন, প্রথমে আমরা আল্লাহর কাছে ইসতিখারা করি, তারপর উভয়জনকে ডেকে পাঠাই। দুজনের মধ্যে যে আগে আসবে, সে নিজের মতো করে কবর খনন করবে। এরপর বগলি কবর খননকারী ব্যক্তি আগে আসলেন। অতঃপর সাহাবিগণ রাসুল ﷺ-কে বগলি কবরে দাফন করলেন।'[১১৬]

অজানা বিষয় নিয়ে খুশি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই। সুতরাং সকল বিষয়কে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ফুজাইল বিন ইয়াজ ﷺ-কে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'কে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা তাকে যে অবস্থানে রেখেছেন সেটা ছাড়া অন্য অবস্থানের জন্য লালায়িত হয় না।'[১১৭]

---

১১৫. জাদুল মাআদ : ২/৪৪৩-৪৪৫।

১১৬. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৫৫৭।

১১৭. আর-রিজা আনিল্লাহ : পৃ. ৫৮।

দুই ইসতিখারার ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল

আমার মরহুম পিতার নিকট দেশের নামকরা একটি কোম্পানি থেকে চাকরির প্রস্তাব আসলো। বর্তমান বেতনের চেয়ে তিনগুণ বেশি বেতন দেবে তারা। আব্বার বন্ধু ও আপনজনেরা এ প্রস্তাব দ্রুত লুফে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি ইসতিখারা না করে সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেন না। যথারীতি দুই রাকআত নামাজ পড়ে ইসতিখারা করলেন। সে রাতে স্বপ্ন দেখলেন, তাকে একটি নতুন কোম্পানির অভ্যর্থনাসভায় বরণ করে নেওয়া হচ্ছে। তার জন্য করা হয়েছে আড়ম্বরপূর্ণ খাবারের আয়োজন। ভুনা কলিজা থেকে শুরু করে হরেক রকমের মজাদার পদে সাজানো হয়েছে খাবারের দস্তরখান। খাবারের সুগন্ধে মৌ মৌ করছে চারিদিক। তিনি খাবারের একটি অংশ মুখে পুরে দেখলেন, তা যেন মাকাল ফল। বাইরে থেকে সুস্বাদু দেখালেও খেতে কিন্তু মারাত্মক রকমের বিস্বাদ। তিনি খাবারের লুকমাটি ফেলে দিয়ে ফিরে আসলেন। ঘুম থেকে ওঠার পর প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। তিনি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এভাবে করেছিলেন যে, প্রস্তাবিত চাকরিতে ভালোই টাকা কামানো যাবে, তবে তা হবে অপবিত্র টাকা। যদিও বন্ধুদের পক্ষ থেকে স্বপ্নের ঠুনকো অজুহাতে এত বড় প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিরস্কার হজম করতে হয়েছে; কিন্তু তিনি এ নিয়ে কোনো ধরনের অনুশোচনায় ভোগেননি। বরং সেই স্বপ্ন এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্ণিত উপার্জনব্যবস্থার মধ্যেই স্বস্তিবোধ করেছেন।

এভাবে অনেক দিন কেটে গেল। একদিন জীবিকার তাগিদে কুয়েত যাওয়ার প্রস্তাব পেলেন তিনি। এ প্রস্তাবটি এসেছিল তার হিতাকাঙ্ক্ষী ও বন্ধু মুহাম্মাদ কামাল ইবরাহিমের পক্ষ থেকে। তিনি যথারীতি দুই রাকআত নামাজ পড়ে ইসতিখারা করলেন। আগেরবারের মতো এবারও স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্নে দেখলেন, এক ব্যক্তি তাকে ফজরের নামাজের জন্য ডেকে দিলেন। অতঃপর তাকে এক গ্লাস মধুমিশ্রিত দুধ দিয়ে বললেন, 'পান করো এবং আমার সাথে ফজরের নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে চলো।'

এই স্বপ্ন দেখার পর কুয়েত যাওয়ার ব্যাপারে আব্বার মনের সংশয় কেটে গেল। প্রস্তাবে সম্মত হয়ে পাড়ি জমালেন সুদূর কুয়েতে। তবে সেখানে গিয়ে কাজ অনুসন্ধান করতে করতে কেটে গেল পুরো নয়টি মাস! তা সত্ত্বেও তিনি হতাশ

হননি। সে রাতের দেখা স্বপ্ন এবং তার ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালার ওপর পূর্ণ সন্তুষ্ট ও নির্ভার ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, আল্লাহ তাআলা সীমিত আয়ের মধ্যেই তার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ রেখেছেন। এর পর সে দেশের মানুষের অন্তরসমূহ আল্লাহ তাআলা তার জন্য খুলে দিয়েছিলেন এবং তাকে যথাযোগ্য প্রতিদান দান করেছিলেন।

চতুর্থ মৌলিকত্ব : দুনিয়াবি সুখের পরিণতি অস্তগামিতা

হারুনুর রশিদের নিকট একজন মহিলা আসলেন। সে সময় তাঁর নিকট তাঁর বিশিষ্ট লোকজন উপস্থিত ছিলেন। মহিলা বললেন, 'হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ আপনার চোখ স্থির করুন এবং আপনার সুখ পরিপূর্ণ করুন।'

মহিলাটির কথার আসল মর্ম বুঝতে পারলেন তিনি। তাই মহিলাটির দুআসুলভ বাক্য শুনে উপস্থিত লোকজন খুশি হলেও হারুনুর রশিদ খুশি হননি। অতঃপর তিনি উপস্থিত লোকজনের উদ্দেশে বললেন, 'আমার ধারণা, তোমরা মহিলাটির কথার মর্ম বুঝতে পারনি। সে বলেছে, "আল্লাহ আপনার চক্ষু স্থির করুন।" চোখ স্থির হওয়া মানে তো অন্ধ হয়ে যাওয়া। সে বলেছে, "আল্লাহ আপনার সুখ পরিপূর্ণ করুন।" এখানে সে পরিপূর্ণতা শব্দটি একটি কবিতার চরণ থেকে নিয়েছে, যেখানে কবি বলেছেন :

"কোনো বিষয় যখন পরিপূর্ণতা লাভ করে, তখন তার ঘাটতি শুরু হয়। তার অবনতির অপেক্ষা করো, যার ব্যাপারে পরিপূর্ণতার সার্টিফিকেট দেওয়া হয়েছে।"'

তা ছাড়া জীবন এক জায়গায় স্থির থাকে না। প্রকৃতির চাকা বিরামহীন চলতে থাকে। তাই পরিপূর্ণতার পরে হ্রাস আসে। পরিচ্ছন্নতার পরে আসে পঙ্কিলতা। রৌদ্রোজ্জ্বলতার পরে আসে বৃষ্টি। হাসির পরে আসে কান্না। পরিপূর্ণতার এ অর্থ কবিরা নিজেদের কবিতায় নিয়েছেন। কবিগুরু আহমাদ শাওকি তার এক কবিতায় লিখেন :

'ভাগ্য যখন পরিপূর্ণতায় পৌঁছায়, তা হয় ধ্বংস।'

তারও আগে আবুল আতাহিয়া লিখেছেন :

'হে পূর্ণতা লাভ করতে না পারা লোক, হতাশ হয়ো না, কেননা মানুষের ঘাটতি ডেকে আনে তারই পূর্ণতা।'

অন্য একটি কবিতায় তিনি দুনিয়ার উত্থান-পতনের ব্যাপারে অবগত ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন :

'সময় যত অগ্রসর হয়, ততই তার ভীতি বৃদ্ধি পায়। কারণ, সে দুনিয়ার বিবর্তনের ব্যাপারে জানে। যেন সময় তাকে অপারেশন-রুম থেকে ভয় ধরিয়ে দেওয়া চিৎকার শোনায়।'

আলি বিন আবু তালিব ﵁-ও অভিন্ন কথা বলেছেন :

'কোনো ব্যক্তি যখন কোনো জাতিকে আসন্ন সুখের শুভসংবাদ শোনায়, তার আড়ালে পরবর্তী দুঃখ-দুর্দশার দুঃসংবাদ লুকিয়ে থাকে।'[১১৮]

'রাত কারও প্রতি এমন কোনো উপকার করে না, যার পরে অপকার থাকে না।'

এসব ছাড়াও রাসুল ﷺ-এর হাদিসের মধ্যে আমাদের জন্য রয়েছে চূড়ান্ত সত্য কথা এবং অপরিবর্তনীয় নীতি। এ সম্পর্কিত আনাস ﵁-এর হাদিসটি শোনো :

'রাসুল ﷺ-এর আজবা নামক একটি উষ্ট্রী ছিল। প্রতিযোগিতায় সে কোনোদিন পরাজিত হতো না। একদিন এক বেদুইন লোকের একটি ছোট উট তাকে হারিয়ে দিল। মুসলিমদের জন্য এটা মেনে নিতে কষ্ট হলো। তারা আক্ষেপ করে বললেন, "আজবা হেরে গেছে!" তখন রাসুল ﷺ বললেন :

إِنَّ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ

---

১১৮. আজ-জারিআতু ইলা মাকারিমিশ শারিআহ : পৃ. ২৩৬।

“আল্লাহর একটা নীতি হলো, যে বস্তুকেই তিনি ওপরে তোলেন, তাকে অবশ্যই একসময় না একসময় নিচে নামিয়ে আনেন।”[১১৯]

সুতরাং যেসব ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষণিকের সুখ নিয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছে এবং তার স্থায়িত্বের দিবাস্বপ্ন দেখছে, তারা চরম ভুলের মধ্যে আছে। তারা আগলে ধরে আছে বরফের মূর্তিকে, সূর্য ওঠার সাথে সাথে যা গলে যাবে। রাসুল ﷺ দুনিয়ার বিবর্তনের এমন এক উদাহরণ দিয়েছেন, যা আমাদের সাথে বারবার সংঘটিত হয়। যাতে বিষয়টি ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনাই না থাকে। তিনি বলেন :

إِنَّ مَطْعَمَ ابْنِ آدَمَ ضُرِبَ لِلدُّنْيَا مَثَلًا بِمَا خَرَجَ مِنِ ابْنِ آدَمَ، وَإِنْ قَزَّحَهُ، وَمَلَّحَهُ، فَانْظُرْ مَا يَصِيرُ إِلَيْهِ

‘বনি আদমের খাদ্য দুনিয়ার উদাহরণ। মসলাপাতি ও লবণ দিয়ে যতই স্বাদযুক্ত করুক, যখন তা বনি আদমের ভেতর থেকে বের হয়, তখন কী হয়, তা তো দেখতেই পাও!’[১২০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ؒ বিষয়টি নিয়ে খুব গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। অতঃপর বলেছেন :

‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুতে যদি বান্দা সুখ খুঁজে পায়, সে সুখ স্থায়ী হয় না। তা পরিবর্তিত হয় এক ধরন থেকে অন্য ধরনে। স্থানান্তরিত হয় এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির নিকট। একটি সময়ে তা উপভোগ্য হলেও আরেক সময়ে তা বিরক্ত লাগে।’[১২১]

এই বোধ আল্লাহর প্রকৃত বান্দাকে আল্লাহর দেওয়া খুশি ও উপভোগের উপকরণ নিয়ে প্রবঞ্চনা ও অহমিকায় ভোগা থেকে বিরত রাখে। তার ভেতর এই বিশ্বাস বদ্ধমূল থাকে যে, এই মুহূর্তে তার নিকট যেসব নিয়ামত ও

---

১১৯. সহিহুল বুখারি : ৬৫০১।
১২০. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৭০২, শুআবুল ঈমান : ৯৯৯০।
১২১. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১/২৪।

সুখের উপকরণ আছে, তা একসময় বিদায় নেবে। তাই সে হারানো সুখের কথা ভেবে ব্যথিত হয় না।

দুনিয়ার প্রতিটি সুখ ও স্বাদ একসময় বিদায় হয়ে যায়। তাই জনৈক মুসলিম কবি হারানো সুখের ব্যথায় ব্যথিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেছেন :

'আমি এখন যেসবের মালিক, তাও একদিন চলে যাবে। তাহলে যা চলে গেছে, তার জন্য কী করে আফসোস করি!'

এ জন্যই উমর বিন খাত্তাব ﷺ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় বলতেন :

'যা চলে যাবে, তা নিয়ে আমরা বিভোর হয়ে আছি। আমরা যা নিয়ে আনন্দে মেতে আছি, তা শুধুই আশা। এ যেন সেই সুখানুভূতি, যা স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্ন দেখার সময় অনুভব করে।'

এবার আমাকে বলো, তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্নের ঘোরে আছে এবং কে জাগ্রত? দাঁড়াও, আমিই বলছি :

জাগ্রত সেই, যে উভয় জাহানের সুখ পেতে চায় এবং উভয় জগতে সফল হতে চায়। তবে এটা তখনই সম্ভব, যখন তার চাওয়াটা হবে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে।[১২২]

---

১২২. ১৩ নং ফায়দা : ইমাম গাজালি ﷺ বলেন, 'প্রকৃত সুখ হচ্ছে আখিরাতের সুখ। এ ছাড়া বাকি যতকিছুকে সুখ বলা হয়, তা হয়তো ভুল অথবা রূপক অর্থে সুখ। যেমন দুনিয়ার যে সুখ আখিরাতের কোনো কাজে আসে না, তাকে সুখ বলা ভুল। আর দুনিয়াবি কিছু সুখ আছে, যেগুলো আখিরাতের সুখের প্রতি পথনির্দেশ করে, সেগুলোকে এ জন্যই সুখ বলা হয়; কারণ সেগুলো আখিরাতের সুখলাভের জন্য সহায়তা করে। (আল-ইহইয়া : ৪/৯৯)

পঞ্চম মৌলিকত্ব : মহাসুখ

দুনিয়ার সুখ আখিরাতের সুখে পৌঁছানোর সেতু। বলতে গেলে এটি একটি মূলনীতি :

যে দুনিয়ার মধ্যে সুখী ও আনন্দিত নয়, আখিরাতেও সে সুখী ও আনন্দিত হতে পারবে না।

দুনিয়ার প্রত্যেক সুখবঞ্চিত লোক আখিরাতেও সুখ থেকে বঞ্চিত থাকবে। এ জন্যই শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'দুনিয়াতে একটি জান্নাত আছে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার জান্নাতে প্রবেশ করে না, আখিরাতের জান্নাতে সে প্রবেশ করতে পারবে না।'[১২৩]

তবে এই সুখ সেই সুখ নয়, যাকে পাওয়ার জন্য মানুষ হন্যে হয়ে ছোটে। বরং এটি সেই মহাসুখ, যা মনোযোগ সহকারে ইবাদতকারী ব্যক্তি ইবাদতের সময় অনুভব করে। আল্লাহ তাআলা এত এত মানুষের ভিড় থেকে তাঁর ইবাদতের জন্য তাকে বাছাই করেছেন এই বোধ তাঁর অন্তরে এমন সুখানুভূতি সৃষ্টি করে, যা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

এটাই সে সুখ, যা বান্দাকে আখিরাতের সুখ পর্যন্ত নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি স্থায়ী সুখের আশা করে, সে যেন আল্লাহর দাসত্বের ওপর অটল থাকে।'[১২৪]

তবে এই সুখ অনুভব করার জন্য একটি বিশেষ ধরনের স্পর্শমণি লাগে। এই স্পর্শমণিটি ঠিক কী, তা খুব সুন্দর করে বুঝিয়েছেন ইমাম গাজালি ﷺ। তা হচ্ছে মারিফাত বা আল্লাহর পরিচয়লাভ। তিনি বলেন, এই মারিফাত যার ভেতর যত বেশি থাকবে, সে তত বেশি ইবাদতের স্বাদ ও সুখ অনুভব করবে। কেননা মানুষ যখন মন্ত্রীর পরিচয় লাভ করে, তখন আনন্দিত হয়। যখন প্রেসিডেন্টের পরিচয় লাভ করে, তখন আরও বেশি আনন্দিত হয়। আল্লাহর চেয়ে মহান ও সম্মানিত তো কেউই নেই। কারণ জগতের যারাই কিছুটা বড়ত্ব ও সম্মান লাভ করেছে, সবই আল্লাহই দিয়েছেন তাদের। বিশ্বের সকল সৌন্দর্য

---

১২৩. আল-ওয়াবিলুস সাইয়িব মিনাল কালিমিত তাইয়িব : পৃ. ৪৮।

১২৪. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৪২৯।

এবং মুগ্ধকর বস্তু তাঁরই সৃষ্টি। তাই তাঁর মারিফাতের চেয়ে মূল্যবান হতে পারে না অন্য কারও মারিফাত। তাঁর মারিফাতে যে স্বাদ ও মিষ্টতা আছে, অন্য কারও মারিফাতে তা হতে পারে না।'[১২৫]

এ জন্যই ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন :

'যার দিকে ডাকা হয়, তার গুণাবলি, পূর্ণতার বিবরণ এবং তার নামসমূহের হাকিকত মানুষের মনে তার ভালোবাসার আকর্ষণ সৃষ্টি করে এবং তাকে পাওয়ার ব্যাকুলতা তৈরি করে। কারণ মনের স্বভাব হলো, যাকে সে যতটুকু জানে, ততটুকু তার প্রতি ভয়, সমীহ ও হৃদ্যতা তৈরি হয়। তার নৈকট্য ভালো লাগে। তার স্মরণ ও আলোচনায় প্রশান্তি লাভ করে।'[১২৬]

এ জন্যই তিনি আল-ফাওয়ায়িদ গ্রন্থে মারিফাতকে সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন, 'এটা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, কোনো বস্তুর ব্যাপারে মারিফাত বা বিশেষ পরিচয় লাভ হলো; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয়নি।'[১২৭]

সুতরাং ভালোবাসা না থাকা কিংবা কম হওয়া নির্ভর করে মারিফাত না থাকা ও কম হওয়ার ওপর। আর যে ব্যক্তি তার রবকে ভালোবাসে, সে রবের পক্ষ থেকে আসা সকল বিষয়কে ভালোবাসে। যদিও তা বাহ্যিকভাবে মনের বিপরীত হোক। কেননা প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের কোনো একটি বিষয়কেও অপছন্দ করা সম্ভব নয়। এ জন্যই রাহিবুল উম্মাহ খ্যাত বসরার বিশিষ্ট আবিদ আমির বিন আব্দে কাইস বলেন :

'আমি আল্লাহকে এমন ভালোবেসেছি যে, সে ভালোবাসা আমার সকল কঠিন বিষয়কে সহজ করে দিয়েছে। প্রতিটি নির্ধারিত ফয়সালার ওপর সন্তুষ্ট হতে শিখিয়েছে। যেহেতু আল্লাহর ভালোবাসা আমার সাথে আছে, তাই আমার সাথে সকালে কিংবা বিকালে কী ঘটছে, তার কোনো পরোয়াই করি না আমি।'[১২৮]

---

১২৫. কিমিয়া আস-সাআদাহ : ১/১৪০।
১২৬. মাদারিজুস সালিকিন : ৩/৩৫১।
১২৭. আল-ফাওয়ায়িদ : পৃ. ৪৭।
১২৮. কিতাবুল আওলিয়া : পৃ. ৩০।

ওপরের আলোচনা থেকে তুমি নিশচয় বুঝতে পেরেছ যে, মানুষের প্রকৃত কষ্ট ও দুঃখ-দুর্দশার কারণ আল্লাহর মারিফাত না থাকা, বান্দা ও শহরের ব্যাপারে আল্লাহর ব্যবস্থাপনার হিকমত সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া এবং জগৎসংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাহ বা নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হওয়া। তোমার মাঝে আল্লাহর মারিফাত যে পরিমাণ থাকবে, সে পরিমাণ তুমি সুখ অনুভব করবে। এমনকি তাঁর সকল কর্ম ও ফয়সালা তোমার খুশির কারণ হবে। এভাবে রবের সিদ্ধান্তই হবে তোমার সুখের ঠিকানা; অথচ সে একই সিদ্ধান্ত অন্যদের জন্য দুঃখের কারণ হবে। এ সম্পর্কে উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর মন্তব্যটি দেখো :

'এমন অবস্থায় আমার সকাল হয়েছে যে, আল্লাহর তাকদির ও সিদ্ধান্তের ওপরই আমার খুশি ও আনন্দ।'[১২৯]

এ কারণেই তিনি প্রকৃত পুরুষ ছিলেন। কারণ, আখিরাতের সফলতা অন্বেষণকারীদের নিকট পুরুষত্বের আলাদা অর্থ আছে। তাদের মতে একজন ব্যক্তি বাহ্যিক রূপ এবং পুরুষালি দেহাবয়ব দ্বারা পুরুষ হয় না। পুরুষ হতে হলে পুরুষত্ব লাগে। তবে পুরুষত্ব বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, এই পুরুষত্ব সেই পুরুষত্ব নয়। শাইখুল ইসলাম আবু উসমান হিয়ারি পুরুষত্বের নতুন সংজ্ঞা দিয়ে বলেন :

'পুরুষ তখনই পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হয়, যখন নিয়ামত পাক বা বঞ্চিত হোক, সম্মানিত হোক কিংবা অসম্মানিত হোক—সর্বাবস্থায় তার মনের অবস্থা একই থাকে।'[১৩০]

যে ব্যক্তি নির্দেশদাতাকে চিনে না, তাকে তুমি ওই নির্দেশ অমান্য করার জন্য নানা ধরনের বাহানা খুঁজতে দেখবে। কিন্তু যে ব্যক্তি নির্দেশদাতাকে চিনে, সে কখনো তার আনুগত্যে অবহেলা করে না।

---

১২৯. মাদারিজুস সালিকিন : ২/২১২।

১৪ নং ফায়দা : হুসাইন ﷺ এর স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো মন্তব্যটি শোনো : ইরাকে যখন প্লেগ মহামারি ছড়িয়ে পড়ল, তখন লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হুসাইন ﷺ-এর নিকট জড়ো হলো। তিনি তাদের বললেন, 'তোমাদের রব তোমাদের সাথে যা করেছেন, তা কতই না উত্তম! তিনি পাপীদের পাপ থেকে বিরত রেখেছেন এবং কৃপণকে দান করতে বাধ্য করেছেন। (আল-ইকদুল ফারিদ : ৩/১৪৩)

১৩০. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/৪২।

তাই কেউ ইবাদতের মাঝে সুখ অনুভব না করলে তার উচিত ইবাদতকে আরও সুন্দর ও উত্তম উপায়ে আদায় করা। কেননা, আমরা আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হলে তিনিও আমাদের প্রতি মনোযোগী হন। আমরা তাঁর প্রতি হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হলে তিনি আমাদের প্রতি দৌড়ে আসেন।

ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন :

'যদি তুমি হৃদয়ে আমলের স্বাদ না পাও এবং আমলের কারণে অন্তরে প্রফুল্লতা অনুভব না করো, তাহলে নিজের আমলের ওপরই দোষ চাপাও। কেননা, আল্লাহ তাআলা কৃতজ্ঞ। অর্থাৎ বান্দা যদি যথাযথভাবে আমল করে, তিনি অবশ্যই দুনিয়াতে আমলের মিষ্টতা অনুভব করানোর মাধ্যমে তার প্রতিদান দেন। হৃদয়ে আনন্দ ও প্রফুল্লতা দান করেন। সুতরাং তুমি যদি তোমার আমলের বিনিময়ে স্বাদ অনুভব না করো, তাহলে বুঝতে হবে তোমার আমলের কোথাও সমস্যা আছে।'[১৩১]

অন্ধের সুখ

প্রকৃত সুখ অনুভব করার অন্যতম উপায় হলো, আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি অকুণ্ঠ সন্তুষ্টি। এটি অন্তরকে বাইতুল মামুরের মতো প্রশান্ত ও প্রশস্ত করে দেয়। এ জন্য একজন দৃষ্টিহীন লোক ইজ্জুদ্দিন আহমাদ বিন আব্দুদ দায়িম আল্লাহর ফয়সালার ওপর সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেন :

'আল্লাহ আমার চোখের দৃষ্টি নিয়ে নিয়েছেন, এতে আমার কোনো দুঃখ নেই। কারণ, আমার হৃদয় দৃষ্টিসম্পন্ন। আমি হৃদয়ের চোখ দিয়ে আমার দুনিয়া ও আখিরাত দেখতে পাই। আর হৃদয়ের চোখ দ্বারা এমন বস্তুও দেখা সম্ভব, যা চর্মচক্ষু দ্বারা দেখা সম্ভব নয়।'

১৩১. মাদারিজুস সালিকিন : ২/৬৮।

অন্ধ কবি নাসর আলি সাইদ মনে করেন যে, তিনি এমন অনেক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের চেয়ে উত্তম, যারা দুনিয়াতে হিদায়াতবিহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। এমন অসংখ্য অন্ধ লোক আছে, যাদের অন্তর্দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ এবং মনোবল উন্নত। অন্ধদের এই সময়ে ওরাই প্রকৃত দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন।

কত অন্ধ আছে, যাদের বাহ্যিক চোখ নেই, তবুও তারা দেখে। হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখে দেখে তারা সত্যের পথে চলে। আবার অনেক মানুষ চোখ থাকার পরেও অন্ধ। সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত তারা। যেন তাদের চোখের ওপর পর্দা পড়ে আছে।

কাতাদা ﵀-কে একজন প্রশ্ন করলেন, 'দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের চেয়ে দৃষ্টিহীন লোক অধিক মেধাবী ও বুদ্ধিমান হয় কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কারণ তাদের চোখের দৃষ্টিক্ষমতা হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়।'[১৩২]

বিশিষ্ট আরবি সাহিত্যিক জাহিজ দৃষ্টিশক্তি-বঞ্চিত লোকদের উন্নত মেধার রহস্য উদঘাটন করে বলেন :

'অন্ধ ব্যক্তিরা অন্যদের তুলনায় বেশি মেধাবী ও স্মৃতিশক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। কারণ, তারা মানুষের মধ্যে পার্থক্যকরণ সম্পর্কে চিন্তামুক্ত থাকে। দৃষ্টিশক্তি থাকলে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাভাবনা মাথায় আসে। তাই দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তির মাথায় চিন্তার জট বাঁধে না। ফলে তার মাথা ও বুদ্ধি নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারে।'[১৩৩]

বাশশার বিন বুরদ জন্মগতভাবেই অন্ধ ছিলেন। বরং তার কথা অনুযায়ী মায়ের উদরেও তিনি অন্ধ ছিলেন। এ অন্ধত্বকেই তিনি নিজের অকল্পনীয় মেধার রহস্য বলে অভিহিত করতেন। কারণ, চোখের আলো যখন নিভে যায়, তখন সে আলো স্থানান্তরিত হয়ে হৃদয়ে স্থান নেয়। ফলে তার কলবি শক্তি দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের চেয়ে বেশি হয়। এ ব্যাপারে তিনি বলেন :

---

১৩২. আল-লাতায়িফ ওয়াজ জারায়িফ : পৃ. ১১০।
১৩৩. আল-লাতায়িফ ওয়াজ জারায়িফ : পৃ. ১১০

'মায়ের উদর থেকেই আমি অন্ধ। এই অন্ধত্বই আমার মেধাকে সুতীক্ষ্ণ করেছে। ফলে জ্ঞানসম্বন্ধীয় জটিল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমার কাছে অনেক সহজ মনে হয়। তাই তো বলি, আমি অন্ধ নই; বরং চোখের জ্যোতি কলবে স্থানান্তরিত হয়েছে মাত্র। যার ফলে সাধারণ মানুষ জ্ঞানের যেসব বিষয় খুইয়ে বসে, আমার তা অর্জিত হয়।'

এ হলো অন্ধত্বের ইহলৌকিক ও জাগতিক উপকারিতা। এটা ছাড়া ইমানি ও পারলৌকিক উপকারিতাও আছে। জনৈক অন্ধ তবে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি এই উপকারিতা অনুভব করে কী বলেছেন দেখো :

জুনাইদ বাগদাদি বর্ণনা করেন, 'আমি আবু আব্দুল্লাহ আশনানদির নিকট গেলাম। তিনি চোখে দেখতেন না। সেখানে একজন কারি তিলাওয়াত করলেন :

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

"চোখের খিয়ানত এবং অন্তরের গোপন বিষয় তিনি জানেন।"[১৩৪]

এ আয়াত শোনার পর তিনি বললেন, "অর্ধেক আমলের হিসাব থেকে আমি মুক্ত।"'[১৩৫]

এ জন্যই বাশশার বিন বুরদকে কেউ অন্ধ বলে তিরস্কার করলে তিনি কোনো পরোয়া করতেন না এবং মনঃক্ষুণ্ন হতেন না। বরং তিনি চোখের দৃষ্টি না থাকার মধ্যে নিয়ামত অনুভব করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

'শত্রুরা আমাকে অন্ধ বলে লজ্জা দেয়। এতে আমি লজ্জিত হই না। মানুষ যদি মনুষ্যত্ব ও তাকওয়াকে দেখতে পায়, তাহলে চোখ অন্ধ হলেও কোনো ক্ষতি নেই। অন্ধত্ব পুণ্য অর্জনের মাধ্যম, পুণ্য সঞ্চয়ের উপায় এবং পাপ থেকে বিরত থাকার সহায়ক—যে তিন বিষয়ের আমি ভিখারি।'

তবে এই বোধ মনের মধ্যে আসার জন্য মনটা হতে হবে ইমান ও বিশ্বাসের আলোয় আলোকিত। সত্যিকার মুমিন ব্যতীত অন্য কারও মনে এই অনুভূতি

---

১৩৪. সুরা গাফির, ৪০ : ১৯।
১৩৫. দুরারুল হিকাম : পৃ. ৪৯।

জাগে না। সত্যিকার মুমিনের মন আল্লাহর আলোয় আলোকিত হয় এবং তিনি যা দিয়ে তাকে সাহায্য করেছেন, তার মধ্যেই শক্তি অনুভব করে। মুস্তফা সাদিক রাফিয়ি এই অনুভূতিকে উন্নত ইচ্ছাশক্তি বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন,

'সুখের রহস্য হচ্ছে তোমার অভ্যন্তরে এমন একটি শক্তি থাকা, যা তোমাকে উত্তম বিষয়কে আরও উত্তম করে অনুধাবন করায় এবং মন্দ বিষয়কে অধিক মন্দ মনে করা থেকে বাধা দেয়।'[১৩৬]

তবে মনের মধ্যে আল্লাহর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস না থাকার কারণে অন্ধত্বকে অনেক অন্ধ ব্যক্তি আপদ মনে করে।। এমনই এক অন্ধ নিজের ঘরকে কবর আখ্যায়িত করে অভিযোগের সুরে বলে :

'হায়, আমি যেন নিজের ঘরেই কবরস্থ হয়ে আছি—যেখানে আমার সকাল-বিকাল একসমান। এ দেখে হিংসুকের মনেও আমার জন্য দয়া আসে। আমার জন্য তারা কাঁদে। তবে এই দয়া ও কান্না আমার কোনো কাজে আসে না।'[১৩৭]

দুই শ্রেণির মানুষের মাঝে কত বিশাল পার্থক্য দেখো! এ পার্থক্য দেখে অনেক পাশ্চাত্য লেখক ও গবেষক বিস্ময়ে হতবাক হয়েছেন। নিচে এ সংক্রান্ত একটি গল্প তুলে ধরা হলো :

---

১৩৬. ওয়াহইয়ুল কলাম : ১/৫২।

১৩৭. ১৫ নং ফায়দা : ইবনুল কাইয়িম ﷺ স্বর্ণের অক্ষরে লিখে রাখার মতো একটি কথা বলেছেন, যা আশাহতদের মনে আশার সঞ্চার করে। তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দার জন্য যে ফয়সালাই করেন, সেটাই তার জন্য কল্যাণকর; চাই এ ফয়সালা তার ভালো লাগুক বা খারাপ লাগুক। সুতরাং আল্লাহ তাআলা যদি কোনো মুমিনকে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, সেটা না দেওয়ার পদ্ধতিতে দান করা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার ওপর যত বালা-মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা আসে, সবই মূলত নিয়ামত। তবে বান্দা নিজের অজ্ঞতার কারণে কেবল সেই নিয়ামতটিই অনুধাবন করতে পারে, যা তার চাহিদার সাথে মিলে যায় এবং তাৎক্ষণিক আনন্দ দান করে। সে বান্দার মাঝে সামান্যতমও আল্লাহর মারিফাত বা যথাযথ পরিচয় থাকত, তাহলে সে বঞ্চিত হওয়াকেও নিয়ামত মনে করত এবং বালা-মুসিবতকে রহমত মনে করত। আর সুস্থতা ও নিরাপত্তায় যে রকম সুখ অনুভব করে, তার চেয়ে বেশি সুখ অনুভব করত বালা-মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশায়। প্রাচুর্যে যে সুখ অনুভব করত, তা অপেক্ষা বেশি সুখ অনুভব করত, দারিদ্র্যের মাঝে। অসচ্ছলতার সময়ে সচ্ছলতার সময়ের চেয়ে বেশি আনন্দ অনুভব করত। (মাদারিজুস সালিকিন : ২/২০৭)

আমি আল্লাহর জান্নাতে বাস করি

ডেল কার্নেগি তার প্রসিদ্ধ বই How to Stop Worrying and Start Living-এ প্রখ্যাত পশ্চিমা লেখক রোনাল্ড ভিক্টর কোর্টনি বডলির একটি চমৎকার প্রবন্ধ উদ্ধৃত করেছেন। যেখানে বডলি লিখেছেন :

১৯১৮ খ্রিষ্টাব্দে আমি আমার পরিচিত পৃথিবী থেকে ফিরে এসে উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায় চলে গেলাম। সেখানে মরুভূমিতে বেদুইন লোকদের সাথে সাত বছর কাটালাম। এ সময়ে বেদুইনদের ভাষা-সংস্কৃতি ও আচার-আচরণ খুব ভালোভাবেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলাম। তাদের মতো করে পোশাক পরিধান করতাম। তারা যা খায় আমিও তা-ই খেতাম। বেশভূষায়ও সম্পূর্ণরূপে তাদের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। এভাবে আমি তাদেরই একজন হয়ে উঠেছিলাম। তাদের মতো আমারও ছাগলের পাল ছিল। তাদের মতো আমিও তাঁবুতে ঘুমাতাম। সে সময় আমি ইসলামকে নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করলাম এবং ইসলামের নবি মুহাম্মাদকে নিয়ে 'রাসুল' নামে একটি বইও লিখলাম।

তাদের সাথে কাটানো সাতটি বছর ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর ও উপভোগ্য সময়। শান্তি, প্রশান্তি ও নিশ্চিন্তময় ছিল প্রতিটি ক্ষণ।

সে সময় মরুবাসী আরবদের থেকে আমি শিখেছি কীভাবে দুশ্চিন্তাকে জয় করতে হয়। তারা ইসলামধর্মের অনুসারী। আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও তাকদিরের ওপর আছে তাদের অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাস তাদের নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করতে সহায়তা করে এবং এই বিশ্বাসের ফলেই জীবনকে তারা খুব সহজভাবে নেয়। কোনো বিষয়ে তারা তাড়াহুড়ো করে না এবং নিজেদের অপ্রয়োজনীয় চিন্তার বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখে না। তারা বিশ্বাস করে, তাকদিরে যার জন্য যা-ই লিখা আছে, তার সাথে তা-ই হবে। তবে এর অর্থ তারা এটা বোঝে না যে, তাদের কোনো কাজ করতে হবে না; হাত গুটিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকলেই হবে।

এরপর তিনি বলেন :

একটি উদাহরণ দিলে তাদের অবস্থা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। একদিন তীব্র ঝড়ো হাওয়া বইল। এই ঝড়ে সাহারা মরুভূমির বালি উড়ে গিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে একদম ফ্রান্সের রাউন উপত্যকায় পৌঁছে যায়। এই ঝড় ছিল প্রচণ্ড রকমের গরম। এমনকি আমি অনুভব করছিলাম যে, গরমের তীব্র তাপে আমার মাথার চুলগুলো কাঁপতে শুরু করেছে। তীব্র গরমের কারণে আমার মনে হয়েছিল, যেন আমাকে কোনো গরম চুল্লির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

কিন্তু আরব বেদুইনদের এ ব্যাপারে কোনো অভিযোগ নেই। সবার মুখে চিরাচরিত সেই উক্তি : 'আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্য করেন।' তবে ঝড় যখন আরও তীব্র হলো, তখন তারা কাজের গতি বাড়িয়ে দিল। গরম হাওয়ায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পূর্বে তাদের দুর্বল পশুগুলো জবাই করে দিল। অতঃপর বাকি পশুগুলোকে দক্ষিণ দিকে পানির কাছে নিয়ে গেল। এসব তারা করল বিস্ময়কর নীরবতা ও স্থিরতার সাথে। কারও মুখে অভিযোগের কোনো শব্দ নেই।

গোত্রপ্রধান বললেন, 'আমাদের বড় ধরনের কোনো কিছু হারাতে হয়নি। অথচ আমরা সবকিছু হারানোর জন্যই সৃষ্টি হয়েছি। কিন্তু আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে আমাদের প্রায় ৪০% গবাদি পশু সুরক্ষিত আছে। এ জন্য তাঁর প্রতি জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া। ইনশাআল্লাহ, আমরা প্রচেষ্টার মাধ্যমে সবকিছু আবার নতুনভাবে শুরু করব।'

বডলি বলেন :

আরেকদিনের ঘটনা। একদিন আমি গাড়ি দিয়ে মরুভূমি পাড়ি দিচ্ছিলাম। তখন মাঝপথে হঠাৎ করে গাড়ির একটি টায়ার ফেটে গেল। ড্রাইভার গাড়িতে রিজার্ভ টায়ারও রাখেনি। এতে আমার ভীষণ রাগ হলো এবং চরম দুশ্চিন্তা চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরল। আমি রাগতস্বরে বেদুইন সহযাত্রীদের বললাম, 'এখন আমাদের কী করা উচিত?'

তারা বলল, 'রাগ করে তো কোনো উপকার হবে না। রাগ মানুষকে বোকামি ও সিদ্ধান্তহীনতায় ঠেলে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না।'

উপায়ান্তর না দেখে আমাদের নিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল তিন চাকার ওপরেই। তবে বেশিদূর যেতে পারেনি। কিছুদূর যাওয়ার পরেই পেট্রল ফুরিয়ে গেল।

এখানেও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, আমার বেদুইন সহযাত্রীদের কেউই উত্তেজিত হয়নি। তারা বাকি পথ সম্পূর্ণ স্থির ও শান্তভাবে হেঁটে হেঁটে পাড়ি দিল।

বডলি মরুবাসী আরবদের সাথে থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার পর বলেন :

বেদুইনদের সাথে কাটানো সাতটি বছর আমাকে অনুভব করিয়েছে যে, যেসব মানসিক রোগী ও মাদকাসক্ত লোকে আমেরিকা-ইউরোপ ভরে গেছে, তারা সভ্যতার বলি ছাড়া কিছুই নয়, যে সভ্যতা দ্রুততা ও অস্থিরতাকে নিজের ভিত্তি বানিয়ে নিয়েছে। যতদিন আমি মরুভূমিতে ছিলাম, হতাশা ও দুশ্চিন্তা আমাকে স্পর্শ করেনি। বরং সেখানে আমি আল্লাহর জান্নাতে ছিলাম এবং শান্তি, প্রশান্তি, তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির মাঝে জীবন অতিবাহিত করেছি।

একদম শেষের দিকে তিনি বলেন :

সারকথা হলো, আমি মরুভূমি থেকে চলে এসেছি আজ সতেরো বছর অতিবাহিত হলো। কিন্তু এখনো আমি আল্লাহর যেকোনো সিদ্ধান্ত ও ফয়সালার ব্যাপারে আরবদের অবস্থানকেই ফলো করি। ফলে আমার সকল দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদকে আমি স্থিরতার সহিত শান্তভাবে মোকাবিলা করি।

এই যে স্বভাব, যা আমি আরবদের থেকে অর্জন করেছি, তা আমার স্নায়ুকে স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রিত রাখতে এতটাই কাজ করে, যা হাজার হাজার ডাক্তারি ওষুধ করতে পারে না।[১৩৮]

---

১৩৮. দায়িল কালকা ওয়াবদায়িল হায়াত : পৃ. ২৯০-২৯২।
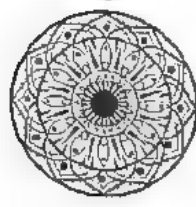
প্রকৃত ঐশ্বর্য

সহিহ হাদিসে এসেছে :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ صَدْرَكَ غِنًى وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلأْتُ يَدَيْكَ شُغْلاً وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ

'আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, "হে আদম-সন্তান, আমার ইবাদতে পূর্ণ আত্মনিয়োগ করো, আমি তোমার অন্তরকে ঐশ্বর্যে পূর্ণ করে দেবো এবং তোমার অভাব দূর করে দেবো। যদি তুমি তা না করো, তাহলে আমি তোমার দুহাত কর্মব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেবো এবং তোমার অভাব-অনটন দূর করব না।"'[১৩৯]

হাদিসে যে ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে, তা মূল্যহীন মুফত কোনো হাদিয়া নয়; বরং আল্লাহ তাআলার বিশেষ প্রতিদান, যা তিনি ইবাদতে আত্মনিয়োগের বিনিময়ে দান করেন। যথাযথ বিনিময় না দিয়ে কেউ এ বিনিময় লাভ করতে পারে না। হাদিসের শব্দ 'পূর্ণ আত্মনিয়োগ করো' থেকে বোঝা যায়, বান্দার অন্তরে আরও অনেক কিছুর প্রতি আগ্রহ জন্মায়, তখন যে বান্দা অন্যান্য সকল প্রিয় বস্তুর ওপর আল্লাহকে প্রাধান্য দেয়, তাকে আল্লাহ তাআলা ঐশ্বর্য দানে সমৃদ্ধ করেন। যাতে আখিরাতের জান্নাত লাভ করার পূর্বে দুনিয়াতেই জান্নাতি সুখ আস্বাদন করতে পারে। হাদিসে যে ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে, তার তিনটি অর্থ আছে :

---

১৩৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৬৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১০৭।

প্রথম অর্থ : পরিতুষ্টি

প্রকৃত ও ব্যাপক অর্থে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি পূর্ণ আত্মনিয়োগ করলে, বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অন্তরকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে দেন এবং অভাব-অনটন দূর করে দেন। তাই তো অনেক মানুষ কুঁড়েঘরে বাস করেও সুখের সমুদ্রে অবগাহন করে। যে সময় অট্টালিকায় বসবাসকারী অনেক মানুষের সাথে দুঃখ-দুর্দশা ও অভাববোধ আঠার মতো লেগে থাকে। কারণ, আল্লাহই একমাত্র সত্তা, যিনি কলবের ঐশ্বর্যের মতো অধরা নিয়ামত দান করতে পারেন, যে নিয়ামত প্রাপ্ত হলে মানুষের মনের অভাববোধ ও ক্ষুধা দূরীভূত হয়ে যায়। মনে অনুভূত হয় ঐশ্বর্য ও পরিতুষ্টি। আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো সত্তা এমন নিয়ামত দান করতে পারে না। এখানে আমরা যে বিষয়টিকে ঐশ্বর্য ও ধনাঢ্যতা বলেছি, রাসুল ﷺ সেটাকে আরও স্পষ্ট করে ইরশাদ করেছেন :

لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ

> 'বিষয়-সম্পদের আধিক্য প্রকৃত ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হলো অন্তরের ধনবত্তা।'[১৪০]

হাদিসে বিষয়-সম্পদের জন্য আরবি শব্দ ব্যবহার করেছেন 'আরদ'—যার ধাতুগত অর্থ হচ্ছে, ক্ষণস্থায়ী হওয়া। বিষয়-সম্পদ যেহেতু আজ আছে কাল নেই টাইপের, তাই এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, মনের ঐশ্বর্য হলো স্থায়ী ঐশ্বর্য, যা মৃত্যুঅবধি বান্দার সঙ্গ ছাড়ে না।

নবিজি ﷺ আরেকটি হাদিসে কথাটি আরও জোর দিয়ে বলেছেন; যেন সাহাবিদের মনে তা ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়। যাতে জীবনের সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা ও সংকীর্ণতা—যেকোনো মুহূর্তে তাঁদের অন্তর থেকে বিষয়টি বিস্মৃত হয়ে না যায়। হাদিসটির ভাষা নিম্নরূপ :

নবিজি ﷺ একদিন আবু জার গিফারি رضي الله عنه-কে বললেন, 'আবু জার, তুমি কি সম্পদের আধিক্যকে ঐশ্বর্য মনে করো?' আবু জার رضي الله عنه বললেন, 'জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তাহলে তুমি সম্পদ কম হওয়াকে দারিদ্র্য

১৪০. সহিহুল বুখারি : ৬৪৪৬, সহিহ মুসলিম : ১০৫১।

মনে করো?’ আবু জার ﷺ বললেন, ‘জি, ইয়া রাসুলাল্লাহ।’ রাসুল ﷺ বললেন,

إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فَقْرُ الْقَلْبِ

‘প্রকৃত ঐশ্বর্য হলো মনের ঐশ্বর্য এবং প্রকৃত দারিদ্র্য হলো মনের দারিদ্র্য।’[১৪১]

অতঃপর আরও বিস্তারিত ও স্পষ্ট ভাষায় রাসুল ﷺ ইরশাদ করেন :

مَنْ كَانَ الْغِنَى فِي قَلْبِهِ لَا يَضُرُّهُ، مَا لَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَنْ كَانَ الْفَقْرُ فِي قَلْبِهِ، فَلَا يُغْنِيهِ مَا أَكْثَرَ لَهُ فِي الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ شُحُّهَا

‘যার হৃদয়ে ধনবত্তা থাকে, দুনিয়ার কোনো বঞ্চনা তার ক্ষতি করতে পারে না। আর যার হৃদয়ে দরিদ্রতা থাকে, দুনিয়ার ধনাধিক্য তাকে অভাবমুক্ত করতে পারে না। আসলে হৃদয়ের কার্পণ্যই তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।’[১৪২]

হাদিসের ব্যাখ্যা : অভাবমুক্ত থাকাই হলো প্রকৃত ঐশ্বর্য বা ধনাঢ্যতা। অভাব মানে হচ্ছে, তুমি কোনো বস্তুর কামনা করছ; কিন্তু তা পাচ্ছ না। অনেক কোটিপতি ও ধনকুবের, যদি তার মাঝে লোভ-লালসা বেশি হয়, সে ঐশ্বর্যের গুণ অর্জন করতে পারে না। তার দরিদ্রতা কখনো দূরীভূত হয় না। কারণ, তার লোভের কারণে সে কখনো অভাবমুক্ত হয় না। সে যতই সম্পদ অর্জন করুক, আরও বেশির লালসা তার মাঝে অভাবকে সর্বদা জিইয়ে রাখে। তার অন্তর পূর্ণ হয়ে থাকে লালসার আগুনে, যা তার সকল সম্পত্তি ও নিয়ামতকে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।

---

১৪১. সহিহ ইবনু হিব্বান : ৬৮৫, আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ১১৭৮৫।

১৪২. আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ১৬৪৩।

১৬ নং ফায়দা : হৃদয়ের দরিদ্রতার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা না থাকা, প্রয়োজনের সময় হৃদয় আল্লাহর প্রতি ধাবিত না হওয়া এবং অল্পক্ষণের জন্যও আল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষিতা আসা। পক্ষান্তরে কোনো বান্দা যদি সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তিনিই একমাত্র প্রদানকারী এবং বাধা দানকারী, উপকার ও অপকার করার একমাত্র মালিক তিনিই; ফলে সকল বিষয়ে সে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ঐশ্বর্য দান করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল কিছুর প্রতি তাকে অমুখাপেক্ষী রাখেন।

এ জন্যই আবু হাতিম আল-বাস্তি বলেন, 'পরিতুষ্টির স্থান হৃদয়। যার অন্তর ধনী হয়, তার হাতও ধনী হয়। আর যার অন্তর দরিদ্র হয়, তার সম্পদের আধিক্য তার কোনো উপকার করতে পারে না।'[১৪৩]

এ জন্যই আবুল আতাহিয়া সুন্দর ও স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, 'লোভ কখনো বৃদ্ধ হয় না এবং অন্তরে ক্ষুধা কখনো নিবারিত হয় না।' মানুষের মনের অবস্থার যথাযথ বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন :

'আমার মাথার চুল পেকে গেছে; কিন্তু লোভের ওপর আদৌ ছাপ পড়েনি বার্ধক্যের। অথচ লোভই দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি ক্লান্তকর পরিশ্রম করে। আমার অবস্থা হলো, যখন আমি কোনো স্তরে পৌছানোর চেষ্টা করতে করতে তা পেয়ে যাই, তখনও তা নিয়ে তৃপ্ত হতে পারি না। মন আমার উথলা হয়ে ওঠে অন্য স্তরে গিয়ে পৌছানোর জন্য।'

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ﷺ নিজ সন্তান উমরকে ধনাঢ্যতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে বলেন :

'বৎস আমার, যদি তুমি ধনাঢ্যতা অনুসন্ধান করো, পরিতুষ্টির সাথে তা অনুসন্ধান করো। কারণ, তোমার মাঝে যদি পরিতুষ্টি না থাকে, তাহলে সম্পদ তোমার কোনো কাজে আসবে না।'[১৪৪]

সুতরাং পরিতুষ্টিই ধনাঢ্যতা এবং লোভই দরিদ্রতা। লোভ-লালসা ও পরিতুষ্টি পরস্পর বিরোধী। এক খুতবার মধ্যে উমর ﷺ সুন্দরভাবে তা উপস্থাপন করেছেন :

'তোমাদের অবশ্যই জানা উচিত যে, লোভ আর দরিদ্রতা একই জিনিস, মাখলুকের প্রতি আশাহীনতা এবং ধনাঢ্যতা অভিন্ন বস্তু। মানুষ যখন কোনো বিষয়ের প্রতি আশাহীন হয়, তার প্রতি সে অমুখাপেক্ষী থাকে।'[১৪৫]

---

১৪৩. রওজাতুল উকালা ওয়া নুজহাতুল ফুজালা : পৃ. ১৫১।
১৪৪. উয়ুনুল আখইয়ার : ৩/২০৭।
১৪৫. আজ-জুহদ, ওয়াকি : ৩/৪২৬।

সৎকর্মশীল বন্ধুরা, লোভ কত নিন্দনীয় বিষয় এবার বুঝতে পেরেছ তো? আবুল আব্বাস মুরসি লোভ নিয়ে দারুণ মজার একটি বিষয় উদঘাটন করেছেন। তা হচ্ছে, আরবিতে লোভের প্রতিশব্দ হচ্ছে (طَمَع), যার মধ্যে তিনটি অক্ষর আছে : ع م ط তিনোটাই পেটওয়ালা হরফ। যেন শব্দটাই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, যার মাঝে তমা' বা লোভ আছে, তার পেট কখনো পরিতৃপ্ত হবে না। জনৈক কবি বলেন :

'লোভ-লালসা পরিত্যাগ করা যুবকের সম্মান, লোভ-লালসা তার অসম্মান।'

এটি এমন এক অসম্মান ও লাঞ্ছনা, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে কখনো আলাদা হয় না। সাররাদুর যেমনটি বলেছেন :

'মানুষ লাঞ্ছিত ও নিচু হয়ে থাকে নিজের লোভের সামনে, যেভাবে ভৃত্য লাঞ্ছিত ও নিচু হয়ে থাকে মনিবের সামনে।'

যেভাবে ভৃত্য তার মনিবের সকল নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে, কোনোরূপ অবাধ্যতা করে না, ঠিক সেভাবে লোভের দাসও তার লোভ-লালসার সকল নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে এবং দাসত্বের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দেয়। এই দাসত্ব সম্পর্কে আরব্য কবি আবুল আতাহিয়া বলেন :

'আমি আমার লোভের আনুগত্য করেছি, বিনিময়ে সে আমাকে তার দাস বানিয়ে নিয়েছে। যদি আমি লোভের বশ্যতা স্বীকার না করে পরিতুষ্টি অবলম্বন করতাম, তাহলে আজ আমি স্বাধীন হতাম।'

এটা স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া এক দাসত্ব। চরম লাঞ্ছনা ও অসম্মানজনক বন্দিত্বও বটে। সুতরাং যে ব্যক্তি লোভের কাছে বন্দী, সে যতই সম্পদশালী হোক, কখনো ধনী হতে পারে না। কেননা :

- ওই ব্যক্তি কি ধনী হতে পারে, যার মাঝে পরিতুষ্টি নেই এবং মানুষের সম্পদের প্রতি যে লালায়িত?

- ওই ব্যক্তি কি ধনী হতে পারে, যে সব সময় মজাদার খাবার, টাটকা ফল এবং দামি পোশাকের আগ্রহ করে, আর যখন তা হাতে আসে, তখন তুষ্ট না হয়ে অন্য কিছুর প্রতি লোভী হয়ে ওঠে?
- ওই ব্যক্তি কী করে ধনী হতে পারে, যে অন্যকে নিজের চেয়ে একটু অগ্রসর দেখলে নিজের ভাগ্যকে ভর্ৎসনা করে?
- ওই ব্যক্তিকে কীভাবে ধনী বলা যাবে, যে সব সময় নিজের চেয়ে এগিয়ে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে অন্তর্জ্বালায় পুড়তে থাকে; কিন্তু নিজের চেয়ে পিছিয়ে থাকা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা আদায় করে না?

ধনী ও গরিবের দ্বন্দ্ব

এক ধনী ব্যক্তি তার রিজিকের প্রশস্ততা ও সম্পদের আধিক্য নিয়ে একজন গরিব ব্যক্তির সামনে খুব গর্ব করে বেড়াচ্ছিল, জবাবে সে গরিব লোকটি—যার অন্তর প্রকৃত ধনাঢ্যতা ও ঐশ্বর্যে ভরপুর ছিল, যার স্বাদ সে ধনী লোকটি আস্বাদন করতে পারেনি—বলল :

'হে দরিদ্রতার সমালোচক, একটু থামবে কি তুমি? দরিদ্রতার চেয়ে ধনাঢ্যতার দোষ বেশি পাবে, যদি একটু চিন্তা করে দেখো তুমি। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি শুদ্ধ হলে তুমি দেখবে, ধনাঢ্যতার চেয়ে দরিদ্রতা অনেক মর্যাদামণ্ডিত ও ফজিলতপূর্ণ। কারণ, কোনো কোনো মানুষ ধনী হওয়ার জন্য আল্লাহর নাফরমানির আশ্রয় নিলেও, কোনো মানুষ গরিব হওয়ার জন্য আল্লাহর অবাধ্যতা করে না।'

ধনীদের নেতা

ধনী মনের অধিকারী একজন অনন্য আদর্শ ব্যক্তি। তার হৃদয় সর্বদা নিশ্চিন্ত ও প্রশান্ত থাকে। সে পীড়াপীড়ি করে কারও কাছে যাচনা করে না। সম্পদের পেছনে কুকুরের মতো হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে দৌড়ায় না। কোনো লেনদেনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে অথবা লাভজনক কোনো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে আফসোস করতে করতে নিজেকে শেষ করে দেয় না। তাই তো সে মানুষের মাঝে সম্রাটের

মতো বসবাস করতে পারে। কারণ, সে তাদের সহযোগিতার প্রতি মুখাপেক্ষী নয় এবং তাদের কাছ থেকে চাইতে গিয়ে তার চেহারা মলিন হয় না। প্রকৃত ধনীদের খবর শোনো তাদেরই একজন হাসান বিন সালিহ ﷺ থেকে :

'অনেক সময় এমন অবস্থায় আমার সকাল হতো যে, একটি কানাকড়িও আমার হাতে থাকত না। তা সত্ত্বেও আমি এমনভাবে চলতাম, যেন দুনিয়ার সকল সম্পদ আমার মালিকানাধীন।'[১৪৬]

আমাদের সমসাময়িক ইতিহাস থেকে একজনের গল্প শোনো :

বারা নেজার রাইয়ান স্বীয় পিতা ড. নেজার রাইয়ান এবং বস্তুবাদের এ যুগে তার আশ্চর্যজনক দুনিয়াবিমুখতার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন, 'একদিন তিনি আমাকে বললেন, "হে বারা, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, মানুষজন যে সহায়-সম্পত্তি ও বিত্ত-বৈভবের প্রতি লালায়িত, সেসবের প্রতি আমার মনের মধ্যে কোনো লোভ অনুভব করি না। সবই আমি আল্লাহর জন্য পরিত্যাগ করেছি।" তাঁর এমন মহত্ত্বের বিনিময়ে আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন।'

পকেট খালি তবে মন ঐশ্বর্য ও উদারতায় পূর্ণ, এমন প্রকৃত ধনীদের একজনের গল্প শোনো :

যে গোলামের চরিত্র অভিজাত শ্রেণির লোকদের মতো!

যারা প্রকৃত ধনী, তারা অত্যন্ত উদার ও দানশীল হয়। নিজেদের যাবতীয় সহায়-সম্পত্তি দান করতেও তাদের গায়ে লাগে না। কারণ, তাদের ঐশ্বর্য থাকে মূলত তাদের মনে। হৃদয়ে তারা ধারণ করে প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি। এমনই একজনের ঘটনা বর্ণনা করেছেন মুহিব্বুদ্দিন আল-খাতিব তার বিখ্যাত 'আল-হাদিকাহ' গ্রন্থে। তিনি সেখানে গরিবের জীর্ণ পোশাকে আচ্ছাদিত একজন ধনীর বিবরণ দিয়েছেন। লোকটি মূলত একজন কৃষ্ণাঙ্গ গোলাম। একদা তার পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন বসরার আমির উমর বিন আব্দুল্লাহ বিন মামার। লোকটি তখন একটি বাগানের দেয়ালের পাশে বসে খাবার খাচ্ছিলেন। তার

১৪৬. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৭/৩৬৯।

সামনে ছিল একটি কুকুর। তিনি এক লুকমা খেয়ে আরেক লুকমা কুকুরকে খেতে দিচ্ছিলেন। এ দেখে উমর বিন আব্দুল্লাহ বললেন, 'কুকুরটি কি তোমার?'

–না।

–তাহলে তুমি যা খাচ্ছ, তাকে তা-ই খেতে দিচ্ছ যে?

–কারণ, একটি দুচোখওয়ালা প্রাণী আমার দিকে চেয়ে আছে, এমন সময় তাকে না দিয়ে একাকী খেতে আমার লজ্জা লাগে।

–তুমি স্বাধীন নাকি গোলাম?

–আমি বনি আসিম গোত্রের এক ব্যক্তির গোলাম।

অতঃপর উমর তার মালিকপক্ষকে ডেকে এনে তাদের থেকে তাকে কিনে নিলেন এবং পুরো বাগানটাও কিনে নিলেন। অতঃপর তার নিকট গিয়ে বললেন, 'তোমাকে জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে আজাদ করে দিয়েছেন?'

–সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি একক, অদ্বিতীয়। তিনি ছাড়া আর কেইবা আমাকে আজাদ করতে পারে?

–এই বাগান এখন থেকে তোমার।

–আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, এটাকে আমি শহরের গরিবদের জন্য ওয়াকফ করে দিলাম।

–কী বলছ এসব! তোমার দরিদ্রতা ও অভাব সত্ত্বেও তুমি এমন সিদ্ধান্ত কেন নিচ্ছ?

–আসলে আল্লাহ আমার প্রতি বড় একটি অনুগ্রহ করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কার্পণ্য করতে আমার লজ্জা লাগছে![১৪৭]

পক্ষান্তরে, যার সম্পদ বেশি হয় এবং বিভিন্ন সোর্স থেকে সম্পদ অর্জন করতে থাকে, এমনকি সম্পদ কামাই করা ছাড়া অন্য কিছু সে ভাবতেই পারে না এবং সব সময় কামনা করতে থাকে যে, অন্যান্য মানুষের হাতে যত সম্পদ

---

১৪৭. আল-হাদিকাহ : পৃ. ১৩৫৪-১৩৫৫।

আছে, সব তার হাতে চলে আসুক, সে পরশ্রীকাতরতা, মনঃকষ্ট ও অস্থিরতায় ভোগে সব সময়। সেই প্রকৃত গরিব। এ জন্যই অভিজ্ঞজনেরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে একটি মূলনীতি দাঁড় করিয়েছেন :

'যে অল্পতে তুষ্ট হয় না, অধিক পেলেও সে তুষ্ট হতে পারে না।'

ফুজাইল বিন ইয়াজ ﵀ ধনী ও গরিব নির্ণয়ের জন্য একটি সূক্ষ্ম মানদণ্ড তৈরি করেছিলেন। কী ছিল সেই মানদণ্ড, নিচের গল্পটি থেকে তা জেনে নাও :

একদিন ফুজাইল বিন ইয়াজের এক ভক্ত এসে বলল, 'আপনি এই জুব্বাটি আমার থেকে হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করলে আমি খুশি হব।'

– যদি তুমি ধনী হও, তাহলে আমি তা গ্রহণ করব।

– আমি ধনী।

– তোমার কাছে কী পরিমাণ সম্পত্তি আছে?

– দুই হাজার।

– তুমি কি চাও, তা চার হাজার হয়ে যাক?

– অবশ্যই।

– তাহলে তো তুমি গরিব, আমি তোমার থেকে হাদিয়া গ্রহণ করতে পারব না।[১৪৮]

---

১৪৮. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১০/১৪৮।

গাইরুল্লাহর দাসত্বের লাঞ্ছনা

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ

'ধ্বংস হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাক-আশাক ও উত্তম চাদরের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, তার অবস্থা আরও খারাপ হোক! তার পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ বের না করুক!'[১৪৯]

দাসত্ব মানে কোনো বস্তুর সামনে নিচু ও লাঞ্ছিত হওয়া। সুতরাং দুনিয়ার দাস হওয়া মানে নিজের মনকে দুনিয়ার সামনে অবনমিত ও অনুগত করে দেওয়া। ফলে রিজিক অনুসন্ধানের জন্য সে যেকোনো হীনতা ও লাঞ্ছনার পথে চলতে কুণ্ঠাবোধ করে না। এমনকি হারাম উপায়ে রিজিক অনুসন্ধান করতেও দ্বিধাবোধ করে না সে।

আবু আলি আদ-দাক দাসত্বের যে অর্থ করেছেন, তা দাসত্বের অর্থকে আরও ব্যাপক ও স্পষ্টভাবে বোঝায়। তিনি বলেন :

'তুমি তারই গোলাম, যার হাতে তুমি বন্দী। সুতরাং তুমি যদি নিজের প্রবৃত্তির কাছে বন্দী হয়ে থাকো, তাহলে তুমি নিজের প্রবৃত্তির গোলাম। আর যদি দুনিয়ার হাতে বন্দী হয়ে থাকো, তাহলে তুমি দুনিয়ার গোলাম।'[১৫০]

---

১৪৯. সহিহুল বুখারি : ২৮৮৭।
১৫০. আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : ২/৩৪৮।

উল্লিখিত হাদিসের ব্যাখ্যা :

হাদিসে দিনার, দিরহাম, উত্তম পোশাক-আশাক ও উত্তম চাদর—প্রত্যেকটিকে কেবল একটি অর্থে আনা হয়নি; বরং প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা অর্থ আছে। দিনার বলা হয় স্বর্ণের মুদ্রাকে এবং দিরহাম বলা হয় রুপার মুদ্রাকে। আগের যুগে মানুষ স্বর্ণ ও রুপার তৈরি মুদ্রা দিয়ে পরস্পর লেনদেন করত। দিনার ও দিরহাম দ্বারা হাদিসে মানুষের মাঝে সাধারণভাবে পরিচিত সম্পদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। দুনিয়ালোভী সম্পদশালীদের মধ্যে আবার তারতম্য আছে। কেউ কেউ অঢেল সম্পত্তির অধিকারী হয়, অধিক জমিজমা ও মালামালের মালিক হয়। হাদিসের এ ধরনের ধনীকে 'দিনারের গোলাম' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কেউ কেউ কম সম্পদের মালিক হয়, তবে দ্রুতগতিতে যেকোনো সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে টাকা-পয়সা কামিয়ে ধনী হওয়ার সুতীব্র বাসনা নিয়ে দিনাতিপাত করে। হাদিসে তাদের 'দিরহামের গোলাম' বলা হয়েছে।

আর 'পোশাক-আশাকের গোলাম' বলে রেশম ও উলেন ইত্যাদি দ্বারা তৈরি আড়ম্বরপূর্ণ ও গৌরবময় পোশাক যারা পরে, তাদের বোঝানো হয়েছে। কারণ, যারা এ ধরনের পোশাক পরিধানে অভ্যস্ত, তারা এ অভ্যাস সহজে ছাড়তে পারে না। যেন তারা পোশাক-আশাক ও চাকচিক্যময় বেশভূষার গোলামে পরিণত হয়। তাদের মনজুড়ে কেবল ঘুরতে থাকে উন্নত ও জাঁকালো পোশাক-আশাকের ফিকির ও কল্পনা। এ জন্যই জনৈক সালাফ পোশাকের ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে বলেন :

'ওই কাপড় পরিধান করো, যে কাপড় তোমার সেবা করে। এমন কাপড় পরিধান করো না, যার সেবা তোমাকে করতে হয়।'[১৫১]

আর 'চাদরের গোলাম' বলে হাদিসে ওই ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে, যে নিজের এবং বাড়ির আসবাবপত্রকে অপ্রয়োজনীয় সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ করার জন্য চেষ্টা করতে থাকে এবং উত্তরোত্তর সুন্দর ও আড়ম্বরপূর্ণ করার ফিকিরে থাকে।

---

১৫১. ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া : ১০/৫৯৭।

অতঃপর রাসুল ﷺ এমন বান্দার অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলেন :

إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ،

'যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।'[১৫২]

অর্থাৎ যখন আল্লাহ তাআলা তাকে সম্পদ দান করেন, তখন সে আনন্দিত ও সন্তুষ্ট হয়। আর যখন তাকে সম্পদ দান না করেন এবং দরিদ্রতা দিয়ে পরীক্ষা করেন, তখন সে রাগান্বিত হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলার পবিত্র এই বাণীটি তার সাথে হুবহু মিলে যায় :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ

'মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে। যদি সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদতের ওপর কায়িম থাকে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়।'[১৫৩_১৫৪]

এ সম্পর্কে ইবনুল কাইয়িম ؒ বলেন :

'এসব লোক, যাদের দান করা হলে সন্তুষ্ট হয়, দান করা না হলে অসন্তুষ্ট হয়, তাদেরকে উল্লিখিত বস্তুসমূহের গোলাম বলে আখ্যায়িত করেছেন রাসুল ﷺ। কারণ, তারা সেগুলোর প্রতি ভীষণভাবে ভালোবাসা, লোভ ও আগ্রহ লালন করে। আর মানুষ যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর প্রতি এতটা আসক্ত

---

১৫২. সহিহুল বুখারি : ২৮৮৭।
১৫৩. সুরা আল-হাজ্জ, ২২ : ১১।
১৫৪. সহিহ বুখারিতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, (মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধাদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে।) : কোনো ব্যক্তি মদিনায় আগমন করত, অতঃপর তার স্ত্রী যদি পুত্র-সন্তান প্রসব করত এবং তার ঘোড়া বাচ্চা দিত, তখন বলত, "এ দ্বীন ভালো।" আর যদি তার স্ত্রী থেকে পুত্র-সন্তান না জন্মাত এবং তার ঘোড়াও বাচ্চা না দিত, তখন বলত, "এটা মন্দ দ্বীন।"'

হয়ে পড়ে যে, তা পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে অসন্তুষ্ট হয়, সেটা ওই বস্তুর প্রতি তার দাসত্বের বহিঃপ্রকাশ। যে পরিমাণ আসক্তি, সে পরিমাণ দাসত্ব।'[১৫৫]

এরপর রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'সে ধ্বংস হোক, তার অবস্থা আরও খারাপ হোক!' অর্থাৎ সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হোক, ধ্বংস হোক! কেননা, সে নিজের দ্বীনকে দুনিয়ার তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিয়েছে। মণিমাণিক্যের বিনিময়ে সে কিনে নিয়েছে মৃৎপাত্র। তা সত্ত্বেও সে দুনিয়া থেকে কেবল তা-ই অর্জন করতে পারবে, যা তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দ আছে। এই মানুষ মহামূল্যবান বস্তুর বিনিময়ে অতি তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তু ক্রয় করে নিয়েছে। মানুষের মাঝে বুদ্ধিশুদ্ধি বলে কিছু না থাকলেই কেবল এমনটি করা সম্ভব!

বস্তুত এটাই আল্লাহর নিয়ম, কেউ অবৈধ পথে সুখ তালাশ করলে তাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে সুখ থেকে বঞ্চিত রাখেন। বরং সুখের বদলে তার জীবনে ভরে দেন দুঃখ-দুর্দশা। কারণ, সে রবের দেখিয়ে দেওয়া পথ বাদ দিয়ে অন্য পথে সুখের অনুসন্ধান করেছে। ফলে যে পথে সুখ আছে মনে করে সে পা বাড়িয়েছে, সেখানে আল্লাহ তাআলা সুখের বদলে দুঃখ রেখে দিয়েছেন।

'তার পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হলে তা কেউ বের না করুক!'

রাসুল ﷺ এ ব্যক্তির জন্য বদ-দুআ করতে করতে চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে বললেন যে, তার পায়ে যদি কোনো কাঁটা বিদ্ধ হয়, তা যেন কোনো ছেনি ইত্যাদি দিয়ে তুলে নেওয়া সম্ভব না হয়! অর্থাৎ সে যদি কোনো বিপদে পড়ে, তাকে উদ্ধার করার জন্য কেউ এগিয়ে না আসুক এবং তার প্রতি কোনো মানুষের মনে দয়ার উদ্রেক না হোক! কারণ দুঃখগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি কেউ দয়ার্দ্র হয়ে তাকে সান্ত্বনা দিলে দুঃখ কিছুটা লাঘব হয়। কিন্তু রাসুল ﷺ চাইছেন, এ ব্যক্তির কপালে এতটুকু সহানুভূতিও না জুটুক! বরং তার দুঃখ দেখে তার শত্রুরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে তার কাটা গায়ে নুনের ছিটা দিক। হাদিসে বিশেষভাবে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার কথা বলার কারণ হলো, সাধারণত এমন ছোট বিপদে মানুষ সহজেই

১৫৫. ইগাসাতুল লাহফান মিন মাকাইদিশ শাইতান : ২/১৪৯।

পাশে এসে দাঁড়ায়। যখন এমন সহজ বিপদেও কারও পাশে আসাকে না করা হচ্ছে, তাহলে বড় বিপদে পাশে আসার তো প্রশ্নই আসে না![১৫৬]

এখন তোমার ইখতিয়ার। তুমি চাইলে এককভাবে আল্লাহর বান্দা হতে পারো, অথবা চাইলে তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরিক করতে পারো! চাইলে তুমি স্বাধীন থাকতে পারো, অথবা চাইলে প্রবৃত্তি ও মনোবাসনার গোলাম হয়ে থাকতে পারো!

ঐশ্বর্যের তিন মেরুদণ্ড

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﵁-এর নিকট এসে প্রশ্ন করলেন, 'আমরা কি গরিব মুহাজির নই?'

–তোমার কি স্ত্রী আছে, যার সাথে তুমি সঙ্গম করতে পারো?

–হ্যাঁ, আছে।

–তোমার কি একটি বাসস্থান আছে, যেখানে তুমি বসবাস করতে পারো?

–জি, আছে।

–তাহলে তুমি ধনীদের একজন।

–আমার একটা খাদিমও আছে!

–তাহলে তুমি একজন বাদশাহ![১৫৭]

আব্দুল্লাহ ﵁ রাসুল ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদিসের ওপর আমল করেই এমন মন্তব্য করেছেন :

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

---

১৫৬. মিরকাতুল মাফাতিহ শারহু মিশকাতিল মাসাবিহ : ৮/২৯-৩২।

১৫৭. আত-তারগিব ওয়াত তারহিব : ৪/৭৮।

‘তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে একদিনের খাবার আছে, তাকে যেন দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে।’[১৫৮]

এ বিষয়টি কেবল তারাই বুঝতে পারে, যাদের মাঝে তাকওয়া ও বিবেকের সমন্বয় ঘটেছে। যাদের হৃদয় জীবিত এবং যাদের ভেতরে ইমানওয়ালা অন্তর্দৃষ্টি আছে, কেবল তারাই তা অনুধাবন করতে পারে। ফলে দুনিয়ার কোনো আসবাব বা স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলে তাদের মন অস্থির হয়ে যায় না। তারা জানে যে, সুখী ব্যক্তি সাধারণ মানুষ যা খায়, তার চেয়ে বেশি খায় না এবং অন্যান্য মানুষের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হয়েছে বলে সে সুখী হয় না। বরং তার সুখের রহস্য হলো, অন্যান্য মানুষ যেখানে অধিক পেলেও তুষ্ট হতে পারে না, সেখানে সে অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। জনৈক দার্শনিককে প্রশ্ন করা হলো, ‘ঐশ্বর্য কী?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘ঐশ্বর্য হলো তোমার আশা-আকাঙ্ক্ষা কম হওয়া এবং যতটুকুতেই তোমার চলে, ততটুকুর ওপর পরিতুষ্ট হওয়া।’[১৫৯]

অলংকারপূর্ণ ভাষায় রাফিয়ি বলেন :

‘নিশ্চিন্ত ও অস্থিরতামুক্ত হৃদয়ে অধিক সম্পদের ফিকির থাকে না। আর যে অন্তরে অধিক সম্পদের ফিকির থাকে না, সে অন্তর অল্প পরিমাণ সম্পদ নিয়েও বেশি সুখী হয়।’[১৬০]

সেই সুখী কাফেলারই একজন সুখের আতিশয্যে আবৃত্তি করেন :

‘আমার কুঁড়েঘর আমার কাছে খলিফা ও উজিরের রাজপ্রাসাদের চেয়ে প্রিয়। যখন আমি এক টুকরো রুটি খেয়ে পুকুর থেকে পানি পান করি, তখন মনে হয় আমার চেয়ে সুখী এ তল্লাটে আর কেউ নেই, যেন আমিই খলিফা! খলিফার সুখ অনুভব করার জন্য আমাকে সুউচ্চ সিংহাসনে আরোহণ করার কোনোই প্রয়োজন নেই। পরিমাণে অল্প আহার্য যদি স্বচ্ছ ও যথেষ্ট হয়, তাহলে বেশির কোনো প্রয়োজন থাকে না।’

---

১৫৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৪৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১৪১, আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩০০।
১৫৯. ফাইজুল কাদির : ৪/২৮২।
১৬০. ওয়াহইয়ুল কলাম : ১/২৮।

তবে যে পরিতুষ্টির কথা এখানে বলা হয়েছে, সেটা সেই নিন্দিত পরিতুষ্টি এবং তুচ্ছ বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া নয়, যার ব্যাপারে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি পরিতুষ্টিকে পেশা বানিয়ে নিয়েছে, সে দুর্বলতার লেপে মুড়িয়ে যায় এবং উত্তম ও উন্নত বিষয় থেকে সব সময় বঞ্চিত থাকে।' মানুষকে ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে ঠেলে দেওয়া এ পরিতুষ্টি সম্পর্কে জনৈক সালাফ বলেন, 'পরিতুষ্টি হলো দুর্বল ও অশীতিপর বৃদ্ধা মহিলার স্বভাব।' রাফিয়ি[১৬১] এটাকে চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারের স্বভাব বলে আখ্যায়িত করেছেন :

'বিছানার ওপর সে আমার দৃঢ়তা ও অস্থিরতার আধিক্য দেখতে পেয়েছে। তাই বলল, "তুমি তো সাহসিকতার মূর্তপ্রতীক, বীরপুরুষ। অল্পতে তুষ্ট হতে পারো না?" বললাম, "অল্পতে তুষ্ট হওয়া তো চতুষ্পদ জন্তুর স্বভাব।"'

কবিসম্রাট আহমাদ শাওকিও এই পরিতুষ্টির নিন্দা করেছেন এবং এর বিপরীতে যে উচ্চ মনোবাসনা আছে, সেটার প্রশংসা করেছেন। বলেছেন :

'পরিতুষ্ট যুবকদলের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই। উচ্চ আকাঙ্ক্ষা লালনকারী যুবকদের মোবারকবাদ জানাই।'

দ্বিতীয় অর্থ : মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা

এক ব্যক্তি বসরা শহরে প্রবেশ করে বলল, 'এই শহরের সর্বোচ্চ সম্মানিত ব্যক্তি কে?' লোকেরা হাসান বসরির নাম বলল। লোকটি বলল, 'কীসের বিনিময়ে তিনি পুরো শহরবাসীর মর্যাদার আসনে বসেছেন?' তারা বলল, 'সকল মানুষ তাঁর জ্ঞানের মুখাপেক্ষী; কিন্তু তিনি তাদের মধ্য থেকে কারও পার্থিব সম্পদের মুখাপেক্ষী নন।'[১৬২]

---

১৬১. কবিতাটি মূলত বুরকায়ির (-অনুবাদক)।
১৬২. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২/২০৬।

এই অমুখাপেক্ষিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইমানি আমল এবং একটি বড় আত্মিক ইবাদত। আবু সাইদ খুদরি ﷺ-এর হাদিসের মধ্যে এসেছে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ

'আর যে অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন।'[১৬৩]

হাদিসের অর্থ হলো : কেউ যদি কোনো কিছু অর্জন করার জন্য নিজের সাধ্যমতো চেষ্টা করে, আল্লাহ তাআলা তাকে তা পাইয়ে দেন। সুতরাং কেউ যদি পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাআলা তাকে অভাবশূন্য করে দেন।[১৬৪]

নবিজি ﷺ আমাদের জন্য ওয়াদা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বনকারীকে অভাবমুক্ত করে দেবেন। তাঁর ওয়াদা দুভাবে পূরণ হতে পারে : হয়তো আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে ঐশ্বর্য দান করবেন; ফলে সে অন্য কারও প্রতি মুখাপেক্ষী হবে না। অথবা আল্লাহ তাআলা তাকে এ পরিমাণ রিজিক দান করবেন যে, কোনো মাখলুকের কাছে চাওয়ার প্রয়োজন হবে না তার।

সুতরাং যতটুকু করার সামর্থ্য তোমার আছে, তা করো এবং মাখলুকের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বনে আল্লাহর নির্দেশনা যথযথভাবে পালন করো। আল্লাহ তাআলা তোমাকে এত নিয়ামত দান করবেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য সবার থেকে তুমি প্রয়োজনমুক্ত থাকবে।[১৬৫] গাইরুল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষিতা

---

১৬৩. সহিহুল বুখারি : ১৪২৭, সহিহু মুসলিম : ১০৫৩।

১৬৪. কাশফুল মুশকাল মিন হাদিসিস সহিহাইন : ৩/১২৭।

১৬৫. ১৭ নং ফায়দা : আব্দুর রহমান সাদি ﷺ একটি মূলনীতি তুলে ধরেছেন যে, আল্লাহর একটি নীতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি উপকারী বিষয় দ্বারা উপকৃত হতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা দ্বারা উপকৃত হয় না, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে একটি অপকারী বিষয়ে লিপ্ত করে দেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তাকে মূর্তিপূজায় লাগিয়ে দেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভালোবাসা, ভয় ও আশা ছেড়ে দেয়, আল্লাহ তাআলা তার মনে গাইরুল্লাহর ভয়, ভালোবাসা ও আশা সৃষ্টি করে দেন। যে আল্লাহর আনুগত্যের পথে সম্পদ খরচ করে না, তার সম্পদ শয়তানের আনুগত্যে ব্যয়িত হয়। যে আল্লাহর সামনে অবনমিত ও বিনম্র হয় না, বান্দার সামনে তাকে নিচু ও লাঞ্ছিত হতে হয় যে হক পরিত্যাগ করে, সে বাতিলে জড়িয়ে পড়ে। (তাফসিরুস সাদি : ১/১৮)

প্রকৃতপক্ষে তোমার প্রতি আল্লাহর বিশেষ দান। এটি আল্লাহর প্রতি তোমার দাসত্বের পূর্ণতা। এই অমুখাপেক্ষিতা ব্যতীত তুমি আল্লাহর প্রকৃত দাস হতে পারবে না।

আল্লাহর সাথে তোমার সম্পর্ক যত শক্ত হবে, মাখলুকের সাথে তোমার সম্পর্ক তত দুর্বল হয়ে যাবে। কারণ আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতাই প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্যতীত অন্য সবার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা।

বাস্তবতা হলো, যে মানুষের প্রতি তুমি মুখাপেক্ষী হবে, সে আরও বড় ফকির। তোমাকে দান করার বা তোমার সহযোগিতা করার শক্তি তার নেই। ধনাঢ্যতার প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সেই রাজত্ব, যা কখনো নিঃশেষ হবার নয়। সে হিসেবে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ধনী শব্দটিও তার বাস্তবিক অর্থ হিসেবে মানানসই নয়। আল্লাহই একমাত্র ধনী, অন্য সবাই তাঁর প্রতি মুহতাজ, ফকির। আর মাখলুকের মধ্যে যে যত বেশি তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী, সে তত বেশি ধনী। তাঁর সামনে যে যত বেশি লাঞ্ছিত, সে বান্দাদের মাঝে তত বেশি সম্মানিত। তাঁর সামনে যে যত বেশি দুর্বল, মানুষের মাঝে সেই সবচেয়ে বেশি সবল ও শক্তিশালী।

এ জন্যই জনৈক কবি বান্দার কাছে চাওয়া এবং বান্দার রবের কাছে চাওয়ার পার্থক্য তুলে ধরে বলেন :

'তুমি যে সময়ে আমার নিকট তোমার সমস্যার কথা পেশ করছ, সে সময়ে আমি স্বয়ং নানা সমস্যায় জর্জরিত। আমি আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতি করে দাঁড়িয়েছি আর বলছি, প্রভু আমার, আমি আপনার কাছে সমস্যা সমাধানের আকুতি নিয়ে এসেছি। এমন কারও দরজায় আমি দাঁড়াইনি, যেখানে বলা হয়, আজ যাও, সাহেব আজকে বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

পর-অমুখাপেক্ষিতাই মান-মর্যাদা ও আত্মসম্মানের চাবিকাঠি। দুনিয়াবিমুখ সাধকপুরুষ হাসান বসরি ﷺ তা-ই বলেছেন :

'তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মাঝে সম্মানিত থাকবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ তোমাকে সমীহ করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মাল-সম্পদ তোমাকে দিতে না

হয়। তুমি যদি তাদের কাছ থেকে কিছু চাও, তখন তাদের দৃষ্টিতে তোমার মান কমে যাবে এবং তোমার কথা তাদের পছন্দ হবে না এবং একসময় তোমাকে তারা ঘৃণা করতে শুরু করবে।'[১৬৬]

ইমাম শাফিয়ি ﷺ আলিমগণের সম্মান এবং সুলতানের চেয়ে তাদের সম্মান বেশি হওয়া নিয়ে গর্ব করে বলেন :

'পরিতুষ্টিই ঐশ্বর্যের মূল। তাই তো আমি পরিতুষ্টির আস্তিন শক্ত করে ধরে রেখেছি। সুতরাং পৃথিবীর দুয়ারে আমাকে যেতে হয় না, কারও দরবারে নিজেকে নিবেদিত করতে হয় না। ফলে টাকা-পয়সা ছাড়াই আমি ধনীদের একজন হয়ে উঠলাম এবং রাজা-বাদশাহদের মতো মানুষের ওপর হুকুম চালাই অবলীলায়।'

তোমার প্রতি আমার কোনো প্রয়োজন নেই

একদিন আহবাজের শাসক সুলাইমান বিন আলি মুহাল্লাবি নিজ সন্তানকে পড়ানোর জন্য খলিল বিন আহমাদ ফারাহিদির[১৬৭] কাছে খবর পাঠালেন। খলিল ফারাহিদি একটি শুকনো রুটি এনে সুলাইমানের দূতকে বললেন, 'যতদিন পর্যন্ত আমার কাছে এতটুকু রুটি আছে, সুলাইমানের প্রতি আমার কোনো প্রয়োজন নেই।' দূত বললেন, 'আপনার থেকে কী বার্তা নিয়ে যাব সুলাইমানের নিকট?' তিনি বললেন :

'সুলাইমানকে বলে দাও যে, আমি তার চেয়ে বেশি সচ্ছল ও ধনী, যদিও আমার কাছে তেমন পয়সাকড়ি নেই। দরিদ্রতা থাকে মনের মধ্যে। সম্পদের মধ্যে নয়, যেমনটি আমরা মনে করি। ধনাঢ্যতা ও ঐশ্বর্যেরও একই অবস্থা। সুলাইমান তো সামান্যতম অনুদান দিতেও কার্পণ্য অনুভব করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা অনেক উদার ও বদান্য। আমি সকল প্রয়োজনের কথা তাঁকেই বলি।'

---

১৬৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/২০।

১৬৭. ১৮ নং ফায়দা : খলিল বিন আহমাদ হচ্ছেন সেই বিস্ময়কর প্রতিভাধর ব্যক্তি, যিনি কবিতার মাত্র একটি চরণে আরবি ভাষার সকল অক্ষর নিয়ে এসেছেন :

صف خلق خود كمثل الشمس إذ بزغت * يحظى الضجيع بها نجلاء معطار

আত্মসম্মানের দিক দিয়ে বসরাবাসীর গর্ব মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﷺ-ও ঠিক খলিল ফারাহিদির মতো। তিনি শুকনো রুটি পানিতে ভিজিয়ে খেতেন এবং বলতেন, 'যে এতটুকুতে পরিতুষ্ট হয়, তার অন্য কারও প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন নেই।'[১৬৮]

এখানে যাদের কথা বললাম, তারা হলেন সেই লোক, যারা নিজেদের লোভ ও অভিলাষকে নৈরাশ্যের ছুরি দিয়ে জবাই করেছেন এবং লাঞ্ছনা ও নীচতাকে দ্বিধাবোধ ছাড়াই তালাক দিয়েছেন। অতঃপর মনের ধনাঢ্যতা ও অমুখাপেক্ষিতার মালা পরে বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন। তাদেরই একজন হলেন ইমাম শাফিয়ি ﷺ। কবিতার ছন্দে ছন্দে তিনি বলেন :

'আমি হত্যা করেছি আমার লোভ ও অভিলাষকে। তবে মনের মাঝে শান্তি খুঁজে পেয়েছি। কারণ, মনের মধ্যে যতক্ষণ লোভ থাকে, ততক্ষণ তার মাঝে কোনো শান্তি থাকে না। এরপর আমি জীবন দান করেছি মরে যাওয়া পরিতুষ্টিকে। সে জীবিত হয়ে আমার সম্মান ও মর্যাদাকে সুরক্ষিত রেখেছে। কারণ, লোভ কোনো মানুষের অন্তরে প্রবেশ করলে তার ওপর বিজয়ী হয় লাঞ্ছনা ও হীনতা।'

এ লোকগুলোর মাঝে ধনীসত্তা লুকিয়ে থাকলেও তাদের বাহ্যিক বেশভূষা সাধারণ ধনীদের মতো নয়। তারা খুব সাধারণ পোশাক পরে থাকেন। তাই তাদের বাহ্যিক রূপ ভেতরের মূল অবস্থাকে প্রকাশ করে না। যেমন দামি হীরার টুকরো লুকিয়ে থাকে পাথরের কোনো গর্তে। পান্না লুকিয়ে থাকে বালুকারাশির মাঝে। এ জন্যই ইমাম শাফিয়ি আগের কথার সাথে জুড়ে দিয়ে বলেন :

'আমার গায়ের ওপর থাকে এমন সব কাপড়, যেগুলোর সবকটিকে যদি কোনো পয়সা দ্বারা তুলনা করা হয়, তাহলে পয়সার চেয়ে কাপড়গুলো কমমূল্যের হবে। কিন্তু সে কাপড়ের মাঝে থাকে এমন একটি মন, যাকে সকল মাখলুকের মনের সাথে তুলনা করে দেখতে পাবে, এই মনটিই সবচেয়ে বড়। তরবারির খাপ পুরোনো হলে ক্ষতি কী, যদি তরবারিটি ধারালো ও সুতীক্ষ্ণ হয় এবং যে বস্তুর ওপরই আঘাত করা হয়, তাকে নিমিষেই কেটে ফেলতে পারে!?'

---

১৬৮. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/২৩৯।

এ জন্যই এই লোকগুলোর দিকে মানুষ ছুটে আসে। এমনকি রাজা-বাদশাহরাও তাদের সামনে নত হয়ে বসেন। এ ব্যাপারে সাইদ বিন মুসাইয়িব ﷺ দারুণ একটি হাদিয়া দিয়েছেন আমাদের :

'যে আল্লাহর জন্য অন্য সব মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী থাকে, মানুষ তার প্রতি মুখাপেক্ষী হয়।'[১৬৯]

মাঝেমধ্যে মানুষ হতভম্ব হয়ে যায়। মনে করে, তারা কত সম্পত্তির মালিক কে জানে! কিন্তু তাদের সম্পদ তো দেখা যায় না! এ জন্যই এক লোক কৌতূহল দমিয়ে রাখতে না পেরে আবু হাজিম ﷺ-কে বলেই বসলেন, 'আপনার সম্পত্তির পরিমাণ কত?' তিনি উত্তর দিলেন, 'আমার কেবল দুটি সম্পত্তিই আছে : আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি এবং মাখলুকের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা।'[১৭০]

এ সম্পর্কে ইবনে তাইমিয়া ﷺ সৃষ্টির কাছ থেকে চাওয়া এবং স্রষ্টার কাছে চাওয়া—এতদুভয়ের মাঝে তুলনা করে দারুণ একটি কথা বলেছেন। কথাটি তোমাকে দুটির মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক ও সহজ পথটি বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করবে। তিনি বলেন :

'আল্লাহ তাআলা—তুমি তাঁর প্রতি যতটা মুখাপেক্ষী, তিনি তার চেয়ে হাজারগুণ বেশি উদার এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ করার ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু বান্দা—মানুষ তার প্রতি যতটা মুখাপেক্ষী হয়, সে তাদের চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী।'[১৭১]

পর-অমুখাপেক্ষী বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটি নিয়ামত হলো, তিনি তাদের ভালোবাসেন। রাসুল ﷺ-ই সেই ভালোবাসার সুসংবাদ শুনিয়েছেন :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ، الْغَنِيَّ، الْخَفِيَّ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ওই বান্দাকে ভালোবাসেন, যে পরহেজগার (পাপকর্ম থেকে বিরত থাকে), অমুখাপেক্ষী (আল্লাহ ছাড়া কারও

১৬৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৭৩।
১৭০. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ১/১১৪।
১৭১. মাজমুউল ফাতাওয়া : ১/৩৯-৪০।

প্রতি মুখাপেক্ষী নয়) এবং আত্মগোপনকারী (নিজের গুণ প্রকাশে অনিচ্ছুক)।'[১৭২]

নবিজির শিক্ষা

আপন সাহাবিদের প্রতি রাসুল ﷺ-এর বিশেষ একটি শিক্ষা ছিল, কেউ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট সাহায্য চাইবে না এবং আল্লাহর সামনে নত হয়ে সিজদা করা ব্যতীত অন্য কারও জন্য কপাল মাটিতে ঠেকাবে না। আবু জার ﷺ-কে তিনি কী উপদেশ দিয়েছিলেন, তা শোনো :

'মানুষের নিকট কোনো কিছুই চাইবে না। এমনটি (বাহনের পিঠের ওপর থাকা অবস্থায়) তোমার চাবুক পড়ে গেলেও, সেটি উঠিয়ে দিতে কাউকে বলবে না। তুমি নিজে নেমে তা উঠিয়ে নেবে।'[১৭৩]

সুবহানাল্লাহ! নবিজি ﷺ আমাদের মাঝে কেমন আত্মমর্যাদাবোধ জাগাতে চেয়েছেন! সামান্য একটি বিষয়েও মানুষের কাছে সাহায্য না চাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন, সেখানে বড় বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে তো প্রশ্নই আসে না!

রাসুল ﷺ-এর এই শিক্ষা ধনী-গরিব, মনিব-ভৃত্য নির্বিশেষে সকল সাহাবি মনেপ্রাণে ধারণ করেছিলেন। তাই তো রাসুল ﷺ-এর ভৃত্য সাওবান ﷺ দ্বিধাহীনচিত্তে কারও নিকট সাহায্য না চেয়ে আত্মসম্মান ধরে রাখাকে গ্রহণ করেছিলেন, যখন রাসুল ﷺ সকল সাহাবিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন :

مَنْ يَكْفُلُ لِي أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا، وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟

'কে আমাকে এ নিশ্চয়তা দেবে যে, সে মানুষের কাছে কোনো কিছু চাইবে না, বিনিময়ে আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেবো?'

---

১৭২. সহিহ মুসলিম : ২৯৬৫, মুসনাদু আহমাদ : ১৪৪৪।

১৭৩. মুসনাদু আহমাদ : ২১৫০৯।

উত্তরে সাওবান ﷺ বলেছিলেন, 'আমি।'

এরপর থেকে সাওবান ﷺ সত্যিই কখনো কারও নিকট কোনো কিছু চাননি।'[১৭৪]

মানুষের কাছ থেকে কোনো কিছু না চাওয়ার ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর হাতে যেসব সাহাবি অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আওফ বিন মালিক ﷺ অন্যতম। তিনি তাঁর এক বর্ণনায় উক্ত অঙ্গীকারের ওপর সাহাবিদের অটলতার বিবরণ দিয়েছেন। বলেছেন, 'এরপর থেকে রাসুলের কোনো সাহাবির চাবুক পড়ে গেলে, সেটি তুলে দেওয়ার জন্য কাউকে বলতেন না।'

জনৈক কবি বলেন :

'তোমার ভালো কাজ দেখে যদি তোমাকে অনুদান না দেয়, তাহলে ছেড়ে দাও। এর থেকে বিরত থাকার মাঝেই নিহিত তোমার সম্পদ। কোনো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি এমন কোনো মানুষের নিকট অনুগ্রহ চাইতে পারে না, যার সামনে নিজের আত্মমর্যাদা বিলীন করতে হয়। নিজেকে লাঞ্ছিত করে যদি কোনো অনুদান চাইতে হয়, সে অনুদান না নেওয়াই উত্তম।'

এ সম্পর্কে ইবনুল জাওজি ﷺ আমাদেরকে দারুণ একটি উপদেশ উপহার দিয়েছেন তাঁর 'আল-মুদহিশ' নামক বইয়ে :

'তোমার মালিক ব্যতীত অন্য কারও নিকট কোনো কিছু চেয়ো না। কারণ, ভৃত্য মালিক ব্যতীত অন্য কারও কাছে চাওয়া মানে মালিকের বদনাম করা।'[১৭৫]

আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট সাহায্য চাওয়া মানে আল্লাহকে অপমান করা। কারণ, তা কেমন যেন আল্লাহর প্রতি পরোক্ষভাবে কার্পণ্যের অভিযোগ করার মতো। তা ছাড়া এটা তোমার অজান্তেই আল্লাহর ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো জঘন্য অপরাধ হয়ে যায়। এটা তোমার ইমানের ক্ষতি তো করেই, পাশাপাশি তোমার বিবেক ও বুদ্ধিমত্তাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। জান্নাত এমন বোকা লোকদের থেকে নিজের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করে প্রতিনিয়ত। আবু ইয়াজিদ আল-বিসতামি ﷺ কেমন যেন সেই ঘোষণা শুনতে পেয়েছেন।

---

১৭৪. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৪৩।
১৭৫. আল-মুদহিশ : পৃ. ২৬৭।

তাই তো তিনি একটি দারুণ উপমার মাধ্যমে বলেন :

'মাখলুকের কাছে মাখলুকের সাহায্য প্রার্থনা করা মানে এক ডুবন্তের কাছে আরেক ডুবন্তের সাহায্য চাওয়া।'[১৭৬]

সালিহ ও সৎকর্মশীল বান্দাদের চিন্তাচেতনা প্রায় এক রকম। এ জন্যই হয়তো আবু আব্দুল্লাহ কারশি ﷺ-ও একই কথা বলেছেন :

'মাখলুকের কাছে মাখলুকের সাহায্য প্রার্থনা করা মানে এক বন্দীর নিকট আরেক বন্দীর সাহায্য চাওয়া।'[১৭৭]

এ জন্যই ইমাম আহমাদ ﷺ প্রতি নামাজের শেষে বিশেষ একটি দুআ করতেন। দুআটি তাঁর অন্তরে ঐশ্বর্যের চারা রোপণ করেছিল। দুআটি আমরা নিয়মিত পড়লে আমাদের অন্তরেও ঐশ্বর্যের চারা রোপিত হওয়ার আশা করা যায়।

'হে আল্লাহ, আপনি আমার কপালকে যেভাবে আপনি ব্যতীত অন্য কারও জন্য মাটিতে ঠেকানো থেকে বিরত রেখেছেন, সেভাবে আপনি ব্যতীত অন্য কারও কাছে চাওয়া থেকেও বিরত রাখুন।'[১৭৮]

যদি সে সবর করে, সেটাই হবে তার জন্য অধিক কল্যাণকর!

যদি তুমি ধৈর্য না ধরো, তাহলে লাঞ্ছিত হবে। মানুষের কাছে চাওয়ার লাঞ্ছনা ও নীচতা কেমন, তা যদি তুমি জানতে চাও, তাহলে উরওয়া বিন আজিনার ঘটনাটি শোনো। উরওয়া মদিনার বিখ্যাত একজন কবি ছিলেন। ফকিহ ও মুহাদ্দিস হিসেবেও তাকে গণনা করা হতো। একদিন তার আর্থিক অবস্থা খুবই অসচ্ছল হয়ে পড়ল। তখন আশপাশের লোকেরা তাকে পরামর্শ দিল, 'হিশাম বিন আব্দুল মালিকের সাথে আপনার বন্ধুত্ব আছে। তাই আপনি তার কাছে যান এবং খিলাফতের পক্ষ থেকে কিছু অনুদান গ্রহণ করুন।' তাদের পরামর্শ অনুযায়ী ইবনে আজিনা রওনা হলেন বন্ধুর উদ্দেশে। উটের ওপর সওয়ার হয়ে

---

১৭৬. ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া : ১/৩৩০।
১৭৭. ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া : ১/৪৮৪।
১৭৮. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৪৮৪।

তিনি পৌঁছে গেলেন সুদূর শামে। তারপর হিশামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। হিশাম তার বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। উরওয়া জানালেন, তিনি অভাব-অনটনের মধ্যে আছেন। তখন তাকে উদ্দেশ্য করে হিশাম বললেন, 'একটি কবিতায় তুমিই তো বলেছিলে :

"আমি একজন জ্ঞানী মানুষ, অপচয়-অপব্যয় আমার স্বভাবের মধ্যে নেই। রিজিকের জন্য আমি অমানুষিক কষ্ট করি না। কারণ, যে রিজিক আমার জন্য বরাদ্দ, তা আমার নিকট পৌঁছাবেই। এখন তার জন্য যদি আমি চেষ্টা করি, তাহলে কষ্টের বিনিময়ে তা আমার কাছে আসবে। কিন্তু আমি যদি বসে থাকি, তাহলে কষ্ট ছাড়াই তা আমার কাছে এসে পৌঁছাবে।"

আমি তো তোমার কথা ও কাজে মিল দেখতে পাচ্ছি না। কেননা, তুমি রিজিকের তালাশে কষ্ট করে সুদূর মদিনা থেকে শামে চলে এসেছ!'

উরওয়া বললেন, 'তুমি আমাকে দারুণ এক উপদেশ দিয়েছ বন্ধু। তুমি আমাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ, যা থেকে আমি অনেক দিন যাবৎ বিস্মৃত ছিলাম।' এই বলে তিনি তাৎক্ষণিক বাহনের ওপর সওয়ার হয়ে হিজাজে চলে আসলেন। সেদিন রাতে বিছানায় গা এলিয়ে দেওয়ার পর হিশামের উরওয়ার কথা মনে পড়ল। তখন মনে মনে বললেন, 'কুরাইশের একজন ব্যক্তি হিকমতের সাথে তোমার কাছে কিছু চাইতে আসলো, আর তুমি তার অভাব সত্ত্বেও তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিয়েছ! তা ছাড়া সে একজন কবি, কখন কী বলে বসে, তার নিশ্চয়তা নেই!'

পরদিন সকালে হিশাম উরওয়ার ব্যাপারে খোঁজ নিলে তাকে বলা হলো, তিনি চলে গেছেন। হিশাম বললেন, 'অসুবিধা নেই, এখন সে জানবে যে, তার রিজিক তার কাছে অচিরেই আসবে।' অতঃপর তিনি গোলামকে ডাকলেন এবং তাকে দুই হাজার দিনার দিয়ে বললেন, 'এখনই ইবনে আজিনার সাথে দেখা করে এগুলো তাকে দিয়ে আসো।'

গোলাম বলেন, আমি তার নিকট পৌঁছানোর পূর্বেই তিনি বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আমি তার দরজার কড়া নাড়লাম। তিনি বের হলে হিশামের

দেওয়া দিনার তার হাতে তুলে দিলাম। সেগুলো হাতে নেওয়ার পর তিনি বললেন, 'আমিরুল মুমিনিনকে আমার কথাটি পৌঁছে দিয়ো :

"আমি রিজিকের জন্য কষ্ট করেছি, তাই আমাকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু যখন আমি বাড়িতে ফিরে আসলাম, তখন আমার রিজিক আমার কাছে এসে গেছে।"'[১৭৯]

সুবহানাল্লাহ! তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে রিজিক চাইতে গিয়ে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলেন। যদি তিনি ধৈর্য ধরতেন এবং যা আছে তার ওপর পরিতুষ্ট থাকতেন, তাহলে একসময় রিজিক তার বাড়িতে চলে আসত। যেমনটি তিনি নিজ কবিতার মধ্যেই বলেছিলেন। কিন্তু তিনি তার নিজের কথার ওপর অটল থাকতে পারেননি। যদি তিনি উবাইদ বিন আবরাস যা শিখেছেন তা শিখতেন, তাহলে সেটাই তার জন্য কল্যাণকর হতো। উবাইদ বিন আবরাসের সেই শিক্ষাটি হলো :

'যে মানুষের কাছে চায়, মানুষ তাকে বঞ্চিত করে। কিন্তু যে আল্লাহর কাছে চায়, তাকে খালি হাতে ফিরতে হয় না।'

ইবনে রজব ﷺ ঠিক এ কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন নিচের বাক্যে :

'যে মানুষের কাছ থেকে তাদের টাকা-পয়সা চায়, মানুষ তাকে অপছন্দ করে এবং তার প্রতি একপ্রকার ঘৃণা চলে আসে তাদের মনে। কারণ, টাকা-পয়সা বনি আদমের খুবই প্রিয় বস্তু। তাই কেউ তাদের প্রিয় বস্তু নিয়ে নিতে চাইলে খারাপ তো লাগবেই!'[১৮০]

---

১৭৯. সামারাতুল আওরাক : ১/৮ (ঈষৎ পরিবর্তিত)।
১৮০. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ২/২০৫।

ইবাদতের উদ্দেশ্য সৃষ্টির দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতিলাভ

আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য যেসব ইবাদত প্রবর্তন করেছেন, সবগুলোর পেছনে বিভিন্ন মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। তন্মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হলো, গাইরুল্লাহর দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বুঝতে সহজ হবে। রোজা সম্পর্কে মুনাবি ﷺ বলেন :

'রোজা প্রবর্তিত হয়েছে প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমানোর জন্য, পরাধীনতার উপকরণসমূহ এবং বস্তুর দাসত্ব থেকে মুক্তিদানের জন্য। কেননা, মানুষ মনের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বস্তুর দাসে পরিণত হয় এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে যায়। রোজা গাইরুল্লাহর সেই দাসত্বকে নিঃশেষ করে দেয় এবং আকাঙ্ক্ষিত বস্তুসমূহের দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা দান করে। স্বাধীনতা মানে সম্পদের দাস বনে যাওয়া থেকে রক্ষা পাওয়া। আল্লাহ বলেন :

قَالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

> "তিনি বললেন, তাহলে কি আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য কোনো উপাস্য অনুসন্ধান করব; অথচ তিনিই তোমাদের সারা বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।"[১৮১]

প্রবৃত্তি একধরনের উপাস্য। রোজা সেই উপাস্যের দাসত্ব থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি দেয়।'[১৮২]

---

১৮১. সূরা আল-আরাফ, ৭ : ১৪০।
১৮২. ফাইজুল কাদির : ৪/২১১।

তৃতীয় অর্থ : আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা

এটাই আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রকৃত ঐশ্বর্যের তৃতীয় অর্থ। যেমন কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

'তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর ধনী করেছেন।'[১৮৩]

ফাতহুল বারি গ্রন্থে ইবনে হাজার ﷺ এ আয়াতের তাফসিরে বলেন :

'আয়াতে ধনী করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে মনের ধনী করে দেওয়া। কারণ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ। এদিকে (মদিনায় গিয়েও) খাইবার ইত্যাদি বিজয়ের পূর্বে রাসুল ﷺ-এর আর্থিক অসচ্ছলতার কথা তো সবার জানা।'[১৮৪]

সুতরাং রাসুল ﷺ-এর ঐশ্বর্য প্রতিদিনের প্রয়োজন অনুপাতে খাবারের চেয়ে অতিরিক্ত সম্পদ থাকা নয়, তার ঐশ্বর্য মনের ঐশ্বর্য এবং আল্লাহর প্রতি নিরঙ্কুশ ভরসা ও নির্ভরতা। এই ঐশ্বর্য তিনি লাভ করেছেন সেই পূর্ণাঙ্গ নিয়ামতের অংশ হিসেবে, যার কথা কুরআনে এসেছে :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[১৮৫]

---

১৮৩. সুরা আদ-দুহা, ৯৩ : ৮।
১৮৪. ফাতহুল বারি : ১১/২৭৩।
১৮৫. সুরা আল-মায়িদা, ৫ : ৩।

পূর্ণাঙ্গ নিয়ামত মানে কী?

পূর্ণাঙ্গ নিয়ামত মানে হচ্ছে, নিয়ামত দানের পর নিয়ামতদাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না হওয়া; বরং তার সাথে সম্পর্ক অটুট থাকা।

এই ঐশ্বর্য ও ধনাঢ্যতা একমাত্র আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতার ফসল। ইবনুল কাইয়িম ﵀ তাঁর তরিকুল হিজরাতাইন গ্রন্থে তা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন :

'যে আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী, সে প্রকৃত ধনী। সে মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী, সে প্রকৃত ধনী নয়। যে আল্লাহর সামনে লাঞ্ছিত, সে মানুষের সামনে সম্মানিত। যে আল্লাহর সামনে দুর্বল, সে মানুষের মাঝে সবচেয়ে শক্তিশালী। যে আল্লাহর সামনে মূর্খ, সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। যে নিজের প্রবৃত্তিকে অসন্তুষ্ট করে, সে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে। এসব দ্বারা প্রমাণিত হয়, আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা এবং ধনাঢ্যতা—এ দুটি এক ও অভিন্ন।'[১৮৬]

ঐশ্বর্যের উপকরণ

নেককারদের একটি দল এক জায়গায় একত্রিত হলেন। দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য নিয়ে তাদের মাঝে আলোচনা হলো।

একজন বললেন, 'ঐশ্বর্য হলো : যার একটি থাকার মতো ঘর আছে, শরীর ঢাকার মতো কাপড় আছে এবং প্রয়োজন অনুপাতে জীবিকা আছে।'

আরেকজন বললেন, 'ধনী হলো ওই ব্যক্তি, যাকে নিজের প্রয়োজনে মানুষের কাছে যেতে হয় না।'

সুলাইমান আল-খাওয়াস নীরব ছিলেন। সবাই তাকে বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনি কিছু বলুন, হে আবু আইয়ুব!' তখন তিনি ক্রন্দন করলেন এবং বললেন,

'আমার মতে, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বা নিরঙ্কুশ নির্ভরতাই হচ্ছে ঐশ্বর্য। প্রকৃত ধনী হলো সেই ব্যক্তি, যার অন্তর আল্লাহর প্রতি নির্ভর এবং তাঁর দানের

---

১৮৬. তরিকুল হিজরাতাইন ওয়া বাবুস সাআদাতাইন : ১/৩৩।

ওপর সন্তুষ্ট থাকে; যদিও তার সকাল-সন্ধ্যা ক্ষুধার্ত অবস্থায় কাটুক।'
তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সবাই কেঁদে দিলেন।[১৮৭]

প্রকৃত ঐশ্বর্যের আরও কিছু রূপ

প্রকৃত ঐশ্বর্যের আরেকটি রূপ হচ্ছে, নিজের আমলসমূহ এবং ইবাদতে স্তর-উন্নতির মাঝে ঐশ্বর্য অনুভব করা এবং ইবাদতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত ও তাওফিকপ্রাপ্ত হওয়ার সুখ অনুভব করা। সুতরাং যখন তুমি রাসুল ﷺ-এর এ বাণীটি শুনবে :

وَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِهُدَاكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

'আল্লাহর কসম, তোমার পথ দেখানোর মাধ্যমে কোনো একজন ব্যক্তি হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া তোমার জন্য (মহামূল্যবান) লাল উটের চেয়ে উত্তম।'[১৮৮]

তখন তোমার সামনে ধনী হওয়ার আরেকটি দরজা খুলে যাবে। তা হচ্ছে, আল্লাহর পথের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এবং অন্ধকার ও পাপাচারের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা।

এরপর যখন পড়বে :

رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

'ফজরের দুই রাকআত (সুন্নাত) দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল বস্তুর চেয়ে উত্তম।'[১৮৯]

তখন তুমি জানবে, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কিছু বান্দা আছে, যাদের নিকট দিনের খাবার পর্যন্ত নেই, তবুও তারা ঐশ্বর্যের শীর্ষচূড়ায় বাস করে। সকালে উঠে ইবাদত করার মাধ্যমে।

---

১৮৭. আল-মুসতাজরিফ ফি কুল্লি ফান্নিন মুসতাতরিফ : ১/১৫১।
১৮৮. সহিহুল বুখারি : ২৯৪২, সহিহু মুসলিম : ২৪০৪, সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৬১।
১৮৯. সহিহু মুসলিম : ৭২৫।

যখন পড়বে :

غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

> 'আল্লাহর পথে (জিহাদের ময়দানে) এক সকাল বা এক সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম।'[১৯০]

অথবা পড়বে :

غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ رَوْحَةٌ، خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ

> 'আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের ময়দানে) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা অতিক্রান্ত করা সেই (বিশ্বজাহান) অপেক্ষা উত্তম, যার ওপর সূর্য উদিত হয় এবং অস্তমিত হয়।'[১৯১]

তখন তোমার মনে জিহাদের তামান্না জাগ্রত হবে এবং তুমি বুঝতে পারবে যে, পরিবার ও ধন-সম্পদ ব্যয় করে এই উন্নত ও সুউচ্চ সাওয়াব অর্জন না করলে নয়। কারণ, জিহাদের সাওয়াব এতটাই উন্নত ও সুউচ্চ যে, যদি তা দুনিয়াতে স্বরূপে প্রকাশ পায়, তাহলে তার বড়ত্ব ও মহানতায় ভীত ও অভিভূত হয়ে পুরো দুনিয়া বিলীন হয়ে যেত!

অথচ এই মহান সাওয়াবের জন্য সামান্যতম মূল্য পরিশোধ করতে হয় : জিহাদের ময়দানে দিনের শুরু থেকে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অথবা সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ার পর থেকে দিনের শেষভাগ পর্যন্ত।

এই যে অন্তরের ঐশ্বর্য, তা যে কেউ অনুভব করতে পারে না। কেবল ওই সব ব্যক্তিই তা অনুভব করতে পারেন, যাদের অন্তরসমূহে আল্লাহ তাআলা জীবন দান করেছেন। এই লোকগুলো যখন অন্যদের দেখতে পান যে, আল্লাহ তাআলা তাদের যে অনুগ্রহ দান করেছেন, তা থেকে এরা বঞ্চিত এবং ইমানি ও আত্মিক ক্ষুধার তাড়নায় জর্জরিত, তখন তারা নিজেদের ভান্ডার থেকে তাদের দান করেন। অর্থাৎ তাদেরকে প্রবৃত্তির অনুসরণ বাদ দিয়ে কল্যাণের পথে ফিরে আসার দাওয়াত দেন।

---

১৯০. সহিহুল বুখারি : ৬৫৬৮, সহিহ মুসলিম : ১৮৮০।
১৯১. সহিহ মুসলিম : ১৮৮৩।

দুনিয়া ও আখিরাতের পার্থক্য

আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তোমার সামনে তাঁর অসীম রহমতের নমুনা দৃশ্যমান করেছেন। তিনি তোমাকে দান করেছেন ফলমূল, গাছগাছালি, নদীনালা ও স্বাদ-উপভোগ। এ সবগুলোই যেন জান্নাতে বয়ে চলা সুরভিত বাতাসের একটি ঝলক। যার ঘ্রাণ তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় অফুরন্ত নিয়ামত ও সুমহান আনন্দের কথা। ফলে তুমি এ নিয়ামত লাভের জন্য আরও অধীর ও মরিয়া হয়ে ওঠো। অতঃপর নবিজি ﷺ কোনো মুগ্ধকর বস্তু দেখলে যা বলতেন, তুমিই তা-ই বলো :

لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ

> 'আমি আপনার সমীপে হাজির হে রব, নিশ্চয় আসল জীবন হচ্ছে আখিরাতের জীবন।'[১৯২]

তারপর তুমি সেই আখিরাতের জীবনকে সুন্দর ও শান্তিময় করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা, অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও ক্ষিপ্রতা নিয়ে এগিয়ে যাও।

দুনিয়ার নিয়ামত ও সুখ তোমাকে আখিরাতের নিয়ামত ও সুখের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দুনিয়ার অসম্পূর্ণ সুখ তোমাকে আখিরাতের পূর্ণাঙ্গ সুখের প্রতি উৎসাহিত করে।

তাই দুনিয়ার কোনো প্রিয় বস্তুর নাগাল না পেলেও দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে তুমি বলতে পারো, 'এই নিয়ামত আমার জন্য জান্নাতে অপেক্ষা করছে!' আর যখন তা তোমার নাগালে আসে, তখন তুমি বলো, 'দুনিয়ার নিয়ামতের চেয়ে আখিরাতের নিয়ামত আরও সুস্বাদু এবং উপভোগ্য!'

এই দুনিয়া একটি পারাপারের স্থান মাত্র। এখানে মুসাফির তার মূল গন্তব্যের জন্য কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে নেয়, এই যা! তাই মুমিন দুনিয়ার নিয়ামতকেই চূড়ান্ত মনে করে না। পেলে ভালো, না পেলে আরও ভালো টাইপ অবস্থা! দুনিয়ার প্রতিটি নিয়ামত তাকে আখিরাতের নিয়ামতের জন্য অধীর ও মরিয়া

১৯২. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ১৫৮০৬।

করে তোলে। দুনিয়ার অসম্পূর্ণ নিয়ামত তাকে আখিরাতে প্রভুর সান্নিধ্যে গিয়ে পরিপূর্ণ নিয়ামত লাভের প্রতি লোভাতুর করে।

এতক্ষণ আমরা যে মনের ধনীদের কথা বললাম, তাদের বিশেষ একজন হলেন অখ্যাত সাহাবি...

আমর বিন তাগলিব ﵁

তাঁর সম্পর্কে রাসুল ﷺ বলেছেন :

'আল্লাহর কসম, আমি কাউকে দান করি এবং কাউকে (দান করা থেকে) বাদ দিই। যাকে বাদ দিই, সে আমার নিকট ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম, যাকে দান করি। কিন্তু আমি কিছু লোককে কেবল এ জন্য দিই যে, আমি তাদের অন্তরে অস্থিরতা ও উদ্বেগ লক্ষ করি এবং অন্য কিছু লোককে আমি ওই ঐশ্বর্য ও কল্যাণের দিকে সোপর্দ করি, যা আল্লাহ তাদের অন্তরে নিহিত রেখেছেন। তাদের একজন হলো আমির বিন তাগলিব।'

রাসুল ﷺ-এর মুখ থেকে এ কথা শোনার পর আমর বিন তাগলিব ﵁ বললেন, 'রাসুল ﷺ-এর এই কথার বিনিময়ে আমি লাল উট গ্রহণ করাকেও পছন্দ করি না।'[১৯৩]

রাসুল ﷺ আমর বিন তাগলিব ﵁-কে পার্থিব কোনো সম্পদ না দিয়ে মনের ঐশ্বর্যের ওপর সঁপে দিলেন, যে সময় তিনি অন্যদের দান করেছেন দুনিয়ার ঐশ্বর্য। এ দুই ঐশ্বর্যের মাঝে কত বিশাল তফাত! আমর ঠিক ঠিক বুঝে নিয়েছেন আখিরাতের দান উত্তম ও চিরস্থায়ী এবং ইমানের উত্তরাধিকার দুনিয়ার সকল ধন-সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। আমরের ব্যাপারে রাসুল ﷺ-এর যে ধারণা ছিল, তা ঠিক প্রমাণিত হয়েছে। রাসুল ﷺ-এর কথা শেষ হতে না হতেই তিনি অকুণ্ঠচিত্তে জানিয়ে দিলেন, রাসুলের এই একটি কথাই তার সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট এবং এই কথা তার জন্য দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু অপেক্ষা উত্তম।

---

১৯৩. সহিহুল বুখারি : ৯২৩।
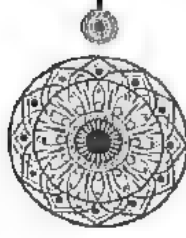
সম্পদের বরকত

ইমাম গাজালি ﷺ বলেন :

'অনেক সময় এক দিরহামের মধ্যে এমন বরকত থাকে যে, তা দিয়ে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এর বিপরীতে অনেক সময় হাজার দিরহাম থেকে আল্লাহ বরকত উঠিয়ে নেন এবং সেটা তার মালিকের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে সে ওই এক হাজার দিরহাম থেকে নিঃস্ব হয়ে যেতে চায় এবং নিঃস্বতাকেই হাজার দিরহামের চেয়ে কল্যাণকর মনে করে।'[১৯৪]

সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে, আসমা বিনতে আবু বকর ﷺ আর্থিক অবস্থা অসচ্ছল করে দেয় এমন সদাকা সম্পর্কে রাসুল ﷺ-এর নিকট জানতে চেয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, জুবাইর ﷺ ঘরে যা উপার্জন করে নিয়ে আসেন, তা ছাড়া অন্য কোনো মাল আমার নেই। এখন আমি কি তা থেকে সদাকা করতে পারব?' রাসুল ﷺ বললেন :

أَعْطِي، وَلَا تُوكِي، فَيُوكَى عَلَيْكِ

'দান করো। ধরে রেখো না, কেননা (তুমি তা ধরে রাখলে) তোমার রিজিক ধরে রাখা হবে (অর্থাৎ তোমার কাছে যা আছে তা যদি সদাকা না করে রেখে দাও, তাহলে তোমার থেকে রিজিক বন্ধ করে দেওয়া হবে)।'[১৯৫]

---

১৯৪. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ২/৭৬।
১৯৫. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৯৯।

আরেক বর্ণনায় এসেছে :

لَا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللهُ عَلَيْكِ

'গুণে গুণে দান করো না। তাহলে তোমাকেও গুণে গুণে দেওয়া হবে।'[১৯৬]

এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষণীয় উপদেশ, সুদূরবিস্তৃত ও সূক্ষ্মদর্শী নসিহত। এমন উপদেশ কেবল সে ব্যক্তিই দিতে পারেন, শয়তানের গোপন প্ররোচনা ও ফন্দি সম্পর্কে যার সম্যক ধারণা আছে। তাই তো তিনি আসমা ﷺ-কে বললেন, 'যা দান করছ, তা গুণে রেখো না। গুণে রাখলে তা শয়তানের পাতানো কোনো গোপন ফাঁদে ফেলে দেবে তোমাকে। সে ফাঁদ হচ্ছে, তুমি অনেক বড় অঙ্ক দান করে ফেলেছ, এভাবে দান করতে থাকলে একসময় তোমার সম্পদ কমে যাবে। ফলে তুমি আর দান করতে পারবে না বিধায় আল্লাহ তাআলা তোমাকে রিজিক দেওয়া বন্ধ করে দেবেন।'

তা ছাড়া বান্দা যা দান করে, আল্লাহই তার হিসাব রাখেন, বান্দার হিসাব করার কী প্রয়োজন? এ জন্য আসমা ﷺ প্রতিদিন থলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে থলির মধ্যে কিছু অবশিষ্ট রেখে, গণনা না করে সদাকা করার জন্য মাল বের করে নিতেন। আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, থলির মধ্যে যা অবশিষ্ট থাকত, তা দিয়েই তাঁদের দিন চলে যেত! মাঝেমধ্যে তাঁর মনে হতো, সদাকা করার জন্য গুণে গুণে বের করলে কেমন হয়, যাতে কী পরিমাণ অবশিষ্ট আছে তা জানা যায়, যেমনটি সাধারণত সকল মানুষ করে থাকে। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর উপদেশবাণী মনে আসার পর আর তেমন করতেন না। কারণ, রাসুল ﷺ বলেছেন, এভাবে গুণে গুণে দান করলে বরকত বিনষ্ট হয়ে যায়।

১৯৬. সহিহুল বুখারি : ১৪৩৩, সুনানুন নাসায়ি : ২৫৫০।

নবিজির দুআর বরকত

দান করলে যে সম্পদে বরকত হয়, তা মূলত নবিজি ﷺ-এর দুআর বরকতেই হয়। কারণ রাসুল ﷺ আল্লাহর রাস্তায় দানকারী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দুআ করেছেন। যারা সদাকা ও জাকাত প্রদান করতেন, তাদের জন্য তিনি বিশেষভাবে দুআ করতেন। 'বাইআতুর রিদওয়ান'-এ অংশগ্রহণ করা সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন আবু আওফা ﷺ বলেন, 'কোনো সম্প্রদায় যখন রাসুল ﷺ-এর নিকট সদাকার মাল নিয়ে আসত, তখন রাসুল ﷺ দুআ করতেন, (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ فُلَانٍ) "হে আল্লাহ, অমুকের পরিবারের ওপর রহম করুন।" একদিন আমার পিতা তাঁর নিকট সদাকা নিয়ে গেলেন। তখন রাসুল ﷺ দুআ করলেন, (اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ) "হে আল্লাহ, আবু আওফার পরিবারের ওপর রহম করুন।"'[১৯৭]

কী সৌভাগ্য তাঁদের! রাসুল ﷺ তাঁদের জন্য রহমতের দুআ করেছেন! আসলে ব্যাপারটি খুবই অদ্ভুত, মাত্র একজন ব্যক্তি (আবু আওফা) সদাকা করলেন; কিন্তু তার বিনিময়ে পুরো গোত্রের ওপর রহম করা হচ্ছে! নিঃসন্দেহে এটি আল্লাহর অতুলনীয় বদান্যতার একটি ঝলক এবং নবিজি ﷺ-এর সুমহান উদারতার একটি ছোট্ট প্রকাশ। তুমি একজন সদাকা করবে; কিন্তু তার উপকার ভোগ করবে তোমার চারপাশের সবাই। তার বরকতে সিক্ত হবে তোমার সন্তানসন্ততি, এমনকি তোমার অনাগত বংশধররাও! কী সৌভাগ্য তাদের, যারা সম্পদের মালিক হয়েছে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় সদাকা করেছে!

---

১৯৭. সহিহুল বুখারি : ১৪৯৭, সহিহু মুসলিম : ১০৭৮।

১৯ নং ফায়দা : যারা প্রকৃত দানবীর, তারা দান করার মাধ্যমে কেবল আল্লাহর সাথেই চুক্তি করে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট কোনো ধরনের প্রতিদান প্রত্যাশা করে না তারা। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। মাখলুককে দেখানোর নিয়ত তাদের থাকে না। এমনই একজন দানবীর হলেন তালহা বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ। তিনি তাঁর সময়ে কুরাইশের সর্বোচ্চ দানবীর ছিলেন। একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, 'তোমার ভাইয়েরা খুব স্বার্থপর...।' তিনি বললেন, 'থামো, এভাবে বলছ কেন?' স্ত্রী বললেন, 'আর নয় তো কী! যখন তোমার অবস্থা ভালো থাকে, তখন তারা তোমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক রাখে। কিন্তু যখনই তোমার আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়, তারা তোমাকে ছেড়ে চলে যায়।' তিনি বললেন, 'ওয়াল্লাহি, এটা তো আমার প্রতি তাদের অনুগ্রহ। তারা আমার কাছে সচ্ছলতার সময়ে আসে; যাতে আমি তাদের দান করতে পারি। কিন্তু অসচ্ছলতার সময় তারা আমার থেকে দূরে থাকে; যেন আমার তাদের দান করতে না হয়।' (আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দীন : ১/১৮১)

তেমনিভাবে রাসুল ﷺ বরকতের দুআ করেছিলেন সেই ব্যক্তির জন্য, যিনি প্রথমে একটি দুর্বল উটের বাচ্চা দান করার পর আরেকটি উন্নতমানের উষ্ট্রী দান করেছিলেন। তার জন্য রাসুল ﷺ এ বলে দুআ করেছেন, (اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبِلِهِ) 'হে আল্লাহ, তার মধ্যে এবং তার উটের মধ্যে বরকত দান করুন।'[১৯৮]

রাসুল ﷺ-এর সেই দুআর বরকত এখনো আল্লাহর রাস্তায় দানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে। যদিও তুমি ও নবিজি ﷺ-এর মাঝে শত শত বছরের ব্যবধান আছে, তবুও নবিজি ﷺ-এর দুআর প্রভাব তোমাকে অন্তর্ভুক্ত করে নেবে।

একদিকে রাসুল ﷺ-এর বরকতের দুআ, অপরদিকে শয়তানের প্ররোচনা—দান করলে গরিব হয়ে যাবে। আমরা কার কথা গ্রহণ করব? নিকৃষ্ট শয়তানের, না সর্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট মহামানব রাসুল ﷺ-এর? তদুপরি দান-খয়রাত করলে আল্লাহ তাআলা মাগফিরাত ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা দিয়েছেন। কোনো বান্দা আল্লাহর এ ওয়াদা থেকে কীভাবে পেছনে থাকতে পারে!?

وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا

> 'পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।'[১৯৯]

---

১৯৮. সুনানুন নাসায়ি : ২৪৫৮।
২০ নং ফায়দা : তোমার সর্বোৎকৃষ্ট বস্তুটি আল্লাহর রাস্তায় দান করো। সব সময় নিকৃষ্ট ও ব্যবহারের অযোগ্য বস্তুটি দান করো না। ওয়াইল বিন হুজর ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ একজন জাকাত উসুলকারী পাঠালেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট গেলে লোকটি তাকে সদ্য দুধ ছাড়ানো হয়েছে এমন একটি দুর্বল শিশু উট দিলেন। (এ ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর) রাসুল ﷺ বললেন, 'আমি আল্লাহ ও রাসুলের পক্ষ থেকে জাকাত উসুলকারী পাঠালাম; অথচ অমুক ব্যক্তি তাকে একটি উটের দুর্বল বাচ্চা দিল। হে আল্লাহ, আপনি তার মধ্যে এবং তার উটের মধ্যে বরকত দেবেন না।' এ সংবাদ লোকটির নিকট পৌছালে তিনি একটি উত্তম উষ্ট্রী নিয়ে আসলেন এবং বললেন, 'আমি আল্লাহ এবং তাঁর নবি ﷺ-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।' তখন নবিজি ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহ, তার মধ্যে এবং তার উটের মধ্যে বরকত দান করুন।'
১৯৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৬৮।

যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, তারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর মাগফিরাত ও অনুগ্রহকেই বেছে নেয়। বস্তুত আল্লাহর ওয়াদা ও শয়তানের ওয়াদার মধ্যে তো কোনো তুলনাই চলে না। এখন আমরা জেনে নেব, আয়াতে মাগফিরাত ও অনুগ্রহ বলে কী বোঝানো হয়েছে :

ইবনে আতিয়া ﷺ বলেন :

'মাগফিরাত' মানে হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলা বান্দার দোষত্রুটি গোপন রাখবেন। আর 'অনুগ্রহ' মানে হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে রিজিকের প্রশস্ততা দান করবেন এবং আখিরাতে অফুরন্ত নিয়ামত দান করবেন।[২০০]

চিরস্থায়ী ওয়াদা

যারা আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করে, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে একটি স্থায়ী ওয়াদা দিয়েছেন। একইসাথে এ ওয়াদা কৃপণদের জন্য তিরস্কার ও উপদেশও বটে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

'তোমরা (আল্লাহর রাস্তায়) যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দান করবেন। তিনিই উত্তম রিজিকদাতা।'[২০১]

এ আয়াতের তাফসিরে ইবনে আশুর বলেন :

'ওয়াদামূলক আয়াতটিতে তিন তিনটি দৃঢ়তাবোধক বাক্য-বিন্যাস-রীতি ব্যবহার করে ওয়াদাটিকে সুদৃঢ় করা হয়েছে। প্রথমত, পুরো বাক্যটি শর্তবাচক; দ্বিতীয়ত, শর্তের জবাবমূলক বাক্যটি নামবাচক; তৃতীয়ত, বাক্যটিতে উদ্দেশ্যের পূর্বে বিধেয় আনা হয়েছে। বাক্যের এমন বিন্যাস ওয়াদার দৃঢ়তা এবং তা বাস্তবায়িত হওয়ার আবশ্যিকতাকে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে।'[২০২]

---

২০০. আল-জাওয়াহিরুল হিসান ফি তাফসিরিল কুরআন : ১/৫২৫।
২০১. সুরা সাবা, ৩৪ : ৩৯।
২০২. আত-তাহরির ওয়াত তানবির : ১২/২৬০।

কুরআনের বক্তব্যকে সমর্থন করে হাদিসে কুদসিতেও সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াদাটি এসেছে :

يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ

'হে আদম-সন্তান, তুমি ব্যয় করো, তাহলে আমিও তোমার জন্য ব্যয় করব।'[২০৩]

এখানে আল্লাহর জন্য ব্যয় শব্দটি বান্দার ব্যয়ের সাথে শব্দগত সাদৃশ্যের জন্য আনা হয়েছে। নাহলে এ শব্দটি আল্লাহর সাথে মানানসই নয়। কারণ, ব্যয়ের আসল অর্থ ফুরিয়ে যাওয়া। আর আল্লাহ তাআলা যতই দান করুন, তাঁর ভান্ডার থেকে সামান্যতমও কমে না।

শুধু এতটুকুই নয়, নবিজি ﷺ তোমার জন্য আরও সুসংবাদ নিয়ে এসেছেন। ইরশাদ করেছেন :

مَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ لِصَدَقَةٍ أَوْ صِلَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا كَثْرَةً

'কোনো ব্যক্তি যদি সদাকা অথবা আত্মীয়তা-সম্পর্ক সংরক্ষণের মাধ্যমে দানের দরজা উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তাআলা তার সম্পদে প্রবৃদ্ধি দান করেন।'[২০৪]

দান করলে আল্লাহ তাআলা সম্পদ বাড়িয়ে দেন। কারণ যারা আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তাদের জন্য ফেরেশতারা দুআ করেন। আর ফেরেশতাদের মধ্যে দুআ কবুল হওয়ার সকল শর্ত বিদ্যমান আছে বিধায় আল্লাহ তাআলা তাদের দুআ ফিরিয়ে দেন না। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ العِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

---

২০৩. সহিহুল বুখারি : ৪৬৮৪, সহিহু মুসলিম : ৯৯৩।
২০৪. শুআবুল ইমান : ৩১৪০, সহিহুল জামি : ৫৬৪৬।

'প্রতিদিন বান্দারা এমন অবস্থায় সকালে উপনীত হয় যে, ওই সময় দুজন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাদের একজন বলেন, "হে আল্লাহ, দানশীলকে তার দানের বিনিময় দিন।" আর অপরজন বলেন, "হে আল্লাহ, কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।"'[২০৫]

তেমনিভাবে জান্নাতের দুই দরজায় দুজন ফেরেশতা বসে একজনের পরে একজন আল্লাহর পথে ব্যয়কারীদের জন্য দুআ করতে থাকেন। যেন এভাবে তারা বান্দাদের আল্লাহর রাস্তায় দান করা এবং কল্যাণমূলক কাজে সম্পদ ব্যয় করার প্রতি উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন। এ সংবাদ আমরা পেয়েছি নবিজির জবান থেকে, যা খুব সুন্দর ভাষায় আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন বিশিষ্ট সাহাবি আবু হুরাইরা ﵁। হাদিসের ভাষ্য নিম্নরূপ :

إِنَّ مَلَكًا بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ» يَقُولُ: «مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ غَدًا، وَمَلَكٌ بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَأَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

'একজন ফেরেশতা জান্নাতের একটি দরজায় বসে বলেন, "যে ব্যক্তি আজকে (কোনো ব্যক্তিকে) কর্জ দেবে, আগামীকাল সে তার বিনিময় পাবে। "আরেকজন ফেরেশতা অন্য দরজায় বসে বলেন, "হে আল্লাহ, দানশীলকে তার দানের বিনিময় দিন এবং কৃপণকে ধ্বংস করে দিন।"'[২০৬]

এখানে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন আসে, সেটা হচ্ছে : প্রত্যেক দাতাই কি এ দুআর উপযুক্ত? এ ক্ষেত্রে ফরজ দান (জাকাত) এবং নফল দানের (সদাকা ও করজে হাসানা) মধ্যে কি কোনো পার্থক্য নেই?

ইমাম কুরতুবি ﵀ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন :

'দান করা বলতে যদিও ফরজ ও নফল উভয় প্রকার দানকে বোঝায়; কিন্তু যারা নফল দান থেকে বিরত থাকে, তারা এ দুআর উপযুক্ত নয়।'[২০৭]

---

২০৫. সহিহুল বুখারি : ১৪৪২, সহিহু মুসলিম : ১০১০।
২০৬. সহিহু ইবনি হিব্বান : ৩৩৩৩।
২০৭. দালিলুল ফালিহিন : ৩/১২১।

ইমাম নববি ﷺ-ও অভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। বলেছেন :

'প্রশংসিত দান সেটাই, যেটা পরিবারের ভরণপোষণ, মেহমানদারি এবং অন্যান্য নফল খাতে ব্যয়িত হয়।'[২০৮]

এতক্ষণ যা বলা হলো, তা কক্ষনো এ কথা বোঝায় না যে, যেকোনো উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করে রাখা নিন্দনীয়। কারণ, ভালো উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করে রাখার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। এটাকে সম্পদের প্রতি মোহ বা লোভ বলা যাবে না। সালাফদের অনেকেই ভালো উদ্দেশ্যে সম্পদ জমা করেছেন। তাদের অন্যতম হলেন আবু আহমাদ নিশাপুরি ﷺ। তিনি মুনাজাতে আল্লাহকে বলেন :

'হে আল্লাহ, আপনি অবশ্যই জানেন, আমি যা সঞ্চয় করছি, তা কেন করছি। এই সম্পদ আমি মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী থাকার জন্য এবং দারিদ্র্যকে লুকিয়ে বেড়ানো আলিমদের সাহায্য করার জন্য সঞ্চয় করছি।'[২০৯]

আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে করজ বলা হয়েছে কেন?

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

'এমন কে আছে, যে আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন।'[২১০]

ইবনুল জাওজি ﷺ এ আয়াত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। অতঃপর তাঁর তাফসিরগ্রন্থ জাদুল মাসিরে আমাদের জন্য চমৎকার ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। লিখেছেন :

---

২০৮. দালিলুল ফালিহিন : ৩/১২১।
২০৯. তারিখু বাগদাদ : ৮/৭৪।
২১০. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৪৫।

যদি প্রশ্ন করা হয়, সদাকাকে করজ বলা হয়েছে কেন? এর তিনটি উত্তর দেওয়া যায় :

১. যেভাবে করজ পরিশোধ করে দেওয়া হয়, তেমনিভাবে সদাকার বিনিময় দিয়ে দেওয়া হবে।

২. সদাকার বিনিময় কিয়ামত পর্যন্ত বিলম্বিত হয়, যে রকম করজের বিনিময় নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিলম্বিত হয়।

৩. সদাকার সাওয়াবের আবশ্যিকতা বোঝানোর জন্য। অর্থাৎ যে রকম বিনিময় ছাড়া করজ হয় না, তেমনই সদাকারও অবশ্যই বিনিময় রয়েছে এ কথা বোঝানোর জন্য।

ইবনুল কাইয়িম ﵀ আরও গভীরে গিয়ে এর রহস্য উদঘাটন করেছেন। বলেছেন :

ব্যয়কারী ব্যক্তি যদি জানতে পারে, সে যা ব্যয় করছে, তা একদিন অবশ্যই তার নিকট ফিরে আসবে, তখন ব্যয় করা তার জন্য সহজ হয়। যে ঋণ দেয় সে যদি জানে, ঋণগ্রহীতা অনেক বড় মনের মানুষ; যদি জানতে পারে, ঋণগ্রহীতা তার থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করবে এবং সে ব্যবসার লভ্যাংশ তাকে দিয়ে দেবে; যদি জানতে পারে, ঋণগ্রহীতা তার ঋণ ফিরিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি আরও অনেক কিছু তাকে দেবে, সে কোনোভাবেই ঋণ দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে না। অবশ্য কেউ চূড়ান্ত পর্যায়ের কৃপণ হলে কিংবা ঋণগ্রহীতার (আল্লাহর) প্রতি বিশ্বাস না থাকলে তার কথা ভিন্ন।[২১১]

এ জন্যই জনৈক উদারমনস্ক দানবীরকে যখন কেউ বলল, 'তুমি তো সম্পদ নষ্ট করছ,' উত্তরে তিনি বললেন, 'বদান্যতা থেকে বিরত থাকা মাবুদের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করার নামান্তর।'

আয়িশা ﵂-এর হতবাক করে দেওয়া গল্পটি শোনো :

এক মিসকিন তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইল। সেদিন তিনি রোজা রেখেছিলেন এবং বাড়িতে মাত্র একটি রুটি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবুও তিনি তাঁর দাসীকে

২১১. তরিকুল হিজরাতাইন : পৃ. ৫৩৮-৫৩৯।

বললেন, 'রুটিটি তাকে দিয়ে দাও।' দাসী বললেন, 'তাহলে তো আপনি ইফতার করার জন্য কিছুই পাবেন না!' আয়িশা ﷺ বললেন, 'তাকে দিয়ে দাও।' দাসী বলেন, 'অতঃপর আমি রুটিটি ভিক্ষুককে দিয়ে দিলাম। সন্ধ্যায় কোনো এক বাড়ির লোক অথবা একজন ব্যক্তি—যে সাধারণত আমাদের কাছে হাদিয়া পাঠাত না—আমাদের জন্য রুটির কাফনমোড়ানো[২১২] একটি ভুনা ছাগল হাদিয়া পাঠাল। আয়িশা ﷺ আমাকে ডেকে বললেন, "এখান থেকে খাও। এটা তোমার সেই রুটি থেকে উত্তম।"'[২১৩]

তবে দানের এমন তাৎক্ষণিক পুরস্কার পাওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, দান করতে হবে পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস নিয়ে। যাচাই করার জন্য কিংবা সংশয় নিয়ে দান করলে সে দানের পুরস্কার পাওয়া যাবে না। হাইওয়া বিন শুরাইহ ﷺ পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস নিয়ে দান করতেন। প্রতিবছর তিনি ষাট দিনার দান করতেন। সেগুলোর সম্পূর্ণটুকু সদাকা করার পরই তিনি বাড়িতে আসতেন। বাড়িতে ফিরে এসে উক্ত ষাট দিনার বিছানার নিচে পেয়ে যেতেন! তার এক চাচাতো ভাই এ খবর পেয়ে নিজের সমুদয় সম্পত্তি সদাকা করে দিলেন। অতঃপর বাড়িতে ফিরে এসে দেখলেন, বিছানার নিচে কিছুই নেই! বেচারা দুকূল হারিয়ে অভিযোগ নিয়ে গেলেন হাইওয়ার নিকট। হাইওয়া বললেন, 'আমি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস নিয়ে আমার রবের জন্য দান করি। তুমি তো দান করেছ পরীক্ষা করার জন্য।'[২১৪]

---

২১২. ২১ নং ফায়দা : আয়িশা ﷺ-এর দানের বরকত ও প্রভাব সম্পর্কে মুনকাদির বিন আব্দুল্লাহ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন : একদিন তিনি আয়িশা ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, 'উম্মুল মুমিনিন, আমার খুব ক্ষুধা লেগেছে।' তিনি বললেন, 'আমার কাছে তো তোমাকে দেওয়ার মতো কিছু নেই। যদি আমার কাছে দশ হাজার দিরহামও থাকত, আমি সবগুলো তোমাকে দিয়ে দিতাম।' অতঃপর তিনি যখন আয়িশা ﷺ-এর নিকট থেকে বের হলেন, তখনই তাঁর নিকট খালিদ বিন উসাইদের পক্ষ থেকে দশ হাজার দিরহাম হাদিয়া আসলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তা মুনকাদিরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর মুনকাদির সেখান থেকে এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি দাসী ক্রয় করলেন। সে দাসী থেকে তার তিনটি সন্তান হলো। পরবর্তী সময়ে মুনকাদিরের সেই তিন সন্তান হয়ে উঠলেন মদিনার শ্রেষ্ঠ ইবাদতগুজার। (সিরাজুল মুলুক : পৃ. ৩৭৭)

২১৩. মুয়াত্তা মালিক : ১৮১৯।

২১৪. আস-সিয়ার : ৬/৪০৪
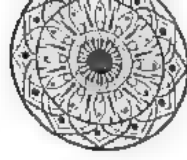
তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন[২১৫]

উত্তম ও সুন্দর ইবাদত পেশ করো। তা তোমাদের আখিরাতের সঞ্চয় হবে এবং সকল ধরনের বিপদ থেকে তোমাদের আড়াল করে রাখবে। কোনোমতে শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য ইবাদত করলে সে ইবাদত তেমন কাজে আসবে না।

মাখরাজ মানে বের হওয়ার পথ। বিপদ ও সংকট থেকে বের হওয়ার পথ। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য বিপদ থেকে বের হওয়ার পথ করে দেন। যেমন তিনি গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তিকে বের হওয়ার পথ করে দিয়েছিলেন। গল্পটি সবার জানা :

তিন ব্যক্তি একটি গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে একটি বিশাল আকৃতির পাথর এসে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তারা নিজ নিজ পুণ্যকর্মের অসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। একজন মাতাপিতার সাথে সদাচরণের অসিলা দিয়ে দুআ করলেন। আরেকজন অসিলা হিসেবে ব্যবহার করলেন নিজের আমানতদারিকে। অপরজন অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে দুআ করলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের বিপদ দূর করে দিলেন। তাদের নেক আমলসমূহের বিনিময়ে গুহার

---

২১৫. ২২ নং ফায়দা : আয়াতে মাখরাজ বা উত্তরণের পথ থেকে কী উদ্দেশ্য, সে ব্যাপারে আটটি মত আছে। এক. দুনিয়ার সন্দেহ-সংশয়, মৃত্যুকালীন কষ্ট এবং কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে উত্তরণের পথ। এটি কাতাদা ﷺ-এর অভিমত। দুই. অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সব ধরনের দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করবেন। এ মতটি ইবনে আব্বাস ﷺ-এর। তিন. মানুষকে কষ্ট দেয় এমন প্রতিটি বিষয় থেকে উত্তরণের পথ। ইবনে খাইসাম এ মতের প্রবক্তা। চার. আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকার উপায়। এটি হাসান ﷺ-এর মত। পাঁচ. শাস্তি থেকে বাঁচার উপায়। হুসাইন বিন ফাজল এ মন্তব্য করেছেন। ছয়. তাকে অল্পতুষ্টি দান করবেন। এটি আলি বিন সালিহ-এর অভিমত। সাত. জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাত লাভের উপায়। এটা কালবি বলেছেন। আট. বাতিল থেকে হকের পথে আসা এবং সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে ফিরে আসার উপায়। এটি ইবনে জুরাইজের অভিমত। (আদ-দুররুল মানসুর : ৬/৩১)

মুখ থেকে পাথর সরিয়ে তাদের বের হওয়ার পথ করে দিলেন। উক্ত ঘটনার মাধ্যমে এই তিনজন লোক আমাদের একটি বার্তা দিয়ে গেছেন :

'উত্তম ও সুন্দর ইবাদত পেশ করো। তা তোমাদের আখিরাতের সঞ্চয় হবে এবং সকল ধরনের বিপদ থেকে তোমাদের আড়াল করে রাখবে।'[২১৬]

অনুরূপভাবে তিনি উত্তরণের পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন আওফ বিন মালিক আশজায়ি ﷺ-কে। যখন মুশরিকরা তাঁর ছেলেকে বন্দী করে নিয়ে গেল, তখন তিনি রাসুল ﷺ-এর কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে অধিকহারে (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ) পাঠ করতে বললেন। তাঁর স্ত্রী বললেন, 'রাসুল ﷺ তোমাকে অত্যন্ত সুন্দর উপদেশ দিয়েছেন।' দুজনেই রাসুল ﷺ-এর উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। ফলে মুশরিকরা তাদের ছেলের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়ল। এ সুযোগে তাদের ছেলে পালিয়ে চলে আসলো এবং সাথে মুশরিকদের চারশ বকরিও নিয়ে আসলো।[২১৭] এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো :

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

---

২১৬. ২৩ নং ফায়দা : আল্লাহ তাআলা সব সময় আমাদের সাথে অনুগ্রহমূলক আচরণ করেন, যা ন্যায়মূলক আচরণের চেয়ে উর্ধ্বে। তিনি আমাদের সাথে তাঁর শান উপযোগী আচরণ করেন, আমাদের শান উপযোগী নয়। এ জন্যই জনৈক আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির নিকট যখন এ আয়াত তিলাওয়াত করা হলো :

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا - وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।' (সুরা আত-তালাক, ৬৫ : ৩-২)
তখন তিনি বললেন ,'ওয়াল্লাহি, তিনি আমাদের জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দিয়েছেন; অথচ আমরা যথাযথরূপে তাকওয়া অবলম্বন করতে পারিনি। আমরা তিনি যেভাবে চান, সেভাবে তাঁকে ভয় করতে পারি না; তবুও তিনি আমাদের রিজিক দান করেন। তাই আমরা যথাযথরূপে তাকওয়া অবলম্বন করতে না পারলেও, অন্তত আমাদের সাধ্য অনুযায়ী তাকওয়া অবলম্বন করে তৃতীয় আরেকটি অনুগ্রহ তাঁর থেকে আশা করতে পারি। সেটা হচ্ছে :

وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا

'আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার গুনাহসমূহ মোচন করে দেন এবং তাকে মহা প্রতিদান দান করেন।' (সুরা আত-তালাক, ৬৫ : ৫) -হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২৪৮/৪।
২১৭. জাদুল মাসির : ৪/২৭৮।

‘যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।’[২১৮]

অনুরূপভাবে তিনি উত্তরণের পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন যুগশ্রেষ্ঠ সাধকপুরুষ বিশিষ্ট তাবিয়ি আবু মুসলিম খাওলানি ﵀-এর জন্য। ঘটনাটি হলো : একদিন তাঁর স্ত্রী এসে তাঁকে বললেন, ‘ঘরে আটা নেই।’ তিনি বললেন, ‘তোমার নিকট (আটা ক্রয় করে আনার মতো) কিছু আছে?’ স্ত্রী বললেন, ‘একটি দিরহাম আছে, যা আমি সুতা বিক্রি করে পেয়েছি।’ তিনি বললেন, ‘তা আমাকে দাও এবং থলেটি নিয়ে আসো।’ অতঃপর তিনি বাজারে গেলেন। সেখানে এক ভিক্ষুক নাচোড়বান্দার মতো তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে দিরহামটি দিয়ে দিলেন। এখন পড়ে গেলেন বিপাকে। আটা নিয়ে যেতে না পারলে তো স্ত্রীর ঝাড়ি খেতে হবে! তাই তিনি থলের ভেতর বালি ও কাঠের গুঁড়া ভরে বাড়িতে ফিরে গেলেন এবং স্ত্রীর হাতে থলেটি তুলে দিয়ে আস্তে করে সরে পড়লেন। স্ত্রী থলের মুখ খুলে দেখলেন, ভেতরে আটা! তিনি যথারীতি আটা মেখে রুটি বানালেন। আবু মুসলিম খাওলানি রাতে বাড়িতে এসে রুটি দেখতে পেয়ে আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, ‘রুটি কোথায় পেয়েছ?’ স্ত্রী বললেন, ‘কেন, আপনিই তো আটা এনে দিলেন!’ স্ত্রীর কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন।[২১৯]

একইভাবে তিনি সংকট থেকে মুক্তির পথ তৈরি করে দিয়েছিলেন শাইখ বুনান আল-হাম্মাল-এর জন্য। এক ব্যক্তি শাইখুল ইসলাম আবুল হাসান বুনান আল-হাম্মাল-এর নিকট আসলো। লোকটির একজন থেকে একশ দিনার পাওনা ছিল। ঋণগ্রহীতার কাছে ঋণ চাইতে গেলে সে ঋণের চুক্তিপত্র চেয়ে বসল। লোকটি চুক্তিপত্র খুঁজতে গিয়ে দেখল, সেটি হারিয়ে গেছে! উপায়ান্তর না দেখে সে বুনান আল-হাম্মাল-এর নিকট দুআ চাওয়ার জন্য আসলো। বুনান তাকে বললেন, ‘আমি বুড়ো মানুষ, হালুয়া খেতে একটু বেশিই ভালোবাসি। তাই অমুকের দোকান থেকে আমার জন্য এক বোতল হালুয়া নিয়ে আসো। তবেই আমি তোমার জন্য দুআ করব।’ লোকটি তা-ই করল। হালুয়া নিয়ে আসার

২১৮. সুরা আত-তালাক, ৬৫ : ২-৩।
২১৯. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৩৭১।

পর বুনান লোকটিকে বললেন, 'হালুয়ার ওপর পেঁচিয়ে দেওয়া কাগজটি খুলে ফেলো।' লোকটি কাগজ খুলে দেখল, সেটি তারই ঋণের চুক্তিপত্র!' এরপর বুনান বললেন, 'এটা নাও এবং (এর মাধ্যমে পাওনা বুঝে নিয়ে) তোমার সন্তানদের হালুয়া খাওয়াও।'[২২০]

স্রষ্টার অবাধ্যতা করে সৃষ্টির আনুগত্য নেই

তবে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্যই বিপদ থেকে উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সকল কিছুর ওপর প্রাধান্য দেয় এবং স্রষ্টার আনুগত্যকে সৃষ্টির আনুগত্যের ওপর অগ্রাধিকার দেয়। তবেই আল্লাহ তাআলা মানুষের শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করেন—চাই সে মানুষ যতই শক্তিশালী হোক। অবশ্য এর আগে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

এ ব্যাপারে বিশিষ্ট সাহাবি হাকাম বিন আমর গিফারি ﵁-এর উপদেশটি শুনতে পারো :

তিনি খোরাসানের গভর্নর ছিলেন। একদিন জিয়াদ তাঁর নিকট পত্র মারফত সংবাদ পাঠালেন : আমিরুল মুমিনিন স্বর্ণ ও রৌপ্যকে বাছাই করে তার জন্য পাঠিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই স্বর্ণ ও রৌপ্য জনগণের মধ্যে বণ্টন করা যাবে না।

এর উত্তরে তিনি জিয়াদের উদ্দেশে লিখলেন : আপনার বার্তা আমি পেয়েছি। তবে আমিরুল মুমিনিনের বার্তার আগেই আল্লাহর বার্তা (প্রজাদের সাথে ইনসাফ করার বার্তা) এসেছে আমার নিকট। (তাই আমি আল্লাহর নির্দেশই পালন করব। এর জন্য আমার ওপর যতই বিপদ আসুক, আমি পরোয়া করি না। কেননা) আল্লাহর কসম, যদি আসমান ও জমিন একত্রিত হয়ে কোনো বান্দার পথ বন্ধ করে দেয়, সে বান্দা যদি তাকওয়াবান হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার বের হওয়ার পথ করে দেবেন। ওয়াস-সালামু আলাইক।

---

২২০. আল-মুনতাজাম ফি তারিখিল উমামি ওয়াল মুলুক : ১৩/২৭৪।

এরপর তিনি জনগণের উদ্দেশে বললেন, 'সকালে সবাই মাল সংগ্রহ করতে এসো।' অতঃপর তিনি জনগণের মাঝে মাল বণ্টন করে দিলেন।[২২১]

এ জন্যই আয়িশা ﵂ মুআবিয়া ﵁-কে চিঠির মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, সর্বদা আল্লাহকে ভয় করতে হবে, এর কারণে মানুষ অসন্তুষ্ট হলেও। চিঠির ভাষা নিম্নরূপ :

'আমি আপনাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, যদি আপনি আল্লাহকে ভয় করেন, তাহলে মানুষের (রাগ ও অনিষ্ট) থেকে আল্লাহই আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন। কিন্তু যদি আপনি মানুষকে ভয় করেন, তাহলে তাদের কেউই আল্লাহর (ক্রোধ ও শাস্তি) থেকে আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না।'[২২২]

রুটির হাতিয়ার

কোনো ব্যক্তি যদি ধারাবাহিকভাবে ভালো কাজ করতে থাকে, সে ভালো কাজ তাকে বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখার জন্য অস্ত্রের মতো কাজ করে। আমাদের কাছে অপরিচিত অথচ আল্লাহর কাছে পরিচিত এক লেখকের সাথে বাস্তবেই এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাটি হলো : একদিন উজির আলি বিন মুহাম্মাদ বিন ফুরাত জনৈক লেখককে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, 'আচ্ছা, আপনি একটা কথা বলুন তো! আপনার ব্যাপারে আমার খারাপ ধারণা আছে। তাই সব সময় আমি আপনাকে গ্রেফতার করার চিন্তা করতাম। কিন্তু একদিন স্বপ্নে দেখলাম, আপনি আমাকে একটি রুটি দিয়ে প্রতিহত করছেন। স্বপ্নটি কয়েক রাত দেখেছি আমি। স্বপ্নে বারবার আমি আপনাকে গ্রেফতার করতে চেয়েছি; কিন্তু বারবার আপনি আমাকে প্রতিহত করেছেন। অতঃপর আমি সৈন্যদলকে আপনার সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলাম। তাদের নিক্ষিপ্ত প্রতিটি তির আপনি মাত্র একটি রুটি দিয়ে প্রতিহত করেছেন! একটি তিরও আপনাকে বিদ্ধ করতে পারেনি। এখন আমাকে বলুন, রুটির রহস্য কী?

---

২২১. আদ-দুররুল মানসুর : ৮/১৯৯-২০০।
২২২. আদ-দুররুল মানসুর : ৮/২০০।

লেখক বললেন, 'উজির মহোদয়, আমার ছোটবেলা থেকে আমার মাতা প্রতি রাতে আমার বালিশের নিচে একটি রুটি রাখতেন। পরদিন সকালে আমার পক্ষ থেকে রুটিটি সদাকা করে দিতেন। মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি রাতে তিনি এ কাজটি করতেন। তার মৃত্যুর পরে কাজটি আমি অব্যাহত রাখি। আমিও তার মতো প্রতি রাতে বালিশের নিচে একটি রুটি রাখি এবং সকালে উঠে তা সদাকা করে দিই।'

ঘটনা শুনে উজির খুব আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর কসম, আজকের পর থেকে কোনোদিন আমার তরফ থেকে আপনার কোনো ক্ষতি হবে না।'[২২৩]

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ কেমন যেন আমাদের উল্লিখিত সকল ঘটনা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন! অতঃপর চূড়ান্ত পর্যায়ের দৃঢ়তা সহকারে বললেন :

'যে ভালো কাজ করে, যে বিপদে পড়ে না, পড়লেও তা থেকে উত্তরণের উপায় পেয়ে যায়।'[২২৪]

একই কারণে আলি বিন আবু তালিব ﷺ ভালো কাজের প্রতি ভালোভাবে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কসম করে বলেছেন :

'সেই সত্তার শপথ—যাঁর শ্রবণশক্তি সকল শব্দ শুনতে পায়, কোনো ব্যক্তি যদি কারও অন্তরে খুশির সঞ্চার করে, আল্লাহ তাআলা সে খুশির বিনিময়ে একটি দয়া সৃষ্টি করেন। অতঃপর কোনো সময় যদি তার ওপর বিপদ আসে, তখন সে দয়া তার দিকে স্রোতের পানির মতো এগিয়ে আসে এবং তার বিপদকে উটের খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।'[২২৫]

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় কাজ হলো সৃষ্টির উপকার করা এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা। এ জন্য তিনি ওই লোকদের বেশি ভালোবাসেন, যারা তাঁর বান্দাদের উপকার করতে সচেষ্ট থাকে। সুতরাং তুমি যদি বান্দাদের উপকার

---

২২৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ১১/১৫১-১৫২।

২২৪. উয়ুনুল আখবার : ৩/১৯৬।

২২৫. আল-মুসতাতরিফ ফি কুল্লি ফাননিন মুসতাজরিফ : ১/১২৬।

করাকে নিজের কাজ বানিয়ে নাও এবং তাদের জন্য তোমার দান-দক্ষিণা ও উদারতার দুয়ার খুলে দাও, তাহলে আল্লাহর রহমতের শাহি ফটক তোমার জন্য খুলে যাবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আল্লাহর অনুগ্রহের দুয়ার খুলতে হলে প্রথমে তোমাকে নিজের অনুগ্রহের দুয়ার খুলতে হবে। এ সম্পর্কে সালিহ মিররি ﷺ বলেন :

'যদি তুমি তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করো, তাহলে তাঁর মাখলুকের প্রতি অনুগ্রহ করো। তখন তোমার সকল বিষয়ে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ তোমার সাথে থাকবে।'[২২৬]

এর সমর্থনে রাসুল ﷺ-এর একাধিক হাদিসও আছে :

- যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে পোশাক পরিধান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পোশাক পরিধান করাবেন।
- যে ব্যক্তি কোনো ক্ষুধার্তকে আহার করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের ফলমূল খাইয়ে পরিতৃপ্ত করবেন।
- যে ব্যক্তি কোনো পিপাসার্তকে পানি পান করাবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পানি করাবেন।
- যে ব্যক্তি কোনো গোলাম আজাদ করবে, আল্লাহ তাআলা উক্ত গোলামের একেকটি অঙ্গের বিনিময়ে তার একেকটি অঙ্গকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।
- যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্তের অভাব (সাহায্যের মাধ্যমে) সহজ করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে (তার বিষয়গুলো) তার জন্য সহজ করবেন।
- যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোনো মুমিনের কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা তার থেকে কিয়ামতের কঠিন কষ্ট দূর করে দেবেন।

উল্লিখিত প্রতিটি হাদিস জান্নাত-প্রত্যাশীদের মনে দান, খয়রাত ও কল্যাণমূলক কাজে অংশ নেওয়ার জন্য চরমভাবে উৎসাহিত করে।

---

২২৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/১৭১।

সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বোত্তম কর্ম

আব্দুল্লাহ বিন উমর ﵁ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি কে এবং সর্বোত্তম আমল কোনটি?'

উত্তরে রাসুল ﷺ বললেন :

أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دِينًا، أَوْ تُطْرَدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ، شَهْرًا،

'ওই ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম, যে সবচেয়ে বেশি মানুষের উপকার করে। আর আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম কর্ম হচ্ছে, মুসলিমদের অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করা অথবা তার কষ্ট দূর করা অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করা। কোনো ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণের জন্য পথচলা আমার কাছে এই মসজিদে (মসজিদে নববিতে) এক মাস ইতিকাফ থাকার চেয়ে প্রিয়।'[২২৭]

যদি তুমি বিচক্ষণ ও চালাক হয়ে থাকো এবং তোমার সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করে আমল করার জন্য সর্বোত্তম আমলের খোঁজে থাকো, তাহলে নিরবচ্ছিন্নভাবে আমল করার শর্ত দিয়ে আমার নিকট থেকে এই হাদিয়াটি লুপে নাও :

'বান্দার কল্যাণের জন্য কাজ করা ইবাদত, বলতে গেলে এটাই সর্বোত্তম ইবাদত।'[২২৮]

২২৭. আল-মুজামুল আওসাত : ৬০২৬, আল-মুজামুল কাবির : ১৩৬৪৬।
২২৮. মিজানুল আমল, আবু হামিদ গাজালি : পৃ. ৩৮৩।

মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য চেষ্টা ও সুপারিশ করা কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। রাসুল ﷺ স্বীয় কাজের মাধ্যমে সাহাবিদের এ কাজ শিক্ষা দিয়েছেন। মুআবিয়া رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي الشَّيْءَ فَأَمْنَعُهُ حَتَّى تَشْفَعُوا فِيهِ، فَتُؤْجَرُوا

'অনেক সময় কোনো মানুষ আমার থেকে কোনো কিছু চাইলে আমি প্রথমে দিতে অস্বীকার করি, যাতে তোমরা সুপারিশ করে সাওয়াবের ভাগিদার হতে পারো।'[২২৯]

সুপারিশ করা খ্যাতি ও প্রভাবের জাকাত। উজির হাসান বিন সাহল বলেছেন, 'আমার সম্পদের জাকাত দেওয়া আমার ওপর ফরজ। একইভাবে আমার প্রভাব-প্রতিপত্তিরও জাকাত আছে, সহযোগিতা ও সুপারিশ করার মাধ্যমে এ জাকাত আদায় করতে হয়।'

অনেক ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা দান করার চেয়ে সুপারিশ করা উত্তম হয়। এ সম্পর্কে মাওয়ারদি رحمه الله বলেন :

'প্রভাব-প্রতিপত্তির ত্রাণ দেওয়া অর্থাৎ সুপারিশ করা অনেক সময় উপকারিতার দিক দিয়ে সম্পদ দান করার চেয়ে কার্যকারী ও গুরুত্ববহ হয়। অনেক অসহায় লোক এর ছায়াতলে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পায়। সুতরাং কোনো প্রতিপত্তিওয়ালা ব্যক্তি যদি কোনো কারণ ছাড়াই সুপারিশ করতে অস্বীকার করে, সে টাকা-পয়সার কৃপণের চেয়ে বড় কৃপণ।[২৩০]

এ উপকারিতা ও কল্যাণমূলক কাজ শুধু দুনিয়াবি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দ্বীনি বিষয়ে মানুষের উপকার ও কল্যাণ করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

---

২২৯. সুনানুন নাসায়ি : ২৫৫৭।
২৩০. আদাবুদ দুনিয়া ওয়াদ দ্বীন : ১/৩৩৩-৩৩৪।
২৫ নং ফায়দা : সুপারিশ-সম্পর্কিত হাদিস উল্লেখ করার পর ইমাম নববি رحمه الله বলেন, 'এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, কারও বৈধ প্রয়োজন পূরণ করার জন্য সুপারিশ করা মুসতাহাব। সব ধরনের সুপারিশ এর অন্তর্ভুক্ত। সেটা সুলতানের নিকট হোক বা গভর্নরের নিকট বা যে কারও নিকট। সে সুপারিশ জুলুম বন্ধ করার জন্য হোক, শাস্তি রহিত করার জন্য হোক বা কোনো অভাবগ্রস্তকে অনুদান দেওয়ার জন্য হোক বা অন্য যেকোনো কারণে হোক। (শারহুন নববি : ১৬/১৭৭)

সুতরাং কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে অন্যকে ভালো কাজের পথনির্দেশ করা, হাত ধরে তাওবার পথে নিয়ে আসা, শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়ে পাপাচার ও অশ্লীলতার পথে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। কোনো পাপিষ্ঠ যখন নিজের মুক্তির পথকে চিরতরে বন্ধ মনে করে আশাহত হয়ে পড়ে, তার সামনে আশার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়াও দ্বীনি কল্যাণমূলক কাজের অন্তর্ভুক্ত। মুনাবি ﵀ উপকার ও কল্যাণ সম্পর্কিত হাদিসের বিশ্লেষণ করার সময় দুনিয়াবি ও দ্বীনি কল্যাণের মাঝে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে বলেছেন :

'দ্বীনি কল্যাণ মর্যাদা ও স্থায়িত্ব বিবেচনায় বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'[২৩১]

সদাকা মুক্তির প্রধান ফটক

যারা রোগ-বালাই থেকে আরোগ্য প্রত্যাশী কিংবা কোনো কঠিন বিপদ থেকে মুক্তি পেতে চায়, তাদের প্রতি নবিজি ﷺ উপদেশ দিয়ে বলেছেন :

دَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ

'তোমরা সদাকার মাধ্যমে তোমাদের অসুস্থদের চিকিৎসা করো।'[২৩২]

সূর্যগ্রহণের কারণে যখন মানুষজন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, তখন তিনি তাদের উপদেশ দিয়েছেন :

فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَادْعُوا اللهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

'যখন তোমরা তা (সূর্যগ্রহণ) হতে দেখবে, তখন আল্লাহর নিকট দুআ করবে, তাকবির বলবে, নামাজ পড়বে এবং সদাকা করবে।'[২৩৩]

---

২৩১. ফাইজুল কাদির : ৩/৪৮১।

২৩২. আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি : ৬৫৯৩, আল-মুজামুল কাবির লিত তাবারানি : ১০১৯৬, শুআবুল ইমান : ৩২৭৮।

২৩৩. সহিহুল বুখারি : ১০৪৪।

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় ইবনে দাকিকুল ইদ ﵀ বলেন, 'এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, প্রত্যেক ভীতিকর অবস্থায় আশঙ্কাজনক বিপদ থেকে মুক্তিলাভের জন্য সদাকা করা মুসতাহাব।'[২৩৪]

মুনাবি ﵀ সত্যই বলেছেন :

'এটাকে (সদাকার মাধ্যমে চিকিৎসা) পরীক্ষা করার পর প্রমাণিত হয়েছে, রুহানি বা আধ্যাত্মিক চিকিৎসার দ্বারা এমন কাজ হয়, যা সাধারণ ইন্দ্রিয়প্রবণ চিকিৎসা দ্বারা হয় না। চোখের ওপর (বস্তুবাদের) গাঢ় চশমা পরিহিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউই এটা অস্বীকার করে না।'[২৩৫]

অনেক সালাফ মনে করেন, সদাকা তার আদায়কারীর সকল বিপদাপদ দূর করে দেয়; যদিও সে জালিম হয়।

ইবরাহিম নাখয়ি ﵀ বলেন, 'সালাফগণ মনে করতেন, সদাকা জালিম ব্যক্তিকেও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।'[২৩৬]

উল্লিখিত প্রতিটি বাণীকে আমাদের প্রিয় নবি ﷺ-এর একটি হাদিস অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। হাদিসটি হচ্ছে :

تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ

'ভালো সময়ে আল্লাহকে চেনো, কঠিন সময়ে তিনি তোমাকে চিনবেন।'[২৩৭]

---

২৩৪. আহকামুল ইহকাম : ১/৩৫৩।
২৩৫. ফাইজুল কাদির : ৩/৫১৫।
২৩৬. শুআবুল ইমান : ৩৫৫৯।
২৩৭. মুসনাদু আহমাদ : ২৮০৩ , আল-মুজামুল কাবির : ১১৫৬০। ২৬ নং ফায়দা : ইবনে রজব ﵀ বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে, যদি কোনো বান্দা তার সুস্থতা ও সচ্ছলতার সময়ে আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলে, তাহলে এর মাধ্যমে সে আল্লাহর সাথে পরিচিত হয়। আল্লাহ ও তার মাঝে এক ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়; ফলে তার বিপদের মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা তাকে চিনেন এবং সচ্ছলতার সময়ে তার কৃত আমলের বিনিময়ে তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন।' (নুরুল ইকতিবাস : পৃ. ৪৩)

তোমার আর্থিক অবস্থা দুর্বল বলে বা তোমার সম্পত্তি খুব বেশি নয় বলে তুমি সদাকার ফজিলত থেকে বঞ্চিত হবে না। কারণ, সদাকার সাওয়াব অর্জনের জন্য মোটা অঙ্ক ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। নিজের স্বাভাবিক ব্যয়ের সময় উত্তম নিয়ত করে নিলেই সদাকার সাওয়াব পেয়ে যাবে তুমি। নিচের হাদিসগুলোই তার প্রমাণ :

- তোমার স্ত্রীকে যে খাবার খাওয়াও, তা তোমার জন্য সদাকা।
- তোমার সন্তানের মুখে যে খাবার তুলে দাও, তা তোমার জন্য সদাকা।
- তোমার খাদিমকে যে খাবার খাওয়াও, তা তোমার জন্য সদাকা।
- তুমি নিজে যে খাবার খাও, তাও তোমার জন্য সদাকা।[২৩৮]

২৩৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৭১৭৯, আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮২।

আজাব অপসারণ

ভালো কাজের অন্যতম একটি উপকারিতা হচ্ছে, তা পুরো জাতি থেকে আজাবকে অপসারণ করে এবং জাতিকে নিজের হাতে নিজে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। যদি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেককার লোক তাদের নেক আমলের মাধ্যমে পাপাচার ও অশ্লীলতার আধিক্যকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে এতদিনে আমাদের ওপর অনেক আজাব আপতিত হতো।

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

'আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত।'[২৩৯]

নবিজি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'আমাদের মাঝে নেককার লোক থাকা সত্ত্বেও আমরা কি ধ্বংস হয়ে যাব?' তিনি বললেন, (نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ) 'হ্যাঁ, যদি পাপাচার খুব বেশি হয়ে যায়।'[২৪০]

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত করার অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা নামাজি ব্যক্তির মাধ্যমে বেনামাজি ব্যক্তি থেকে প্রতিহত করেন, আল্লাহভীরু ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহভীরু নয় এমন ব্যক্তির বিপদ প্রতিহত করেন; যাতে নিজেদের পাপের কারণে সকল মানুষ ধ্বংস হয়ে না যায়।[২৪১]

হুদাইবিয়া চুক্তির শর্ত লঙ্ঘনের কারণে কুরাইশ কাফিরদের ওপর আল্লাহর আজাব আসার কথা ছিল; কিন্তু তাদের মধ্যে গোপনে ইমান আনা কয়েকজন

---

২৩৯. সুরা আল-বাকারা, ২ : ২৫১।
২৪০. সহিহুল বুখারি : ৩৩৪৬, সহিহু মুসলিম : ২৮৮০।
২৪১. তাফসিরুল ইমাম আরফাহ : ২/৭১১-৭১২।

মুমিন ছিলেন[২৪২] বলেই আল্লাহ তাআলা আজাব অপসারণ করে নেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুমিনদের দ্বারা কাফিরদের আজাব প্রতিহত করেছেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

'যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।'[২৪৩]

অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের মাঝে যেসব মুমিন নারী-পুরুষ তাদের অজান্তে ইমান এনে বসবাস করছেন, যদি তারা আলাদা হয়ে তাদের মাঝ থেকে বেরিয়ে যেতেন, তাহলে বাকিদের গণহারে হত্যা করতাম অথবা তাদের ওপর দ্রুত ব্যাপকভাবে কোনো আজাব দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম।

এটাই উমর বিন খাত্তাব ﵁-এর কথার মর্ম, যা তিনি সকল তাবিয়ির উদ্দেশে—যারা রাসুল ﷺ-কে দেখেননি এবং তাঁর কথা সরাসরি শোনেননি—বলেছিলেন :

'অচিরেই গ্রামসমূহ ধ্বংস হয়ে যাবে; অথচ সেগুলো হবে উন্নত ও সমৃদ্ধ।'

প্রশ্ন করা হলো, 'উন্নত ও সমৃদ্ধ হওয়ার পর তা ধ্বংস হবে কীভাবে?'

উত্তরে বললেন, 'যখন ভালো মানুষের ওপর খারাপ মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হবে।'[২৪৪]

উমর ফারুক ﵁ এই পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরই প্রিয়তম বন্ধু ও আদর্শ মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছ থেকে, যখন তিনি আল্লাহর একটি অতীত-যুগীয় নীতির বিবরণ দিয়েছিলেন সুদৃঢ়ভাবে :

---

২৪২. তাফসিরের ভাষ্য অনুযায়ী তারা মোট সাতজন ছিলেন। পুরুষ ছিলেন পাঁচজন : ওয়ালিদ বিন ওয়ালিদ বিন মুগিরা, সালামা বিন হিশাম, আইয়াশ বিন আবু রাবিআহ, আবু জানদাল বিন সুহাইল, আবু বাসির কারশি। দুজন মহিলা ছিলেন : আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মুল ফজল এবং উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মুআইত। (তাফসিরুত তাহরিরি ওয়াত তানবির : ২৬/১৯০)
২৪৩. সুরা আল-ফাতহ, ৪৮ : ২৫।
২৪৪. আল-জাওয়াবুল কাফি : পৃ. ৫৩।

مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا، ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوا، إِلَّا يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ

'যে জাতির মধ্যে পাপাচার হতে থাকে, কিন্তু তারা এগুলো বন্ধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বন্ধ করছে না, অচিরেই আল্লাহ তাদের সবাইকে চরম শাস্তি দেবেন।'[২৪৫]

ভালো কাজের পরিমাণ বেশি হলে আজাব উঠিয়ে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে, ভালো কাজের পরিমাণ যত হ্রাস পায়, আজাব তত নিকটবর্তী হয়।

অনেক সময় সৎকর্মশীলরা সংখ্যায় অল্প হলেও তাদের প্রভাব বেশি হয়। এ জন্যই আওন বিন আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ ﷺ সৎকর্মশীলদের সাহসী যোদ্ধা মনে করেন, যারা সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও পুরো উম্মাহর বিপদ দূর করার কাজে নিয়োজিত থাকেন। মন্তব্যটি তার ভাষাতেই তুলে ধরছি :

'মানুষের গাফিলতির সময়ে আল্লাহর জিকিরকারী ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে, পরাজয়-নিকটবর্তী সৈন্যদলের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসা সেই সাহসী সৈনিক, যে একাই পুরো বাহিনীকে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসে। উক্ত সৈনিক না থাকলে যেমন পুরো বাহিনী লজ্জাজনক পরাজয় বরণ করত, তেমনই মানুষের গাফিলতির সময়ে আল্লাহর জিকিরকারী না থাকলে পুরো উম্মাহ ধ্বংস হয়ে যেত।'

এ জন্যই বিচক্ষণ লোকেরা নেককার মানুষের মৃত্যুকে পৃথিবীবাসীর জন্য বিপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ন্যায়নিষ্ঠ উজির রজা বিন হাইওয়া সেই বিচক্ষণ লোকদের অন্যতম। তিনি বলেন, 'আমাদের নিকট যখন ইবনে উমর ﷺ-এর

---

২৪৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪৩৩৮, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০০৯।
২৭ নং ফায়দা : ইবনুল আরবি ﷺ বলেন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা : কিছু গুনাহ আছে যেগুলোর শাস্তি তাৎক্ষণিক হয়ে যায়। আর কিছু গুনাহের শাস্তি আখিরাত পর্যন্ত বিলম্বিত হয়। মন্দ কাজ দেখে চুপ থাকা সেই গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর শাস্তি তাৎক্ষণিক দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে এ গুনাহের কারণে দুনিয়াতেই শাস্তিস্বরূপ ধন-সম্পদ ও জানের ক্ষতি হয় এবং মাখলুকের ওপর জালিমের তরফ থেকে লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়।

মৃত্যুসংবাদ আসে, তখন আমরা ইবনে মুহাইরিজ رحمه الله-এর মজলিশে উপবিষ্ট ছিলাম। মৃত্যুসংবাদ শোনার পর ইবনে মুহাইরিজ رحمه الله বললেন,

'আল্লাহর কসম, আমি ইবনে উমরের অস্তিত্বকে পৃথিবীবাসীর জন্য নিরাপত্তা মনে করতাম।'[২৪৬]

কিছুকাল পর বাইতুল মাকদিসের মেহমান, আবিদকুল শিরোমণি ইবনে মুহাইরিজ رحمه الله মৃত্যুবরণ করেন। রজা বিন হাইওয়া তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে কী বলেছিলেন জানো!? তিনি বলেছিলেন,

'আল্লাহর কসম, আমি ইবনে মুহাইরিজের অস্তিত্বকে পৃথিবীবাসীর জন্য নিরাপত্তা মনে করতাম।'[২৪৭]

হে পাপাচারী সম্প্রদায়, সৎকর্মশীল ও নেককার লোকদের শুকরিয়া আদায় করো। এটা তোমাদের ওপর ওয়াজিব। কারণ, তারা না থাকলে তোমাদের অস্তিত্ব নির্ঘাত হুমকির মুখে পড়ত। তাদের কারণেই আজ তোমরা নিরাপদ। যদি তারা মারা যায়, তাহলে তোমাদের ভাগ্য খারাপ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর আজাব তোমাদের পাকড়াও করে নেবে।

রক্ষা পাওয়ার মূল রহস্য

তবে যেকোনো ধরনের নেককার লোকের উপস্থিতি আজাব প্রতিহত করতে পারে না। বরং সমাজ-সংশোধনে সচেষ্ট নেককার লোকের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। শুধু নিজে নেক আমল করে, সমাজের অন্যান্য লোকের সংশোধনের কোনো প্রচেষ্টা চালায় না এমন নেককার লোক আল্লাহর আজাব অপসারণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। ইসলাহ তথা সংশোধন করাকেই আল্লাহ তাআলা ধ্বংস ও মুক্তির মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী আখ্যায়িত করেছেন। ইরশাদ করেছেন :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ

---

২৪৬. তারিখু বাগদাদ : ১/১৮৪।

২৪৭. মুখতাসারু তারিখি দিমাশক : ১৪/৩৫।

'আর তোমার পালনকর্তা এমন নন যে, জনবসতিগুলোকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দেবেন, সেখানকার লোকেরা সংশোধনকারী হওয়া সত্ত্বেও।'[২৪৮]

আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, যদি জনপদের লোকেরা সংশোধনকারী হয়, তাহলে তাদের ওপর আজাব আসবে না। অন্যথায় তাদের ওপর আজাব আসবে। সংশোধন করার অর্থ হচ্ছে, ভালো কাজের নির্দেশ দেওয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বাধা দেওয়া। এ জন্যই উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ বলেছেন :

'আল্লাহ তাআলা কয়েকজনের পাপের কারণে সবাইকে আজাব দেন না; কিন্তু পাপাচার যদি প্রকাশ্যে করা হয়, তাহলে সবাই শাস্তির উপযোগী হয়ে যায়।'[২৪৯]

তাঁর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, আল্লাহ তাআলা কখনো কখনো নির্দিষ্ট কয়েকজনের অপরাধের কারণে ব্যাপকভাবে সবার ওপর আজাব প্রেরণ করেন। কাজেই আমরা যদি ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা থেকে বিরত থাকি, তাহলে আমরাও আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হব। তবে ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা সত্ত্বেও যদি অপরাধীরা তাদের অপরাধ থেকে ফিরে না আসে, তাহলে সংশোধনকারী লোকদের সেই জনপদ থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত। কারণ, পাপাচার ও অশ্লীলতার বাতাসে মুমিনের আত্মাও অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অসুস্থতা থেকে সুরক্ষিত থাকার জন্য হয়তো পাপাচার প্রতিহত করতে হবে, নয়তো নিজেকে সেখান থেকে সরে যেতে হবে।

যে ব্যক্তি এমন করবে, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁-এর দৃষ্টিতে সেই প্রকৃত আলিম। তাঁর মতে, যে ভালো কাজের আদেশ দেয় না এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে না, সে আলিম নয়। তিনি বলেন :

'তোমাদের ওপর এমন একটি সময় আসবে, যখন পূর্ববর্তী সময়ের চেয়ে ইলম কমে যাবে। যখন আলিমগণের বিদায় হবে, তখন সকল মানুষ বরাবর হয়ে

---

২৪৮. সুরা হুদ, ১১ : ১১৭।
২৪৯. মুয়াত্তা ইমাম মালিক : ২/১৭১।

যাবে। তারা ভালো কাজের আদেশ দেবে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে না। সে সময় তাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে।'[২৫০]

ইসলামের ছায়াতলে আসার অদ্ভুত কাহিনি

আল্লাহর একটি নীতি হচ্ছে, কয়েকজনের পাপের কারণে পুরো জাতি ধ্বংস ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়—এই নীতির কারণেই ইকরিমা বিন আবু জাহেল ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন! অদ্ভুত এই কাহিনিটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তাবারি ﵀ :

ইকরিমা ﵁ বর্ণনা করেন, তিনি ইয়ামেনের দিকে পালিয়ে যাওয়ার পথে একটি ঘটনা তাকে ইসলামের দিকে নিয়ে এসেছে। সেটি হচ্ছে, আমি সমুদ্রপথে ইথিওপিয়া চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম। নৌকায় উঠতে যাব এমন সময় নৌকার মাঝি বলল, 'হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ ছাড়া সকল উপাস্যকে অস্বীকার করার পূর্বে আমার নৌকায় আরোহণ করো না। কারণ আমার ভয় হচ্ছে, তুমি এমনটি না করলে আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাব।' আমি বললাম, 'এতে কি আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য সকল উপাস্যকে অস্বীকারকারী ব্যতীত অন্য কেউ আরোহণ করে না?' মাঝি বলল, 'হ্যাঁ, এখানে কেবল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসীরাই আরোহণ করে।' তখন আমি মনে মনে বললাম, 'তাহলে আমি মুহাম্মাদ থেকে পালিয়ে যাচ্ছি কীসের কারণে? তিনি এই একত্ববাদের দাওয়াত নিয়েই তো আমাদের কাছে এসেছেন। ওয়াল্লাহি, যিনি সমুদ্রে আমাদের মাবুদ, স্থলভাগেও তিনিই আমাদের মাবুদ। তখন ইসলামকে আমি চিনতে পারি এবং তা আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়।'[২৫১]

দেখো, নৌকাওয়ালা মাত্র একজন অবিশ্বাসীকে তার নৌকায় তুলতে অস্বীকার করল, সে একজনের কারণে সবাই ডুবে যাওয়ার ভয়ে। কারণ, 'অল্পের পাপের শাস্তি অধিকেও ভোগে'—নীতিটি সম্পর্কে তার ভালোই ধারণা ছিল।

---

২৫০. ফাতহুল বারি : ১৩/২১।
২৫১. তারিখুত তাবারি : ৩/৫৯-৬০।

তারা হয়তো পাপ সরিয়ে দেয় অথবা পাপ থেকে নিজেরা সরে পড়ে

সংশোধনকারী পুণ্যবান লোকদের একটি গুণ হচ্ছে, (لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) 'তারা মিথ্যা কাজে[২৫২] যোগদান করে না।'[২৫৩]

হাফিজ ইবনে কাসির ﷺ বলেন, আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এখানে যোগদান না করা মানে উপস্থিত না হওয়া। এ জন্যই এর পরপরই আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন : (وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) 'এবং তারা যখন অসার কাজকর্মের পাশ দিয়ে যায়, তখন সসম্মানে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।'[২৫৪] অর্থাৎ তারা মিথ্যা কাজে উপস্থিত হয় না। ঘটনাক্রমে যদি কখনো এমন কাজকর্মের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, তখন পাশ কাটিয়ে চলে আসে এবং কোনোভাবেই ওই কর্মের সাথে সংযুক্ত হয় না।[২৫৫]

আয়াতে 'মিথ্যা কাজ' বলে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত রয়েছে। প্রতিটি মতামতের সারমর্ম একটাই : প্রতিটি পাপকাজ মিথ্যা কাজের অন্তর্ভুক্ত, যা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়।

- জাহহাক ও ইবনে জাইদের অভিমত হচ্ছে, মিথ্যা কাজ বলতে শিরক বোঝানো হয়েছে।
- ইবনে জুরাইজের মতে, মিথ্যা কাজ মানে মিথ্যাবাদিতা।
- কাতাদার অভিমত, মিথ্যা কাজ বলতে সব ধরনের বাতিল মজলিশ বোঝানো হয়েছে।
- ইবনুল হানাফিয়্যা এর বর্ণনামতে, বেহুদা ও অসার কাজকর্ম।

---

২৫২. সকল পাপাচার মিথ্যা কাজের অন্তর্ভুক্ত।
২৫৩. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭২।
২৫৪. সুরা আল-ফুরকান, ২৫ : ৭২।
২৫৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৬/১১৮।

- মুজাহিদের অভিমত হচ্ছে, মিথ্যা কাজ মানে মুশরিকদের উৎসবসমূহ।[২৫৬]

মিথ্যা কাজে যোগদান না করা মানে এমন সব স্থান ও বিষয় থেকে দূরে থাকা, যেখানে কোনো মুসলিম গেলে পাপকর্মে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে; যদিও তাতে সে পতিত না হোক। এমন কয়েকটি বিষয়ের প্রতি রাসুল ﷺ ইশারা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, সুদ খাওয়া। সুদি লেনদেনের লেখক ও সাক্ষীদের প্রতিও রাসুল ﷺ অভিসম্পাত করেছেন; অথচ তারা সরাসরি সুদ খাওয়ার সাথে জড়িত নয়। হাদিসের মধ্যে আছে :

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ

'রাসুল ﷺ সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন।'[২৫৭]

আরেকটি হচ্ছে, মদপানের আসর থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়ে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের ওপর ইমান রাখে, সে যেন এমন কোনো খাবার আয়োজনে অংশগ্রহণ না করে, যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়।'[২৫৮]

এ জন্য নেককার লোকেরা সব সময় পাপাচার সংঘটিত হওয়ার জায়গাসমূহ থেকে দূরে থাকেন, পাপিষ্ঠদের ওপর আপতিত আজাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে অথবা ইমানের ক্ষতি হওয়ার ভয়ে। উজির আওনুদ্দিন আবু মুজাফফর ইয়াহইয়া বিন হুবাইরা বলেন :

---

২৫৬. তাফসিরুল বাহরিল মুহিত : ৮/১৩২।

২৫৭. সহিহু মুসলিম : ১৫৯৮, সুনানুত তিরমিজি : ১২০৬।

২৫৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৮০১, আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ৬৭০৮।

আমার এবং গ্রামের একজন শাইখের মাঝে একটি লেনদেন ছিল। সেটি নিষ্পত্তি করার জন্য একদিন আমি দাওর (উজিরের শহর) থেকে তার গ্রামে গেলাম। কিন্তু তাকে না পেয়ে তার অপেক্ষায় সেখানে অবস্থান করলাম। অপেক্ষা করতে করতে রাত নেমে আসলো। আমি ঘুমানোর জন্য তার ঘরের ছাদে উঠলাম। তখন শুনতে পেলাম, কিছু মানুষ আবোল-তাবোল কথা বলছে। তাদের ব্যাপারে জানতে চাইলে আমাকে বলা হলো যে, তারা দিনের বেলা আঙুর থেকে মদ নিঙড়ায় আর রাত হলে (মদপান করে) আবোল-তাবোল কথা বলে। তখন আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, এখানে আমি রাত্রি যাপন করব না।' বলা হলো, 'কেন?' আমি বললাম, 'আমার ভয় হচ্ছে, তাদের প্রতি আল্লাহর আজাব বা ক্রোধ নাজিল হবে, তখন আমিও তাদের সাথে আজাবের ভাগী হয়ে যাব। যদি আজাব নাও আসে, তখন প্রকাশ্য ধ্বংস থেকে রক্ষা পেলেও, আত্মিকভাবে আমি ধ্বংসের শিকার হব। অর্থাৎ তাদের কথা শুনতে শুনতে আমার কলবের মধ্যে কঠোরতা এবং আল্লাহর জিকিরের প্রতি উদাসীনতা চলে আসবে।' এ কথা বলার পরপরই আমি দাওরে ফিরে আসলাম।[২৫৯]

দেখো, পাপিষ্ঠদের আশপাশে থাকার ব্যাপারে উজিরের কেমন ভয়! নিজের কলবকে পাপিষ্ঠ-সংশ্রবের কালিমা থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁর কেমন চেষ্টা! আল্লাহ তাআলা তাঁর এমন সতর্কতা ও চেষ্টার মূল্য দিয়েছেন। সেদিনের পর খলিফা মুকতাফি সেই গ্রামের পুরো কর্তৃত্ব তাঁর হাতেই তুলে দিয়েছিলেন!

---

২৫৯. জাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ : ২/১৩৬-১৩৭।

পাপাচার বিলুপ্তকারী পাপাচার থেকে সরে পড়া ব্যক্তির চেয়ে উত্তম

তবে যে ব্যক্তি পাপাচার বিলুপ্ত করে, সে পাপাচার থেকে নীরবে সরে পড়া ব্যক্তির চেয়ে উঁচু স্তরের। এ জন্যই ইমাম বান্না ﷺ নম্রতামিশ্রিত ইখলাস এবং ভালোবাসাপূর্ণ বিচক্ষণতার মাধ্যমে পাপাচার বিলুপ্ত করার চেষ্টা করতেন। তাঁর জীবনীর পাতা উল্টালে ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধের ব্যাপারে তাঁর চমৎকার অবস্থান তোমার কাছে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হবে। সে ধরনের একটি ঘটনার বিবরণ শোনো :

রমাদানের এক রাতে ইমাম বান্না ﷺ ইসমাইলিয়ার শরয়ি কাজির বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সে মজলিশে কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা, সাধারণ কোর্টের বিচারপতি, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ও শিক্ষা-নিরীক্ষকসহ একদল সাহিত্যিক ও জ্ঞানীগুণী লোক উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আইনজীবী এবং গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় লোকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইমাম বান্না ﷺ সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন :

'কাজি মহোদয় আমাদের জন্য চায়ের অর্ডার করলেন। অতঃপর আমাদের সামনে রুপার পাত্রে চা পরিবেশন করা হলো। আমাকে চা দিতে আসলে আমি চায়ের পাত্র না নিয়ে কেবল একটি কাচের পাত্র দিতে বললাম। তখন কাজি মহোদয় আমার দিকে মুচকি হেসে তাকালেন এবং বললেন, "মনে হয় তুমি চায়ের পাত্র রুপার বলেই চা পান করতে চাইছ না।" আমি বললাম, "জি, বিশেষ করে কাজির বাড়িতে বসে আমি রুপার পাত্র দিয়ে চা পান করি কীভাবে?" তখন তিনি বললেন, "এই মাসআলায় তো ইখতিলাফ আছে এবং এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে। তাই এ বিষয়ে এতটা কঠোর হওয়া ঠিক হবে না।" আমি বললাম, "হে শ্রদ্ধেয়, রুপার পাত্র ব্যবহারের ব্যাপারে ইখতিলাফ আছে ঠিক, তবে তা থেকে খানা ও পান করা সম্পর্কে কোনো ইখতিলাফ নেই। কেননা, মুত্তাফাক আলাইহ হাদিসে এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। নবিজি ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا

"তোমরা স্বর্ণ ও রুপার পাত্রে পান করো না এবং স্বর্ণ ও রুপার থালায় আহার করো না।"[২৬০]

অন্য হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন :

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

"যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রুপার পাত্র থেকে পান করে, সে পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুন ভরে।"[২৬১]

আর যে বিষয়ে স্পষ্ট নস থাকে, সেখানে কিয়াস করার কোনো প্রয়োজন নেই। সুতরাং আপনি আমাদের সবাইকে কাচের পাত্রে পান করার নির্দেশ দিলে কতই না উত্তম হতো!'

উপস্থিত লোকদের কয়েকজন আমাদের আলোচনায় মনোযোগ দিলেন এবং বলতে চাইলেন যে, বিষয়টি যেহেতু মতবিরোধপূর্ণ, তাই সেটা অস্বীকার করার তেমন প্রয়োজন নেই। সাধারণ কোর্টের বিচারপতিও নিজের মত ব্যক্ত করতে চাইলেন এবং শরিয়া কোর্টের বিচারপতিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'শ্রদ্ধেয় বিচারপতি, যখন আপনার সামনে নস আছে, তখন নসকে সম্মান করা উচিত। নসের হিকমত বা অভ্যন্তরীণ রহস্য স্পষ্ট না হলে তা বের করা এবং নস অনুযায়ী আমল পরিত্যাগ করা আমাদের ওপর আবশ্যক নয়। তাই নসে যা বলা হয়েছে, তা মেনে নেওয়াই আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয়। হ্যাঁ, যদি নসের হিকমত সম্পর্কে আমরা পরে কিছু জানতে পারি, সেটা তখন বিবেচনা করা হবে। এখন সর্বাবস্থায় আমল করা আমাদের ওপর ওয়াজিব।'

তার এ মন্তব্যকে আমি সুযোগ হিসেবে নিলাম এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার আঙুলের দিকে ইশারা করে বললাম, 'আপনি এখন যে কথা বলেছেন, তা যদি ঠিক হয়, তাহলে আপনার হাতের স্বর্ণের আংটিটি খুলে ফেলুন। কারণ স্বর্ণের আংটি হারাম হওয়ার ব্যাপারেও নস আছে।' এ কথা শুনে তিনি হাসলেন এবং বললেন, 'উস্তাজ, আমি নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বিধান অনুযায়ী বিচার-

২৬০. আস-সুনানুল কুবরা লিন নাসায়ি : ৬৫৯৭।
২৬১. আল-মুজামুল আওসাত : ৩৩৩৩, আল-মুজামুল কাবির : ৩১৯।

ফয়সালা করি, আর আমাদের শরয়ি বিচারপতি মহোদয় কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করেন। আমরা দুজনই নিজ নিজ বিধান মানতে বাধ্য। তাই আমাকে ছেড়ে দিন এবং শরিয়া বেঞ্চের বিচারপতি সাহেবকে ধরুন।'

আমি বললাম, 'বিধানটি সকল মুসলিমের জন্য এসেছে। যেহেতু আপনি একজন মুসলিম, তাই এ বিধানটি আপনার জন্যও প্রযোজ্য।'

তখন তিনি আংটিটি খুলে ফেললেন। সব মিলিয়ে মজলিশটি চরম উপভোগ্য ছিল। সেদিনের মজলিশের মাধ্যমে উপস্থিত সবাই একটি বার্তা লাভ করেছিলেন যে, ভালো কাজের আদেশ, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ এবং আল্লাহর বিধান সম্পর্কিত যেকোনো উপদেশ দানের ক্ষেত্রে এমন অবস্থান গ্রহণ করা উচিত।

দুজনই সমান অপরাধী!

যে হারামে লিপ্ত হয় এবং যে তাকে হারামে লিপ্ত দেখে নিশ্চুপ থাকে, দুজনই সমানভাবে অপরাধী। অনেক সময় একটি গুনাহে একাধিক শরিকদার থাকে। এ জন্যই ইমাম কুরতুবি ﷺ আল্লাহ তাআলার বাণী (إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ) 'তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে।'[২৬২]-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন :

'যেসব মানুষ পাপের মজলিশে বসে, কিন্তু পাপীদের পাপকর্ম থেকে বাধা দেয় না, তারা (সরাসারি পাপকর্মে লিপ্ত না হয়েও) সমান অপরাধী বিবেচিত হবে। তাই কোনো মজলিশে পাপাচার হতে দেখলে বাধা দেওয়া উচিত। বাধা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে সেখান থেকে চলে যেতে হবে। যাতে এ আয়াতে উদ্দিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত না হতে হয়।'[২৬৩]

---

২৬২. সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৪০।

২৬৩. আল-জামি লি আহকামিল কুরআন : ৫/৪১৮।

২৮ নং ফায়দা : উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, একদিন তিনি মদপানরত একদল লোককে আটক করলেন। তাদের একজনের ব্যাপারে বলা হলো যে, সে রোজা রেখেছে। কিন্তু তিনি তাকেও শাস্তি দিলেন এবং তিলাওয়াত করলেন :

إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ

'তা না হলে তোমরাও তাদেরই মতো হয়ে যাবে।' (সুরা আন-নিসা, ৪ : ১৪০)

তাহির বিন আশুর পাপীর গুনাহ এবং পাপ দেখে চুপ থাকা ব্যক্তির গুনাহের মিল সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা পেশ করেছেন :

'পাপীদের সাথে পাপ দেখে চুপ থাকা ব্যক্তিদের যে মিল ও অনুরূপতা, তা মারাত্মক পর্যায়ের কঠোর ও ভীতিকর বিষয় নয়। কেবল মুনাফিকদের সাথে ওঠাবসা করার মাধ্যমেই কোনো মুমিন মুনাফিক হয়ে যায় না। উভয়ের মাঝে যে সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে, তা কেবল পাপের ক্ষেত্রে; পাপের পরিমাণের ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ (যদি তোমরা তাদের সাথে বসো, তখন) তোমরা তাদের মতো গুনাহে জড়িয়ে পড়বে।'[২৬৪]

অনেক পাপিষ্ঠের ওপর তাদের অজান্তেই অনবরত অভিশাপ পড়তে থাকে। তারা পরিণত হয় বিপদাপদের উৎসমুখে। যেন তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছুরি আছে, সেটি দিয়ে তারা নিজেদের এবং নিজেদের আশপাশে অবস্থান করা লোকদের ইমানকে ছিন্নভিন্ন করতে থাকে। এমন অবস্থায় কোনো এক আল্লাহর বান্দা যদি কোনো পাপীর কর্ণকুহরে আল্লাহর নির্দেশ শুনিয়ে দেয় এবং তার হাত থেকে ছুরিটি ছিনিয়ে নেয়, সে ওই বীরসেনানীর সমমর্যাদা লাভ করবে, যে একাই পুরো বাহিনীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে নিয়ে আসে।

উপকারিতা ও ক্ষতি—দুটি বিষয়ই আশপাশে সংক্রমিত হয়। কুফার ফকিহ ইবরাহিম নাখয়ি ﷺ তার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন :

'এক ব্যক্তি কোনো মজলিশে বসে আল্লাহকে সন্তুষ্টকারী কোনো বাক্য বলল। তখন তার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়, সে রহমতে তার চারপাশের লোকজনও সিক্ত হয়। অনুরূপভাবে যখন কোনো মজলিশে কোনো ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন কোনো বাক্য বলে, তখন তার ওপর আল্লাহ ক্রোধ পতিত হয় এবং সে ক্রোধ তার আশপাশের লোকদেরও আক্রান্ত করে।'[২৬৫]

একজন প্রকৃত আল্লাহর বান্দা কখনো পাপ সংঘটিত হতে দেখে নিষেধ করা থেকে চুপ থাকতে পারে না। কারণ তার অন্তরের সুগভীরে রাসুল ﷺ-এর নিচের হাদিসটি অবস্থান করে :

---

২৬৪. আত-তাহরির ওয়াত তানবির : ৫/২৩৬।
২৬৫. জাদুল মাসির ফি ইলমিত তাফসির : ১/৪৮৮।

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ فِي حَقٍّ إِذَا رَآهُ، أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَهُ

'কেউ যখন কোনো সত্য কথা দেখবে বা অবগত হবে অথবা শুনবে, তখন তাকে মানুষের ভয় যেন সত্য বলা থেকে কক্ষনো বিরত না রাখে।'[২৬৬]

মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার বরকতে সাওয়াব বৃদ্ধি পায়

রাসুল ﷺ-এর মধুরতর একটি সুসংবাদ হচ্ছে :

إِنَّ مِنْ أُمَّتِي قَوْمًا يُعْطَوْنَ مِثْلَ أُجُورِ أَوَّلِهِمْ فَيُنْكِرُونَ الْمُنْكَرَ

'নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন একদল লোক আসবে, যাদেরকে তাদের পূর্ববর্তীদের (সাহাবিদের) মতো সাওয়াব দান করা হবে। তারা মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদান করবে।'[২৬৭]

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় আহমাদ আল-বান্না বলেন, 'অর্থাৎ উম্মাহর প্রথম দল—যারা ইসলামকে সাহায্য করেছেন এবং ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন—তাদের অনেক পরে আসা সত্ত্বেও, মন্দ কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী এই সম্প্রদায়কে আল্লাহ তাআলা প্রথম দলের মতো সাওয়াব দান করবেন।'[২৬৮]

এখানে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, মন্দকাজ থেকে বাধা প্রদানকারী এই সম্প্রদায় কি সাহাবিদের মর্যাদায় উন্নীত হবে? তারা কি সাহাবিদের সমান সাওয়াব পাবে?

ইমাম কুরতুবি ﷬ প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছেন :

'নষ্ট যুগ—যে যুগ থেকে আলিম ও দ্বীনদার লোকদের উঠিয়ে নেওয়া হবে, যে যুগে নষ্টামি ও গোলযোগ বেড়ে যাবে, মুমিন লাঞ্ছিত হবে, পাপিষ্ঠ হবে সম্মানিত, দ্বীন তার শুরুর অবস্থার মতো বিরল ও অপরিচিত হয়ে যাবে এবং

---

২৬৬. মুসনাদু আহমাদ : ১১০১৭।

২৬৭. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৫৯২।

২৬৮. আল-ফাতহুর রব্বানি : ১৯/১৭২।

দ্বীনের ওপর অটল থাকা জলন্ত অঙ্গার হাতে নেওয়ার মতো কঠিন হবে—সে যুগের ইমান এবং নেক আমল উম্মাহর প্রথম দলের (সাহাবিদের) ইমান ও নেক আমলের সমমর্যাদার হবে। তবে বদর ও হুদাইবিয়ার অভিযানে শরিক থাকা সৌভাগ্যবান দলের মর্যাদায় কেউ পৌঁছাতে পারবে না।'[২৬৯]

অবশ্য, তারা সাহাবিদের সমান সাওয়াব পেলেও রাসুল ﷺ-এর সাহচর্য লাভের মর্যাদায় সাহাবিগণ অনন্য। এই মর্যাদার আসনে উম্মাহর আর কেউই পৌঁছাতে পারবে না। কোনো আমলও এই সাহচর্যের সমান হতে পারে না।

খুশির ওপর খুশি

আলি মাহির পাশা[২৭০] ইখওয়ানুল মুসলিমিনের 'আল-মুরশিদুল আম' তথা প্রধান মুরব্বিকে[২৭১] আলেকজান্দ্রিয়ায় তার ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠানে দাওয়াত করলেন। নির্ধারিত দিনে শাইখ আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হলেন। তবে সরাসরি বিয়ের অনুষ্ঠানে না গিয়ে প্রথমে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের নিকট অবস্থান করলেন। অতঃপর একজন ভাইকে বিয়ের অনুষ্ঠানে পাঠালেন এবং বললেন, 'যদি দেখো, সেখানে শরিয়তবিরোধী কোনো কিছু হচ্ছে না, তাহলে আমাকে ফোন করবে, আমি সেখানে যাব। আর যদি কোনো সমস্যা দেখতে পাও, তাহলে আমার হয়ে তুমি দায়িত্ব পালন করবে।'

এরপর শাইখ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন; কিন্তু ভাইটির পক্ষ থেকে কোনো ফোন এলো না। তখন শাইখ উপস্থিত ভাইদের বললেন, 'আজকে আমাদের ইখওয়ানের কোনো ভাইয়ের বাড়িতে কোনো আয়োজন আছে?'

তারা বলল, 'হ্যাঁ, অমুকের বিয়ে আছে আজ।'

অতঃপর সবাই তার বিয়েতে উপস্থিত হলো। এভাবে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মুরশিদে আমের আগমনে বিয়েবাড়িতে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।[২৭২]

---

২৬৯. আল-জামিউ লি আহকামিল কুরআন : ৪/১৭৩।
২৭০. মিশরের ২৩ তম প্রধানমন্ত্রী।
২৭১. ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সর্বোচ্চ পদ।
২৭২. মিআতু মাওকিফিন মিন মাওয়াকিফিল মুরশিদিন লি জামাআতিল ইখওয়ানিল মুসলিমিন।
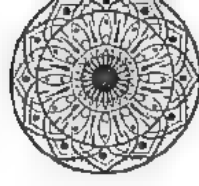
সন্তানসন্ততি সৎ ও ভালো হওয়া

তুমি সৎ ও ভালো হলে তার উপকারিতা তোমার সন্তানসন্ততিও লাভ করবে—বর্তমানেও, ভবিষ্যতেও। বর্তমান উপকারিতা হচ্ছে, দুনিয়াতে তারা বিপদমুক্ত থাকবে এবং তাদের দ্বীনি অবস্থা ভালো হবে, যার ফলে তারা জান্নাত পাওয়ার উপযুক্ত হবে। ভবিষ্যৎ উপকারিতা হচ্ছে, তুমি তাদের নিয়ে জান্নাতের একই আসনে একত্রিত হয়ে একটি জান্নাতি পরিবার গঠন করবে।

উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ খুব দৃঢ়তার সহিত বলতেন, 'একজন মুমিনের মৃত্যুর পর তার পরবর্তী প্রজন্মের পর প্রজন্মকে আল্লাহ তাআলা হিফাজত করেন।'[২৭৩]

সৎ ও নেককার ব্যক্তির অনেক দূরের উত্তরাধিকারীদেরও আল্লাহ তাআলা বিশেষ নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে রাখেন। সুরা কাহফের ৮২ নং আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরগণ তা-ই বলেছেন :

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

'আর তাদের দুজনের পিতা ছিলেন নেককার।'[২৭৪_২৭৫]

জাফর বিন মুহাম্মাদ ﷺ বলেন, 'আয়াতে যে পিতার কথা বলা হয়েছে, সে পিতা এবং দুই সন্তানের মাঝে আরও সাতজন পিতা ছিল।'[২৭৬]

---

২৭৩. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম : ১/৪৬৭।

২৭৪. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৮২।

২৭৫. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/২৫১।

২৭৬. জাদুল মাসির ইলা ইলমিত তাফসির : ৩/১০৪।

সেই অষ্টম পিতৃপুরুষের সততা ও নেক আমলের কারণে আল্লাহ তাআলা এ দুই এতিম বালকের সম্পদ তাদের বড় হওয়া পর্যন্ত হিফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'এ দুই বালকের সম্পদ হিফাজত করা হয়েছে তাদের পিতার সততা ও নেক আমলের কারণে। তাদের সততার কারণে নয়।'[২৭৭]

আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো, পিতামাতা সৎ ও নেককার হওয়ার কারণে সন্তানদের উপকার হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এক ব্যক্তিকে তাদের জন্য দেয়াল নির্মাণ করার জন্য নিযুক্ত করে দিলেন। এভাবে তারা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত তাদের সম্পদ সুরক্ষিত থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল। সর্বশেষ যখন দেয়ালটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হলো, তখন দেয়ালকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে বালকদ্বয়ের সম্পদ কেড়ে নেওয়ার মতলবে থাকা দুষ্ট লোকদের থেকে তাদের সম্পদ সুরক্ষিত রাখলেন।

এ জন্যই জগদ্বিখ্যাত আলিম সাইদ বিন জুবাইর ﷺ সন্তানের উপকার হওয়ার আশায় দীর্ঘ সময় ধরে নামাজ আদায় করতেন। হিশাম বিন হাসসান ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, সাইদ বিন জুবাইর ﷺ বলেন, 'আমি অধিকহারে নামাজ পড়ি আমার এই ছেলেটির জন্য।' হিশাম এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন, 'অর্থাৎ তার নামাজের বরকতে আল্লাহ তাআলা তার সন্তানকে হিফাজত করবেন, এ আশায় তিনি অধিক নামাজ পড়তেন।'[২৭৮]

প্রিয় ভাই আমার,

সন্তানের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যাংকে তাদের জন্য সম্পদ জমা করে রাখার মধ্যে নয়; বরং দীর্ঘ নামাজ, সিজদায় ঝরানো চোখের পানি, গোপন সদাকা, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা, প্রতিবেশীর অধিকার পূরণ এবং কুরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি ইবাদতের মাধ্যমে তাদের জন্য পুণ্য জমা করে রাখার মধ্যেই তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিহিত আছে।

---

২৭৭. জাদুল মাসির ইলা ইলমিত তাফসির : ৩/১০৪।

২৭৮. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৪/২৭৯।

এর বিপরীতে আল্লাহর ইবাদতে যদি তুমি কমতি করো এবং তাঁর বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করো, তাহলে তোমার পাশাপাশি তোমার সন্তানসন্ততিও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এবার তুমি নিজের জীবনের হিসাব কষতে বসো। দেখো, তোমার কী কী পাপের কারণে তোমার সন্তানদের ক্ষতি হয়েছে। যাতে সত্য দিলে আল্লাহর নিকট তাওবা করতে পারো। হাসান বসরি ﷺ কী বলেছেন, তা একটু পড়ে দেখো। তিনি বলেছেন, 'যদি তুমি তোমার সন্তানের মধ্যে অপছন্দনীয় কোনো বিষয় দেখতে পাও, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা করো। কেননা, হতে পারে, তোমার কারণেই তোমার সন্তানের মধ্যে সেটি এসেছে।'[২৭৯]

এ কথা বলে তিনি আমাদেরকে আল্লাহ তাআলার একটি ইশারার ব্যাপারে অবহিত করেছেন। অনেক সময় আল্লাহ তাআলা সন্তানদের মাধ্যমে আমাদের ইশারা করেন। তাদের মধ্যে প্রকাশ করে দেন তোমারই কোনো গোপন কর্মের প্রভাব। যাতে তুমি আল্লাহর ইবাদতের দিকে ফিরে আসো এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে আগ্রহী হও। ফলে তোমার সে নেক আমলের প্রভাব তোমার সন্তানদের ওপর পড়বে। ফলে তাদের দুনিয়াবি ও দ্বীনি জীবন সুন্দর ও পরিশুদ্ধ হবে। মৃত্যুর পরেও তাদের নেক আমলের সাওয়াব তুমি পেতে থাকবে অনন্তকাল ধরে।

একইসাথে এটি প্রত্যেক ইসতিগফার ও তাওবার সময় একটি নতুন নিয়তের প্রতি পথনির্দেশ করে। তা হচ্ছে সন্তানসন্ততি সৎ ও নেককার হওয়ার নিয়ত করা। ফলে তোমার বয়স দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং তুমি দুটি জীবন লাভ করবে। একটি নিজের জীবন, আরেকটি সন্তানের সততার মাঝে বেঁচে থাকার জীবন। তবে দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, এই নিয়তটি অধিকাংশ ইসতিগফারকারী করে না। চরম ভাগ্যবান লোক ছাড়া এ নিয়ত করার সৌভাগ্য তেমন কারও হয় না।

ইবাদত যত বেশি হয়, তার উপকারিতা তত ব্যাপক হয়। এভাবে একসময় উপকারিতার এই পরিধি সন্তানদের সীমানা পেরিয়ে প্রতিবেশীদেরও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

২৭৯. আল-হাসান আল-বসরি, ইবনুল জাওজি : পৃ. ৫৯।

এর চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়েছেন মুহাম্মাদ বিন মুনকাদির ﵀। তাই তিনি বলেছেন :

'আল্লাহ তাআলা মুমিনের সন্তান, সন্তানদের সন্তানদের হিফাজত করেন তার বাড়ি এবং আশপাশের বাড়িঘর সুরক্ষিত রাখেন। ফলে তারা যতক্ষণ প্রকৃত মুমিনদের মাঝে বসবাস করে, ততক্ষণ তারা সুস্থতা ও নিরাপত্তার মধ্যে বসবাস করে।'[২৮০]

যেহেতু তারা আল্লাহর বিশেষ হিফাজত ও তত্ত্বাবধানে থাকে, তাই তাদের অন্তর অন্যদের মতো চিন্তা-পেরেশানি ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত থাকে। এসব নিশ্চিন্ত-মনের অধিকারীদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন কাব কুরাজি ﵀ ছিলেন অন্যতম। মদিনায় তার অঢেল সম্পদ ছিল। একদিন তিনি নতুন করে আরও কিছু সম্পদের মালিক হলেন। তখন তাকে বলা হলো, 'সন্তানদের জন্য কিছু গচ্ছিত রাখুন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'না, এগুলো (কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করার মাধ্যমে) আমি আমার জন্য রবের কাছে গচ্ছিত রাখব। আর আমার সন্তানদের জন্য আমার রবকেই গচ্ছিত রেখে যাব।'[২৮১]

বাস্তবেই তাদের সন্তানদের আল্লাহ হিফাজত করেন। তাদের জীবদ্দশাতেও, মৃত্যুর পরেও। পিতার নেক আমলের কারণে সন্তান উপকৃত হওয়ার এমনই একটি ঘটনা আবু হামিদ গাজালি ﵀ উল্লেখ করেছেন :

বর্ণিত আছে যে, ইমাম শাফিয়ি ﵀ মিসরে জীবনের শেষ রোগে যখন আক্রান্ত হলেন, তখন সন্তানদের বললেন, 'আমার মৃত্যুর পর অমুককে আমায় গোসল করাতে বোলো।' মৃত্যুর পর খবর পেয়ে লোকটি আসলেন। এসেই বললেন, 'আমার কাছে ইমামের ডায়েরিটা আনো।' ডায়েরিতে দেখলেন, ইমাম শাফিয়ির ওপর সত্তর হাজার দিরহাম কর্জ আছে। লোকটি সে কর্জ পরিশোধের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে নিলেন এবং তা আদায় করে দিলেন। অতঃপর বললেন,

২৮০. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৩৭৯।
২৮১. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ৫/৬৮।

'এটাই তাঁকে আমার গোসাল করানো (অর্থাৎ তিনি গোসল করানো বলতে কর্জ পরিশোধ করার কথাই বলেছিলেন)।[২৮২]

আবু সাইদ আল-ওয়ায়িজ বলেন, 'যখন আমি মিসর গেলাম, তখন সেই লোকটির (যিনি ইমাম শাফিয়ির কর্জ পরিশোধ করে দিয়েছিলেন) বাড়ির খোঁজ করলাম। লোকজন আমাকে লোকটির বাড়ি দেখিয়ে দিল। সেখানে গিয়ে আমি তার উত্তরপুরুষদের একটি দল দেখতে পেলাম। তাদের সবার মধ্যে নেককার ও ভালো মানুষ হওয়ার আলামত স্পষ্ট দেখতে পেলাম। তখন আমি মনে মনে বললাম, 'ওই লোকটির বরকতে এদের মাঝে সততা ও উত্তমতার গুণ এসেছে।' আমার এমন ধারণার পেছনে শক্ত যুক্তি আছে। হ্যাঁ, সুরা কাহফের এই আয়াতটিই তার প্রমাণ :

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

'আর তাদের দুজনের পিতা ছিলেন নেককার।'[২৮৩]-[২৮৪]

---

২৮২. এখানে ইমাম শাফিয়ির নেক আমলের বিনিময়ে সন্তানদের এ উপকার হয়েছে যে, তিনি পৃথিবীতে এমন ভক্ত রেখে গিয়েছেন, যিনি অকুণ্ঠচিত্তে তার কর্জ পরিশোধ করে দিয়েছেন। অন্যথায় এ কর্জ তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকেই পরিশোধ করতে হতো, বিধায় সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পদের পরিমাণ কম হতো। (-অনুবাদক)

২৮৩. সুরা আল-কাহফ, ১৮ : ৮২।

২৮৪. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ৩/২৫১।

সময়ের বরকত

সফল লোকদের কয়েক দিনের ফসল অন্যদের কয়েক বছরের ফসলের সমান। তাদের দৃষ্টিতে সময়ের চেয়ে কাজ বেশি। তাই তারা বিশ্রামের সময়গুলোও দাওয়াতের কাজে ব্যয় করেছেন এবং রাতের সময়গুলোকে দিনের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ব্যয় করেছেন। ফলে তারা এমন স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন, যেখানে গাফিলরা পৌঁছাতে পারেনি। তাদের এ অবস্থান দেখে ঘুমন্তদের আফসোসের অন্ত নেই।

এমন সফল লোকদের কয়েকটি নমুনা দেখে নাও :

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি ﵀

৬০৬ হিজরিতে মাত্র ৬৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু এ অল্প সময়ে তিনি প্রায় ২০০ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে ৩০ খণ্ডের প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থটিও আছে।

ইমাম নববি ﵀

৬৭৬ হিজরিতে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। প্রতিদিন তিনি তাঁর শাইখদের ১২টি দারস পাঠ করতেন এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও পরিমার্জন করতেন। দিনে তিনি কেবল একবারই পানাহার করতেন সাহরির সময়। তাই তো তিনি আমাদের জন্য রচনার এমন সমাহার রেখে গিয়েছেন, যেগুলোকে তাঁর জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখা হলে প্রতিদিন চারটি করে পুস্তিকা পড়ে!

ইমাম ইবনে তাইমিয়া ﵀

৭২৮ হিজরিতে মাত্র ৬৭ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। ইবনে শাকির কাতবি তাঁর জীবনীতে লিখেন : তাঁর লিখিত কিতাবের সংখ্যা প্রায় ৩০০ খণ্ড। ইমাম জাহাবির কথা অনুযায়ী তিনি প্রায় ৫০০ খণ্ড কিতাব লিখেছেন। তবে তাঁর রচনাসম্ভার সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিয়েছেন হাফিজ ইবনে রজব হাম্বলি ﵀। 'তাবাকাতুল হানাবিলা'য় তিনি লিখেন, তাঁর রচনাবলির সংখ্যা আধিক্যের সীমা অতিক্রম করেছে। ফলে তার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়।

তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, আমি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀-এর কাজকর্ম, কথা ও লিখনীর মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি লক্ষ করেছি। তিনি একদিনে যা লিখতেন, তা অনুলিপিলেখকের লিখতে এক সপ্তাহ বা তার চেয়ে বেশি সময় লেগে যেত!

হাফিজ ইবনুদ দুনইয়া ﵀

২৮১ হিজরিতে তিনি মাত্র ৭৩ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। এ সময়ে তিনি রচনা করেছেন এক হাজার কিতাব।

অনুরূপভাবে ইবনে আসাকির ﵀ রচনা করেছেন ৮০ খণ্ডের এক বিশাল ইতিহাসগ্রন্থ। আবু মুহাম্মাদ আলি বিন হাজম ﵀ রচনা করেছেন ৪০০ খণ্ড কিতাব, যার প্রতিটি খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮০ হাজার! ইবনে শাহিন রচনা করেছেন ৩৩০টি কিতাব, যার মধ্যে এক হাজার পারার একটি বিশাল তাফসিরগ্রন্থ ও ১৫০০ পারার একটি সুবিশাল হাদিসগ্রন্থ আছে!

শুধু আগের যুগেই নয়, এখনকার যুগেও তাদের প্রকৃত অনুসারীগণ বিদ্যমান আছে। বান্না ﵀-এর কিছু ছাত্রদের তাদের মধ্যে গণ্য করা যায়। তাদের একজন সম্পর্কে বলা হয়েছে :

অল্পসংখ্যক মানুষই জানে যে, ইখওয়ানের একজন দায়ি তার বৃহস্পতিবার আসরের সময় দাওয়াতি কাজের উদ্দেশ্যে বের হতেন। অতঃপর ইশার সময় তিনি মিনইয়া শহরে লোকদের ওয়াজ করতেন। জুমআর সময় তিনি খুতবা দিতেন মানফালুতে। আসরের সময় লেকচার দিতেন আসিউতে। ইশার পর

ওয়াজ করতেন সোহাজ শহরে। অতঃপর প্রতিটি পথ পাড়ি দিয়ে প্রশান্তচিত্তে এবং এ কাজের তাওফিক পাওয়ার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করতে করতে ফিরে আসতেন নিজের শহরে। এত কষ্টকর সফরের পরেও তিনি যে প্রশান্তি অনুভব করতেন, যা কেবল তারাই বুঝতে পারত, যারা তার কথা মনোযোগ সহকারে শুনত।

প্রিয় ভাই, সফল লোকদের গল্প পড়ে শেষ করেছ তো? তাহলে এখন নিশ্চয় তোমার মাঝে একপ্রকার বিস্ময় ও হতভম্বতা কাজ করছে। হয়তো তুমি তাদের স্তরে পৌঁছাতে চাও। পুরোপুরি না হলেও অন্তত অর্ধেক বা দশ ভাগের একভাগ হলেও পৌঁছাতে চাও। তবে তোমার অভিযোগ হচ্ছে, তোমার সময় দ্রুতই ফুরিয়ে যায়। তোমার আজকের ফলাফল গতকালের মতো শূন্য। আগামীকালের ফলাফলও আজকের মতো শূন্য। তোমার কাছে মাসের স্থায়িত্ব দিনের মতো। দিনের স্থায়িত্ব ঘণ্টার মতো।[২৮৫] এই যদি হয় তোমার অবস্থা, তাহলে নিচের পথ্যগুলো সেবন করে দেখতে পারো :

প্রথম পথ্য : টেকসই নিয়ত

এমন কোনো কাজ করবে না, যার সাথে উত্তম নিয়ত নেই। এ ব্যাপারে মালিক বিন দিনার ﷺ কলবের মর্যাদা বৃদ্ধিকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন :

'মুমিনের নিয়ত তার আমলের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।'[২৮৬]

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন কাজে তোমার সময় বেশি ব্যয় হয়? নিশ্চয় তা ঘুম, কাজ ও পানাহার ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই তিন কাজে নিয়তের পথ্য সেবন করার পদ্ধতি শিখে নাও :

২৮৫. ২৯ নং ফায়দা : সময়ের অপচয়ের ব্যাপারে কবি মাহমুদ গুনাইম সবচেয়ে সুন্দর কথাটি বলেছেন। তার থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া একটি সময়ের ব্যাপারে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় তিনি বলেন : 'হে সময়, তুমিই প্রথম সময় নয়, যাকে আমি নষ্ট করেছি। আরে আমি তো বছরের পর বছর নষ্ট করে এসেছি। কয়েকটি ক্ষণ নষ্ট করার জন্য নিজেকে আর কী তিরস্কার করব!'

২৮৬. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/২৬১।

• ঘুম : ঘুমের ব্যাপারে তোমার প্রতি আমার উপদেশ হচ্ছে, ফজরের নামাজ এবং তাহাজ্জুদের শক্তি অর্জনের নিয়তে তুমি প্রতিদিন রাতে ঘুমাবে। যেমনটি মুআজ বিন জাবাল ﵁ করতেন। তিনি রাতের প্রথম অংশে ঘুমাতেন। অতঃপর নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে বলতেন, 'আমি তাহাজ্জুদের জন্য যেভাবে সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখি, সেভাবে ঘুমের বিনিময়েও সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখি।'[২৮৭]

• কাজ : কাজ করার সময় মনের মধ্যে রাসুল ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি উপস্থিত রাখবে :

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُؤْمِنَ الْمُحْتَرِفَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পেশাজীবী মুমিন বান্দাকে ভালোবাসেন।'[২৮৮]

• পানাহার : পানাহার করার সময় এর মাধ্যমে ইবাদতের শক্তি অর্জনের নিয়ত করবে। যেমনটি আব্দুর রহমান বিন আসওয়াদ ﵀ করতেন। তিনি নিয়ত ছাড়া একটি রুটিও খেতেন না। তার ছাত্রকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'তিনি রুটি খাওয়ার সময় কীভাবে নিয়ত করতেন?' ছাত্র উত্তর দিলেন, 'তিনি যথারীতি খাবার গ্রহণ করতেন। অতঃপর খাওয়ার কারণে যদি নামাজ পড়তে অলসতা অনুভব করতেন, তখন খানা হালকা করে দিতেন, যাতে পূর্ণ উদ্যমে নামাজ পড়তে পারেন। আবার কম খাবার খাওয়ার কারণে একসময় তিনি দুর্বল হয়ে পড়তেন। তখন শক্তি অর্জনের জন্য খাবার গ্রহণ করতেন। অর্থাৎ তিনি ইবাদতের জন্যই খাবার গ্রহণ করতেন এবং ইবাদতের জন্যই খাবার ত্যাগ করতেন।'[২৮৯]

পরিবারের খাবার-দাবারের ব্যবস্থা গ্রহণের সময় নিচের হাদিসটি স্মরণ করবে :

---

২৮৭. সহিহুল বুখারি : ৪০৮৬।

২৮৮. শুআবুল ঈমান : ৮৯৩৪, জয়িফুল জামি : ১৭০৪ (হাদিসটি জয়িফ)

২৮৯. বুসতানুল আরিফিন : পৃ. ৩২।

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

'একটি দিনার তুমি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করেছ, আরেকটি দিনার দিয়ে কোনো গোলাম আজাদ করেছ, আরেকটি দিনার কোনো মিসকিনকে সদাকা করেছ, আরেকটি দিনার তুমি নিজের পরিবারের জন্য ব্যয় করেছ—এগুলোর মধ্যে যে দিনারটি তুমি পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করেছ, তার বিনিময়ে সবচেয়ে বেশি সাওয়াব পাবে।'[২৯০]

এমনকি স্ত্রীর সাথে তোমার জৈবিক চাহিদা পূরণ করার সময়েও নিয়ত করবে। এখানে উমর ﵁-এর শিখিয়ে দেওয়া নিয়তটি করতে পারো। তিনি বলেন, 'আমি এ আশা নিয়ে স্ত্রীর সাথে সঙ্গমরত হই যে, এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা একটি প্রাণ সৃষ্টি করবেন, যে তাঁর তাসবিহ ও জিকির করবে।'[২৯১]

আল্লাহর ফরজ বিধানসমূহ যথাযথরূপে আদায় করার পর এ বিষয়গুলোর প্রতি যদি একটু যত্নবান হও, তাহলে তোমার মাঝে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখতে পাবে ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় পথ্য : একের ভেতর দুই

এখানে আমি তোমাকে চারজন মনীষীর গল্প শোনাব, যাদের গল্প পড়ে তুমি শিখে নিতে পারবে, কীভাবে একই সময়ে দুটি কাজ করে দুটি বিনিময় অর্জন করে নেওয়া যায়।

আবু বকর বিন খাইয়াত নাহবি

তিনি সব সময় পড়তেন। এমনকি পথচলার সময়েও পড়া অব্যাহত রাখতেন। এ জন্য অনেক সময় তিনি খাদে পড়ে যেতেন অথবা কোনো জন্তু এসে তাকে আঘাত করত।[২৯২]

---

২৯০. সহিহ মুসলিম : ৯৯৫।

২৯১. আদ-দারারি ফি জিকরিয় জারারি : পৃ. ১৫।

২৯২. কিমাতুজ জামানি ইনদাল উলামা : পৃ. ৪৫-৪৬।

আল-ফাতহ বিন খাকান

তিনি জামার আস্তিন বা মোজার মধ্যে কিতাব রাখতেন। মুতাওয়াক্কিলের সামনে থেকে যখনই প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য অথবা নামাজ পড়ার জন্য উঠতেন, তখন কিতাব বের করে পড়তে পড়তে উদ্দিষ্ট জায়গায় গমন করতেন। ফিরে আসার সময়েও একই কাজ করতেন। অনুরূপভাবে মুতাওয়াক্কিল যখন কোনো কাজের জন্য বের হতেন, তিনি আস্তিন বা মোজা থেকে কিতাব বের করে মুতাওয়াক্কিলের মজলিশেই পড়া শুরু করতেন। মুতাওয়াক্কিলের ফিরে আসা পর্যন্ত পড়া অব্যাহত রাখতেন।[২৯৩]

সালাব আহমাদ বিন ইয়াহইয়া শাইবানি

তার মৃত্যুর কারণ ছিল, এক জুমআর দিন তিনি আসরের পর জামে মসজিদ থেকে বের হলেন। তিনি একটু বধির টাইপের ছিলেন। তার ওপর তিনি হাতে একটি কিতাব নিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তা পড়তে পড়তে পথ চলছিলেন। তখনই পেছন থেকে একটি ঘোড়া এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিল। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে গর্ত থেকে উদ্ধার করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। সে সময় তার মুখ থেকে উহ আহ শব্দ বের হচ্ছিল। পরের দিন তিনি মারা গেলেন।[২৯৪]

আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান

তার ছেলে বর্ণনা করেন, এক সামরিক কনভয়ে আমরা আমাদের পিতার সাথে চলছিলাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, 'ওই গাছটি পর্যন্ত "সুবহানাল্লাহ" পাঠ করতে করতে চলো। আমরা তাসবিহ পাঠ করতে করতে সে গাছটির নিকট পৌছালাম। তারপর আমাদের সামনে আরেকটি গাছ দৃষ্টিগোচর হলে তিনি আমাদের বললেন, 'ওই গাছটিতে পৌছানো পর্যন্ত "আল্লাহু আকবার" বলতে থাকো।' আমরা তাকবির বলতে বলতে পথ চললাম। আমাদের সাথে প্রায় সময় তিনি এমন করতেন।[২৯৫]

---

২৯৩. কিমাতুজ জামানি ইনদাল উলামা : পৃ. ৩৯।
২৯৪. ওয়াফায়াতুল আইয়ান ওয়া আবনাউ আবাইজ জামান : ১/১০৪।
২৯৫. আজ-জুহদ, আহমাদ : ১/১৮৬।

এদের জীবনী থেকে শিখে নাও, কীভাবে সময়ের মূল্যায়ন করতে হয়, কীভাবে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে হয়। এ শিখে নেওয়া খুবই জরুরি। কারণ, সময়ের চেয়ে কর্তব্য বেশি এবং জীবনের সর্বশেষ যাত্রাটি কখন শুরু হবে, তা তোমার অজানা। আকস্মিকভাবে তা এসে উপস্থিত হবে। তখন আর সময় পাওয়া যাবে না।

তৃতীয় পথ্য : কম ঘুমানো[২৯৬]

হাম্মাম বিন হারিস ﵀ দুআ করতেন : 'হে আল্লাহ, আমার জন্য অল্প ঘুম যথেষ্ট করুন। আমাকে আপনার ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ করার তাওফিক দান করুন।'

তিনি খুব অল্প সময়ের জন্য ঘুমাতেন। তাও বসাবস্থায়।[২৯৭]

খেয়াল করো, তার মাঝে কেমন নামের প্রভাব পড়েছে? হাম্মাম নামের প্রভাবে তার মাঝে রবকে সন্তুষ্ট করার 'হাম্ম' তথা চিন্তা কাজ করেছে। 'হারিস' নামের প্রভাবে তার মাঝে আল্লাহর ইবাদতের 'হারস' তথা ফসল উৎপাদনের প্রবণতা কাজ করেছে। ফলে রাতদিন তিনি আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের কাজে ব্যস্ত থেকেছেন। শুধু তিনিই নন, আমাদের অনেক সালাফ এভাবে ঘুমকে উপেক্ষা করে ইবাদত করেছেন, কাজ করেছেন। তারা অপারগতাবশত কিছুক্ষণের জন্য ঘুমাতেন মাত্র।

তাদের কম ঘুমানো নির্দেশ করে, তারা দিনেরাতে কাজে ব্যস্ত থাকতেন। এ ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দিক ﵁-এর অভিজ্ঞতার কথাটি শোনো :

---

২৯৬. ৩০ নং ফায়দা : চারটি কারণে মানুষের ঘুমের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয়। ১. জন্মগত স্বভাবের ভিন্নতা : কিছু মানুষের ঘুম কম হয়, কিছু মানুষের বেশি হয়। তাই কারও জন্য দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট, কারও জন্য আট ঘণ্টা ঘুম যথেষ্ট হয়। ২. পরিবেশের ভিন্নতা : গরম আবহাওয়ার দেশসমূহের ঘুমের পরিমাণ ঠান্ডা আবহাওয়ার দেশসমূহের চেয়ে ভিন্ন হয়। ব্যস্ত এলাকা এবং প্রশান্ত এলাকার ঘুমের পরিমাণে তারতম্য হয়। ৩. বয়সের ভিন্নতা : বৃদ্ধ লোকদের ঘুম যুবকদের ঘুমের চেয়ে তুলনামূলক কম হয়। ৪. পেশার ভিন্নতা : যারা কায়িক শ্রম করে, তাদের ঘুমের প্রয়োজন তাদের চেয়ে বেশি যারা চিন্তাভিত্তিক শ্রম করে অথবা প্রকাশনাজগতে কাজ করে।

২৯৭. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/২১।

'আল্লাহর কসম, আমি ঘুমিয়েছি ঠিক, তবে স্বপ্ন দেখিনি (গভীর ঘুমে তলিয়ে পড়িনি)। (তা সত্ত্বেও) কোনো বিষয়ে চিন্তা করার পর তা থেকে উদাসীন থাকিনি। আমি পথের ওপর অটল ছিলাম, কখনো বিচ্যুত হইনি।'[২৯৮]

উস্তাজ রাশিদ তাঁর কথার ব্যাখ্যা করে বলেন :

অর্থাৎ রিদ্দার যুদ্ধ, বিভিন্ন ভূখণ্ড বিজয় এবং রাষ্ট্রের অবকাঠামো সুসংগঠিত করার কাজে তিনি এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে, ভালোভাবে ঘুমানোর ফুরসত তিনি পাননি। নবিজি ﷺ-এর অফাতের পর তাঁর সত্যনিষ্ঠায় আরও প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। যার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এমন চৈতন্য দান করেছেন যে, উদাসীনতা, বিস্মৃতি ও অমনোযোগিতা তাঁকে আক্রান্ত করতে পারেনি।[২৯৯] তিনি তাঁর সময়কে আল্লাহর রাস্তায় কুরবান করেছেন, তাই কম ঘুমানো এবং বিশ্রামহীনতা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাকে সজাগতা ও চৈতন্য দান করেছেন।

একটি ভুল ধারণা

কেউ কেউ মনে করে যে, রাতে দীর্ঘক্ষণ ঘুমালে সকালে খুব চাঙাভাব ও কর্মোদ্দীপনা নিয়ে জাগ্রত হওয়া যাবে। ফলে ফজরের নামাজের সময়টিও সে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়। কিন্তু সে জানে না, এর কারণে তার মাঝে পুরো দিনের জন্য অলসতা চলে আসে। কেননা, বরকতের ভান্ডারের একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা। তা ছাড়া ফজরের নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তির ব্যাপারে হাদিসে এসেছে :

أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ

'সে অলসতা ও কলুষতাপূর্ণ মন নিয়ে সকালে উপনীত হয়।'[৩০০]

---

২৯৮. আল-খারাজ, আবু ইউসুফ : ১/২১।

২৯৯. আর-রাকায়িক : পৃ. ২১।

৩০০. ৩১ নং ফায়দা : সহিহ হাদিসে আছে : 'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁঠ দিয়ে দেয়। প্রতি গিঁঠে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমিয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহর জিকির (ঘুম থেকে ওঠার দুআ) পড়ে, তখন একটি গিঁঠ খুলে যায়। এরপর অজু করলে আরেকটি গিঁঠ খুলে যায়। এরপর নামাজ পড়লে অপর গিঁঠটিও খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথায় তার সকাল হয় কলুষতা ও অলসতা সহকারে।' (সহিহুল বুখারি : ১১৪২)

হে ঘুমকাতুরে চোখ, তুমি জাগ্রত চোখের খবর জানো না! হায়, যদি তুমি বিনিদ্র থাকার স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করতে পারতে!

বিনিদ্র থাকার যে আনন্দ ও স্বাদ, তা যদি আমি প্রকাশ করতে চাই, তাহলে বলব :

যারা জাগ্রত থাকে, তাদের অন্তরসমূহে প্রবাহিত হয় জান্নাতের মৃদুমন্দ বাতাস। ঘুমের বিনিময়ে তারা লাভ করে মজাদার অনিদ্রা, যে অনিদ্রায় তারা ক্লান্ত হয় না। এ অনিদ্রায় যে স্বাদ ও আনন্দ পাওয়া যায়, তা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। অধিক নিদ্রা সীমিত আনন্দ উপভোগের এই দুনিয়াতেও নিন্দনীয়, তাহলে অসীম আখিরাতে তার শাস্তি কী হবে, তা তো সহজেই অনুমেয়।

আর আমাদের পার্শ্বদেশ কেনই বা দূরে থাকবে না ধ্বংস ও লজ্জার বিছানা থেকে!?

হে গাফিলতির দীর্ঘ নিদ্রায় নিমজ্জিত, অধিক নিদ্রা তোমার আফসোসের কারণ হবে। মৃত্যুর পর যখন কবরে শায়িত হবে, তখন দীর্ঘ সময় ধরে ঘুমানো যাবে। যেখানে তোমার জন্য সজ্জিত হবে তোমার পাপ অথবা পুণ্যের শয্যা।

হাদিসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববি ﷺ বলেন, হাদিস থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি ঘুম থেকে ওঠার পর দুআ, অজু এবং নামাজ—এই তিনটির কোনো একটিই ছেড়ে দেবে, তার সকাল কলুষতা ও অলসতা সহকারে হবে। (শারহুন নববি আলা সহিহি মুসলিম : ৬/৬৭)
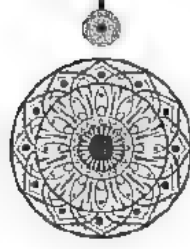
আসমান ও জমিনের বরকত

আমাদের অর্থনৈতিক মন্দা ও রিজিকের বরকত কমে যাওয়ার কারণ আল্লাহর সাথে সম্পর্কের অবনতি এবং তাঁর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করার মাধ্যমে তাঁর সাথে শত্রুতা করা। তাই আমাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করতে হলে আমাদের আশ্রয় নিতে হবে উত্তম আমলের, যা আমাদের জন্য বরকত ও কল্যাণের ভান্ডার উন্মুক্ত করে দেবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ইমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের জন্য খুলে দিতাম।'[৩০১]

হে ভাই, এটা পত্রিকায় প্রকাশিত কোনো সংবাদ নয়, কোনো রাজনৈতিক নেতার অনুমোদন নয়, কোনো মানুষের দেওয়া প্রতিশ্রুতি নয়—যার ভুল ও শুদ্ধ দুটাই হতে পারে; বরং এটা আল্লাহর দেওয়া ওয়াদা, যিনি কখনো ওয়াদার বরখেলাফ করেন না এবং তাঁর নীতি, যা কখনো পরিবর্তন হয় না। আয়াত থেকে বোঝা গেল, বরকত একটি তালাবদ্ধ সিন্দুকের ভেতর থাকে। তার চাবির একমাত্র মালিক তারই স্রষ্টা। আয়াতের প্রতি আরেকবার লক্ষ করো—আল্লাহ বলেছেন, 'আমি অবশ্যই খুলে দেবো...' এ থেকে প্রমাণিত হয়, বরকতের চাবিকাঠি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও হাতে নেই। তিনি সর্বশক্তিমান, জগতের কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে পারে না। তিনি প্রজ্ঞাবান। দেওয়া-না দেওয়া এবং ক্ষমা করা ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি সর্বোচ্চ প্রজ্ঞার পরিচয়

৩০১. সুরা আল-আরাফ, ৭ : ৯৬।

দেন। তোমার হাতে আসা খাবারের প্রতিটি লুকমা তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী তোমার হাতে আসে। তাঁর ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোনো রিজিক তোমার হাতে ওঠে না।

তোমাদের রিজিক বরাদ্দ আছে আসমানে

এ আয়াত তোমাকে জানায়, এ দুনিয়াতে যারা আছে, তাদের কেউই তোমার রিজিকের মালিক নয়। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও দরবারে নিজেকে রিজিকের জন্য লাঞ্ছিত করে লাভ নেই।

এ অধ্যায়ের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, আসমান ও জমিনের বরকত। আসমানের বরকত হচ্ছে বৃষ্টি। জমিনের বরকত হচ্ছে ফল ও উৎপাদিত শস্য। কারও মতে, আসমানের বরকত মানে দুআ কবুল হওয়া, আর জমিনের বরকত মানে প্রয়োজনসমূহ সহজে পূরণ হয়ে যাওয়া।

তবে এখানে বরকত শব্দটি আরও ব্যাপক। তা কল্যাণের সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, মানুষ দুনিয়াবি যত কল্যাণ লাভ করে, সবগুলো জমিন থেকে সৃষ্টি হয়, যেমন : অধিকাংশ উপকারী বিষয়সমূহ, অথবা আসমান থেকে নাজিল হয়, যেমন : বৃষ্টি, সূর্যের কিরণ, চাঁদের আলো, তারার সৌন্দর্য ও উপকারী বাতাসের বয়ে চলা।

বৃষ্টি না হলে এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আমাদের জন্য বৃষ্টি-প্রার্থনার নামাজ প্রবর্তন করেছেন আল্লাহ তাআলা। কেননা, বৃষ্টিহীনতা ও রিজিকের স্বল্পতা অধিক গুনাহের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। খালিস তাওবা ছাড়া এ দুটি রহিত হয় না। এ জন্যই বৃষ্টি-প্রার্থনার নামাজে অধিকহারে ইসতিগফার (আল্লাহর কাছে গুনাহ ক্ষমা চাওয়া) করাকে মুসতাহাব (অধিক পছন্দনীয়) সাব্যস্ত করা হয়েছে। এ জন্যই আমিরুল মুমিনিন উমর ﷺ যখন বৃষ্টি-প্রার্থনার জন্য বের হলেন, তখন নামাজ-দুআ না পড়ে কেবল ইসতিগফার পড়ে ফিরে আসলেন। এরপর লোকজন বৃষ্টিস্নাত হলো। লোকজন বলল, আমরা আপনাকে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে দেখলাম না যে? তিনি বললেন, আমি আকাশের উপকূল থেকে বৃষ্টি চেয়েছি, যেখান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করলেন :

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا - يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا

'অতঃপর বলেছি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের ওপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন।'[৩০২]

ইবাদত বরকতের চাবিকাঠি। গুনাহ পরিত্যাগ করা বৃষ্টি ও কল্যাণ বর্ষণের কারণ। গুনাহে লিপ্ত হওয়া রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। এর প্রমাণ রাসুল ﷺ- এর নিম্নোক্ত হাদিস :

لَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا

'কোনো জাতি যখন তাদের সম্পদের জাকাত দেওয়া ছেড়ে দেয়, তখন আসমান থেকে তাদের জন্য বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি চতুষ্পদ জন্তুগুলো না হতো, তাহলে তাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হতো না।'[৩০৩]

নববি বিদ্যালয়ের সুযোগ্য ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رضي الله عنه এই পাঠ খুব ভালোভাবে রপ্ত করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর যুগে অনাবৃষ্টির কারণসমূহের একটি কারণ চিহ্নিত করে বলেছেন, 'যখন পরিমাপে কম দেওয়া হয়, তখন বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হয়।'[৩০৪]

---

৩০২. সুরা নুহ, ৭১ : ১০-১১।

৩০৩. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০১৯, আল-মুজামুল কাবির : ১৩৬১৯, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৭/৯২।

৩০৪. গিজাউল আলবাব ফি শারহি মানজুমাতিল আদাব : ২/৪৪১।

গরিব আমির

আন্দালুসিয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এতে অতিষ্ঠ হয়ে জনগণ ইসতিসকা (বৃষ্টির জন্য বিশেষ উপায়ে প্রার্থনা) করার সিদ্ধান্ত নিল। আন্দালুসিয়ার তৎকালীন আমিরুল মুমিনিন আব্দুর রহমান নাসির বিচারপতি মুনজির বিন সাইদের নিকট বৃষ্টি-প্রার্থনার নামাজের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে দূত প্রেরণ করলেন। বিচারপতি প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার, এটা তো আমিরের দায়িত্ব, তিনি আমাকে কেন এই দায়িত্ব অর্পণ করলেন?' দূত বললেন, 'তিনি খুব ভেঙে পড়েছেন। এ সময়ে আল্লাহর ভয়ে ভীত তার চেয়ে আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। তিনি একাকী হয়ে গেছেন। অনাড়ম্বর পোশাক পরিধান করে নিজের গুনাহ স্বীকার করে আল্লাহর দরবারে অনবরত কান্নাকাটি করছেন। বলছেন, "অপরাধী আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করছে। আপনি তো জানেনেই, আমার কারণেই প্রজাদের ওপর আজাব এসেছে। আপনি ন্যায়বিচারকারী। আমার আবেদন মেনে নিলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না।"' আমিরের এমন অবস্থার কথা শুনে বিচারপতির মুখে আনন্দের আভা ফুটে উঠল। তিনি স্বীয় খাদিমকে বললেন, 'বেটা, আমার রেইনকোটটি নিয়ে আমার সাথে আসো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সিঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন।' অপর এক বর্ণনায় আছে, বিচারপতি বলেছেন, 'ওয়াল্লাহি, তোমাদের ওপর করুণা করা হবে এবং তোমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কারণ, পৃথিবীর প্রতাপশালী ব্যক্তি যখন আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়, তখন আকাশের প্রতাপশালী সত্তার মন দয়া ও করুণায় ভরে ওঠে।' এই বলে তিনি বের হলেন। অতঃপর তার কথা অনুযায়ী দুর্ভিক্ষের অবসান ঘটিয়ে নামল রহমতের বৃষ্টি।[৩০৫]

---

৩০৫. তারিখুল ইসলাম : ২৫/২৪৫।

বরকতের প্রকারদ্বয়

বরকত মানে প্রবৃদ্ধি। বরকত মানে কোনো বিষয় তোমার ধারণা এবং অনুমানের চেয়ে বেশি পাওয়া। তা দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার : প্রদান করার মাধ্যমে বরকত

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, 'ইমাম আহমাদ ﷺ তাঁর মুসনাদে একটি হাদিসের আলোচনায় বলেছেন, "আমি বনু উমাইয়ার একটি ধনভান্ডারে খেজুর-বিচির সমান একটি গমের বিচি দেখেছি। যে থলির মধ্যে সেটা সংরক্ষিত ছিল, তার ওপর লেখা ছিল : ন্যায়বিচারের যুগে এ ধরনের গম উৎপন্ন হতো।"'[৩০৬]

পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর ন্যায়পরায়ণতার যুগ ছিল মুজাদ্দিদে ইসলাম উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর খিলাফতকাল। সে যুগ সম্পর্কে মুসা বিন আইয়ুন ﷺ বলেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর খিলাফতের সময় আমরা যে মাঠে ছাগল চরাতাম, সে একই মাঠে বন্য হিংস্র জন্তুরা বিচরণ করত। একদিন আমাদের ছাগলপালে বাঘ হানা দিল। তখন আমরা মন্তব্য করলাম, "ভালো মানুষটি বোধহয় আর নেই।"' বর্ণনাকারী বলেন, মুসা বিন আইয়ুনসহ আরও অনেকে আমাকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তাদের প্রত্যেকে বলেছেন, এ ঘটনা থেকে মানুষে যেমনটি ধারণা করেছিল, ঠিক তা-ই হয়েছিল। সেদিন উমর বিন আব্দুল আজিজের মৃত্যু হয়েছিল।[৩০৭]

দ্বিতীয় প্রকার : রহিত করার মাধ্যমে বরকত

এই বরকতের ধরন হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তোমার ব্যয়ের খাত কমিয়ে দেন। এটি একটি সূক্ষ্ম বরকত। তোমার আয় হয়তো কম, তবে ব্যয়ের খাত কম হওয়ার কারণে সে কম আয় তোমার জন্য অধিক। এই বরকত তোমার পকেটে টাকা বৃদ্ধি করে না ঠিকই; কিন্তু তোমার জন্য ব্যয়ের পথ রুদ্ধ করে রাখে। যেমন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে সুস্থ রাখেন; ফলে ডাক্তার ও চিকিৎসার খরচ

---

৩০৬. আদ-দাউ ওয়াদ দাওয়া : পৃ. ৬৫।

৩০৭. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৫/২৫৫।

তোমার বেঁচে যায়। এমন মারাত্মক ঘটনা তোমার সাথে সংঘটিত হয় না, যার জন্য তোমার প্রচুর টাকা খরচ হয়।

যে পাঠ ভুলে থাকা যায় না

রাসুল ﷺ-এর দুআর বরকতে হাকিম বিন হিজাম ﵁-কে আল্লাহ তাআলা উভয় প্রকারের বরকত দান করেছিলেন। এই বরকত লাভের সবক তিনি গ্রহণ করেছিলেন নববি মাদরাসা থেকে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন :

আমি রাসুল ﷺ-এর নিকট চাইলাম। তিনি দান করলেন। অতঃপর আবার চাইলাম। তিনি দান করলেন। অতঃপর আবার চাইলাম। এবার তিনি দান করার পর বললেন :

> يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا المَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى
>
> 'হে হাকিম, এই সম্পদ শ্যামল সুস্বাদু। যে ব্যক্তি প্রশস্ত অন্তরে (লোভ ব্যতীত) তা গ্রহণ করে, তার জন্য তা বরকতময় হয়। আর যে ব্যক্তি অন্তরের লোভ নিয়ে তা গ্রহণ করে, তার জন্য তা বরকতময় হয় না। যেন সে এমন ব্যক্তির মতো, যে খায়; কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। ওপরের হাত নিচের হাত হতে উত্তম।'[৩০৮]

এখানে রাসুল ﷺ সম্পদ সম্পর্কে হাকিম বিন হিজাম ﵁-কে—যিনি সেসব লোকের মধ্যে ছিলেন, যাদেরকে রাসুল ﷺ ধন-সম্পদ দিয়ে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চাইছিলেন—মাল সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। এই হাদিসে তিনি ধন-সম্পদকে সবুজ বলে আখ্যায়িত করেছেন, যা তার বাইরের সৌন্দর্য দিয়ে দৃষ্টি ও অন্তরসমূহকে আকৃষ্ট করে। একইসাথে তা সুস্বাদুও। ফলে তা ভোগ করতেও মজা লাগে। মোটকথা, সম্পদ বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়

---

৩০৮. সহিহুল বুখারি : ১৪৭২, সহিহ মুসলিম : ১০৩৫।

দিক দিয়ে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এ কারণে তা মানুষকে সহজেই ফিতনায় আক্রান্ত করে ফেলে।

এই হাদিসে রাসুল ﷺ-এর ভাষার অলংকার দেখো। আরবিতে মাল (الْمَالُ) শব্দটি পুংলিঙ্গবাচক হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য স্ত্রীলিঙ্গবাচক দুটি গুণ (خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ) ব্যবহার করেছেন। এমন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তিনি এখানে মাল বলে দুনিয়াকেই বোঝাতে চেয়েছেন। আবার দুনিয়াকে মাল বলার কারণ হচ্ছে, বান্দা দুনিয়াতে সবচেয়ে যে বস্তুটির অন্বেষণ করে, তা হচ্ছে মাল। আর রাসুল ﷺ-এর উপদেশের সারমর্ম হচ্ছে, মাল যদিও ফিতনা ও প্রভাব বিস্তারকারী, তা সত্ত্বেও কেউ যদি যাচনা ও লোভ ব্যতীত মাল গ্রহণ করে, আল্লাহ তাআলা তার মধ্যে বরকত দান করেন। এই বরকতের দুটি ধরন রয়েছে :

প্রথম ধরন : যাচনা ও লোভ ব্যতীত অর্জিত সম্পদ তার মালিকের জন্য ফিতনার কারণ হয় না। তাই এ সম্পদের কারণে তার দুনিয়া ও আখিরাতের কোনো ক্ষতি হয় না। বরং তার প্রয়োজন পূরণে ও দ্বীনকে বিশুদ্ধ রাখতে তাকে সহায়তা করে।

দ্বিতীয় ধরন : এ সম্পদ থেকে অল্প পরিমাণ সম্পদই তোমার জন্য যথেষ্ট হয়। ফলে এর চেয়ে বেশি অর্জনের প্রতি লোভ ও যাচনা করার বাসনা জাগে না।

রাসুল ﷺ-এর উপদেশ শোনার পরপরই হাকিম رضي الله عنه শপথ করলেন। ততক্ষণে নবুওয়াতের নুর তার লোভ-লালসার অন্ধকারকে দূর করে দিয়েছিল। তাই স্পষ্ট ও দৃঢ় কণ্ঠে তিনি বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, যে মহান সত্তা আপনাকে সত্য দিয়ে প্রেরণ করেছেন—তাঁর কসম খেয়ে বলছি, আজকের পর থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত কারও কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করব না।'

হাকিম তাঁর ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছেন। তাঁর বয়স ষাট অতিক্রম করার পরেও তিনি কারও কাছ থেকে কোনো সম্পদ গ্রহণ করেননি। আবু বকর সিদ্দিক رضي الله عنه তাঁকে অনুদান দেওয়ার জন্য ডাকতেন; কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে

অস্বীকার করতেন।[৩০৯] আবু বকর ﷺ-এর পরে উমর ﷺ-ও তাঁর প্রাপ্য অনুদান তাঁকে দেওয়ার জন্য ডাকতেন; কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। ফলে একদিন উমর ﷺ জনতার সামনে বললেন, 'হে মুসলিম জনতা, আমি তোমাদের এই মর্মে সাক্ষী রাখছি যে, আমি হাকিম বিন হিজামের প্রাপ্য হক তাঁর সামনে পেশ করেছি; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন।'

এভাবে জনগণকে সাক্ষী করার মাধ্যমে উমর ﷺ হয়তো নিজ জিম্মা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন অথবা হাকিমকে তাঁর প্রাপ্য গ্রহণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাসুল ﷺ-এর পর থেকে হাকিম বিন হিজাম ﷺ কারও কাছ থেকে কোনো সম্পদ গ্রহণ করেননি। মুআবিয়া ﷺ-এর রাজত্বের দশ বছরের মাথায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি নিজের ওয়াদার ওপর অটল ও অবিচল ছিলেন।

রাসুল ﷺ-এর নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার কারণে আল্লাহ তাআলা তার সম্পদে অনেক বরকত দান করেছিলেন। মৃত্যুর সময় তার পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে ইমাম জুহরি ﷺ বলেন, 'অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। মৃত্যুর সময় তিনি কুরাইশের সর্বোচ্চ ধনীদের একজন ছিলেন।'[৩১০]

অপরদিকে, যে ব্যক্তি মনের চাহিদা ও লোভের বশবর্তী হয়ে সম্পদ গ্রহণ করে, তার মাল থেকে বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয়। ফলে রাসুল ﷺ-এর পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সে হয়ে যায় চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, যারা যতই খাবার গ্রহণ করুক,

---

৩০৯. ৩২ নং ফায়দা : বার্ধক্যের সময়ে আত্মমর্যাদাবোধ ধরে রাখা বেশ কঠিন। এ সময়ে কেউ যদি আত্মমর্যাদাবোধ ধরে রাখে, সেটা তার সততা ও উচ্চ মনোবলের নিদর্শন। এ জন্যই বলা হয়, বড় শিশুর দুধ ছাড়ানো খুব কঠিন। কবি বলেন :

'গাছের শাখাকে যদি তুমি সোজা করতে চাও, তা সোজা হয়ে যায়। কিন্তু শুকনো কাঠকে সোজা করা সম্ভব নয়। আদব ও শিষ্টাচার বাল্যকালে ব্যক্তির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে; কিন্তু বার্ধক্যের সময় আদব কোনো উপকার করতে পারে না।'

আরেক কবি বলেন :
'শিশুদের শিষ্টাচার শিখানো থেকে বিরত থেকো না। এতে যতই কষ্ট হোক। বুড়ো লোকদের শিষ্টাচার শিখাতে গিয়ে সময় নষ্ট করো না। আদব-শিষ্টাচার গ্রহণ করা থেকেও তারা বুড়ো হয়ে গিয়েছে।'

৩১০. উমদাতুল কারি : ৯/৫৩।

কখনো তৃপ্ত হয় না। কেননা, তারা জীবন বাঁচানোর জন্য খায় না; লোভ পূরণ করার জন্য খায়। যে ব্যক্তি লোভের কারণে সম্পদ গ্রহণ করে, তার অবস্থাও ঠিক এদের মতোই।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

আমার এক বন্ধু তার অর্জিত সকল সম্পদের একটি অংশ বের করে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতেন। বিয়ের পর থেকে তার স্ত্রীও এ কাজে তার সাথে শরিক হলেন। তাদের অবস্থা যতই করুণ ও কঠিন হোক না কেন, তাদের সম্পদ থেকে এ অংশটি তারা বের করে কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে কখনো ভুল করতেন না। এভাবে অনেক বছর কেটে গেল। একদিন স্বামী কাজের উদ্দেশ্যে বাইরের দেশে সফর করার মনস্থ করলেন। সফরের প্রস্তুতির জন্য অনেক খরচের প্রয়োজন দেখা দিল। এ সুযোগে প্রবৃত্তি ও শয়তান তাকে এবারের মতো কল্যাণমূলক কাজের অংশ বের না করে পুরো সম্পদ রেখে দেওয়ার প্ররোচনা দিল। ফলে তিনি এবার সেই নির্ধারিত অংশটি বের করলেন না।

আমার বন্ধুটি যথারীতি সফরে বেরিয়ে পড়লেন। এক জায়গায় তাকে রাতের খাবারের নিমন্ত্রণ করা হলো। জায়গাটি ছিল একটি ইউরোপীয় দেশের বনাঞ্চলে। তিনি খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য বের হয়ে দেখলেন, তার গাড়ির কাচ ভেঙে গেছে এবং তার বিশেষ ল্যাপটপটি চুরি হয়ে গেছে! তিনি খুবই আশ্চর্য হলেন, এই শান্ত পরিবেশে এবং সুনসান নীরব জঙ্গলে কে চুরি করতে পারে!

ল্যাপটপটি কেনার কয়েকদিনের মধ্যেই চুরি হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তার ওপর এমন অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদ আসার কারণ কী—এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তিনি পেলেন, যদি তিনি পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী সম্পদ থেকে কল্যাণমূলক কাজের অংশটি বের করতেন, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করতেন। বের করা অংশটির পরিমাণ চুরি হয়ে যাওয়া ল্যাপটপের মূল্যের এক-দশমাংশের চেয়েও কম ছিল! এ অল্প পরিমাণ দান থেকে বিরত থাকার কারণে তার দুনিয়া ও আখিরাত উভয়

জাহানে বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেল। এই ঘটনার পর ব্যথাতুর হৃদয়ে তিনি আল্লাহর একটি মূলনীতি ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারলেন :

'তুমি আল্লাহর জন্য দান করা থেকে বিরত থেকো না; নাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে দান করা থেকে বিরত থাকবেন।'

আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্বীকার

প্রসিদ্ধ তাবিয়ি কাতাদা বিন দিআমাহ সাদুসি ﵀ বলেন, 'যখন কোনো ব্যক্তি কোনো হারাম কাজ সম্পাদন করার সামর্থ্য রাখা সত্ত্বেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাআলা আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাকে এর চেয়ে উত্তম বদলা দান করেন।'[৩১১]

চলো, কয়েকটি হাদিসাংশ থেকে তাঁর কথার যথার্থতা জেনে নিই :

مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ

'সদাকা করলে সম্পদ কমে না।'[৩১২]

وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ، إِلَّا عِزًّا

'(প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও) কোনো বান্দা যদি ক্ষমা করে দেয়, তার বিনিময়ে আল্লাহ তার সম্মান বৃদ্ধি করেন।'[৩১৩]

مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هَمَّهُ... وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ

'যে ব্যক্তি আখিরাতকে তার ধ্যান-জ্ঞান বানিয়ে নেয়,... দুনিয়া না চাওয়া সত্ত্বেও তার হাতে এসে ধরা দেবে।'[৩১৪]

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ اللهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ

৩১১. জাম্মুল হাওয়া : পৃ. ২৪৫।
৩১২. আল-মুজামুল আওসাত : ২২৭০।
৩১৩. সহিহু মুসলিম : ২৫৮৮।
৩১৪. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৬৫।

'যে ব্যক্তি রাগ প্রয়োগের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা নিয়ন্ত্রণে রাখে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তাকে সকল মাখলুকের সামনে ডেকে এনে ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা বেছে নেওয়ার ইচ্ছাধিকার দান করবেন।'[৩১৫]

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ

'আল্লাহর জন্য যে বিনয় অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।'[৩১৬]

مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلّٰهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا

'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হয়ে বিলাসী পোশাক ত্যাগ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সকল মাখলুকের সামনে তাকে ডাকবেন এবং জান্নাতি পোশাকসমূহের মধ্য থেকে যেটা ইচ্ছা বেছে নেওয়ার অধিকার দান করবেন।'[৩১৭]

উপরিউক্ত সকল কথা নবিজি ﷺ-এর সহিহ অথবা হাসান হাদিসের অংশ। প্রতিটি হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির ওপর আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তাকে উত্তম বদলা দান করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে দুনিয়াতেও তার সাওয়াব দান করেন। এটি একটি ইমানি মূলনীতি, যার মূলভাব হচ্ছে :

'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দান করবেন।'

এটা এমন এক পাঠ, যা একজন গ্রাম্য সাহাবিকে রাসুল ﷺ হাত ধরে শিক্ষা দিয়েছেন। বলেছেন :

---

৩১৫. সুনানু আবি দাউদ : ৪৭৭৭।
৩১৬. আল-মুজামুল আওসাত : ৮৩০৭।
৩১৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৮১।

إِنَّكَ لَنْ تَدَعَ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللهِ إِلَّا أَعْطَاكَ اللهُ خَيْرًا مِنْهُ

> 'তুমি আল্লাহর ভয়ে যা-ই পরিত্যাগ করবে, বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার চেয়ে উত্তম বস্তু তোমাকে দান করবেন।'[৩১৮]

আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোনো কিছু ত্যাগ করার বিনিময়ে তিনি যে প্রতিদান দান করেন, ইবনুল কাইয়িম ﵀ সে প্রতিদানের প্রকারসমূহ বিশ্লেষণ করেছেন। অতঃপর সর্বোত্তম প্রকারটি চিহ্নিত করেছেন। বলেছেন, 'প্রতিদান বিভিন্ন ধরনের আছে। সেগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠতা ও ভালোবাসা, হৃদয়ের প্রশান্তি, শক্তি, প্রফুল্লতা, আনন্দ ও আল্লাহর সন্তুষ্টি।'[৩১৯]

প্রতিদানটা কলবে পাওয়াই সবচেয়ে ভালো। কারণ, কলবের প্রশান্তি ও আনন্দ শরীরের সুখ ও স্বাদের উৎস। সুফইয়ান বিন উয়াইনা ﵀ আব্দুল্লাহ বিন মারজুক ﵀-কে একটি বালুকাময় প্রান্তরে পেলেন, যে অবস্থায় তাঁর পাশে ছিল বিক্ষিপ্ত বালির টিলা। তাঁকে এ অবস্থায় দেখে সুফইয়ান ﵀ বললেন, 'হে আবু মুহাম্মাদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো কিছু পরিত্যাগ করে, তাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই বদলা দিয়ে দেন। তো আপনি যা ত্যাগ করেছেন, তার বিনিময়ে কী পেয়েছেন?' তিনি বললেন, 'আমি বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, তার প্রতি সন্তুষ্টি।'[৩২০]

---

৩১৮. মুসনাদু আহমাদ : ২০৭৩৯, হাদিসটি সহিহ। ৩৩ নং ফায়দা : যেকোনো ভালো কাজের প্রভাব তোমার পরবর্তী প্রজন্মের ওপর পড়বে। কেননা, আল্লাহর জন্য কোনোকিছু ত্যাগ করার বরকত পরবর্তী প্রজন্ম ভোগ করে। বর্ণিত আছে যে, খলিফা মুতাওয়াক্কিল একবার মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক বিন আবু শাওয়ারিব, আহমাদ বিন মিদাল, ইবরাহিম তাইমি ﵀-কে বসরা থেকে ডেকে এনে সেখানকার কাজি হওয়ার প্রস্তাব পেশ করলেন। কিন্তু মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিক বয়স বেশি হওয়ার অজুহাত দেখিয়ে প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। আহমাদ বিন মিদালও দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার কথা বলে অপারগতা প্রকাশ করলেন। ইবরাহিম তাইমিও প্রস্তাব নাকচ করেছিলেন; কিন্তু মুতাওয়াক্কিল তাকে বললেন, 'আপনি ছাড়া এখন আর কেউ বাকি নেই।' তাই একপ্রকার জোর করেই তাকে কাজি নিযুক্ত করলেন। ফলে আলিমদের কাছে ইবরাহিম তাইমির মর্যাদা হ্রাস পেল এবং বাকি দুজনের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। আবুল আলা বলেন, 'এরপর মানুষ দেখতে পেয়েছে, মুহাম্মাদ বিন আব্দুল মালিকের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার বরকত তার সন্তানদের মধ্যে কীভাবে উপচে পড়েছে। তার সন্তানদের মধ্য থেকে একে একে ২৪ জন কাজি হয়েছেন। তাদের মধ্য থেকে আট জন প্রধান কাজি হয়েছেন।' (তারিখু বাগদাদ : ৬/১৯৭)

৩১৯. আল-ফাওয়ায়িদ : পৃ. ১০৭।

৩২০. আজ-জুহদুল কাবির : ১/৩৩৭।

আল্লাহর এই নীতিসম্পর্কিত কোনো না কোনো ঘটনা আমাদের প্রত্যেকের সাথে ঘটেছে। স্মৃতির ডাইরির পাতা উল্টালে অবশ্যই তা চোখে পড়বে। ভবিষ্যতের দিগন্তে আলোর আগমন ঘটাতে হলে এসব অতীত ঘেঁটে দেখা জরুরি। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ﵀ যথার্থই বলেছেন, 'আল্লাহর জন্য যে কোনো কিছু বিসর্জন দিল, তার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহর ওপর।'[৩২১]

কেউ আল্লাহর জন্য ত্যাগ স্বীকার করল; কিন্তু আল্লাহ তার বিনিময় দান করেননি এবং যা ত্যাগ করেছে তার চেয়ে উত্তম বিনিময় দেননি—এমনটা হওয়া অসম্ভব। যদি তুমি মনে করো যে, তুমি প্রতিদান পাওনি, তাহলে নিজেকেই অভিযুক্ত করো এবং গভীর মনোনিবেশ নিয়ে চিন্তা করে দেখো, আসল সমস্যা কোথায়। কেননা, আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন অধিক দানশীল এবং তাঁর উদারতা অনেক ব্যাপক ও সর্বজনবিদিত।

এ জন্য খাওয়াস ﵀ বলেন, 'কেউ প্রবৃত্তির চাহিদা ছেড়ে দিল; কিন্তু অন্তরে তার প্রতিদান অনুভব করেনি, প্রবৃত্তির চাহিদা ত্যাগ করার দাবিতে সে মিথ্যুক।'[৩২২]

কথাটিকে আরও স্পষ্ট করে ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য নিজের প্রিয় জিনিস ও অভ্যাস পরিত্যাগ করলে মনের ভেতর কষ্ট অনুভব হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর জন্য তা পরিত্যাগ করে, সে প্রথম ধাক্কায় একটু কষ্ট অনুভব করলেও পরে আর অনুভব করে না। বস্তুত এর মাধ্যমে আল্লাহর জন্য ত্যাগ করার ক্ষেত্রে কে কতটা আন্তরিক তার

---

৩২১. কায়িদাহ ফিস সবর : পৃ. ৯৯।

৩২২. আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়্যা : পৃ. ২৮৭।

৩৫ নং ফায়দা : ইবনুল কাইয়িম ﵀ বলেন, 'বান্দা হারামে জড়িয়ে পড়ার পেছনে মোটাদাগে দুটি কারণ আছে। প্রথম কারণ : আল্লাহর ব্যাপারে সে বিরূপ ধারণা পোষণ করে যে, সে যদি আল্লাহর আনুগত্য করে এবং হারাম ত্যাগ করাকে প্রাধান্য দেয়, তাহলে এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে হালাল ও উত্তম বিনিময় দান করবেন না। দ্বিতীয় কারণ : সে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে উত্তম বিনিময়ে দেবেন; কিন্তু তার চাহিদা সবরের ওপর এবং প্রবৃত্তি বিবেকের ওপর বিজয়ী হয়ে যায়। প্রথম কারণটি জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এবং দ্বিতীয় কারণটি বিবেক-বুদ্ধি ও অন্তর্দৃষ্টি দুর্বল হওয়ার কারণে হয়ে থাকে।

পরীক্ষা করা হয়। এই সাময়িক কষ্টের ওপর যদি কেউ সবর করে, কিছুদিন যেতে না যেতেই এই কষ্টকেই তার কাছে সুখ মনে হয়।'[৩২৩]

যা আগে পাঠিয়ে দেবে, তা অবশ্যই পাবে

এটি একটি সুনির্দিষ্ট মূলনীতি। আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ-এর সাথে কী হয়েছে দেখো :

তিনি তার একটি গোলাম ৮০০ দিরহামের বিনিময়ে দোষমুক্তির নিশ্চয়তা দিয়ে[৩২৪] বিক্রি করলেন। অতঃপর ক্রেতা ইবনে উমর ﷺ-কে বললেন, 'গোলামের মধ্যে একটি রোগ আছে, যার কথা আপনি আমাকে বলেননি।' দুজনে উসমান বিন আফফান ﷺ-এর নিকট বিচার নিয়ে গেলেন। ক্রেতা বললেন, 'তিনি আমাকে একটি গোলাম বিক্রি করেছেন, গোলামের মধ্যে একটি রোগ আছে, যার ব্যাপারে তিনি আমাকে বলেননি।' আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ বললেন, 'আমি গোলামটিকে দোষমুক্তির নিশ্চয়তা দিয়ে বিক্রি করেছি।' এরপর উসমান ﷺ আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ-কে এই মর্মে শপথ করতে বললেন যে, তিনি গোলামটি বিক্রি করার সময় তাঁর জানামতে কোনো রোগ ছিল না। কিন্তু ইবনে উমর ﷺ শপথ করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং গোলামটি ফেরত নিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি গোলামটিকে ১৫০০ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলেন।[৩২৫]

তিনি চাইলে শপথ করে বিক্রয়চুক্তি বহাল রাখতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে তাঁর নামে শপথ করা থেকে বিরত থাকলেন এবং পণ্য ফেরত নিয়ে নিলেন। ফলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে দ্বিগুণ মুনাফা দান করলেন। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নাও এবং নিজের জীবনে তার প্রয়োগ ঘটাও। জেনে রাখো, আল্লাহর উদারতা ও দানশীলতা তোমার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি এবং উন্নত। তুমি হয়তো বলতে পারো, আমরা কি আর

---

৩২৩. আল-ফাওয়ায়িদ : ১/১০৭।

৩২৪. বিক্রয়-চুক্তির সময় ক্রেতা পণ্য ভালোভাবে দেখে নিশ্চিত হবে, পণ্যের মধ্যে কোনো দোষ নেই। এ ধরনের বিক্রয়-চুক্তির পর পণ্যের মধ্যে কোনো দোষ পাওয়া গেলে বিক্রেতা পণ্য ফেরত নিতে বাধ্য থাকে না। (-অনুবাদক)

৩২৫. মুয়াত্তা মালিক : ২/৩০৯।

সোনালি যুগের সালাফের মতো অতটা ত্যাগী হতে পারব নাকি? তাই তোমার জন্য সমসাময়িক একজন মনীষীর ঘটনা উল্লেখ করছি। এক দরিদ্র আজহারির ঘটনা। এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।

দরিদ্র আজহারি

বর্ণিত আছে যে, উচ্চ মিসরীয়[৩২৬] এক ছাত্র আজহারে পড়তে আসলো এবং একজন শাইখের দারসে বসে পাঠ আরম্ভ করল; কিন্তু বাড়ি থেকে তার খাওয়া-দাওয়ার খরচ পাঠাতে দেরি হলো। তাই সে ক্ষুধার তাড়নায় শাইখের দারস থেকে আলাদা হয়ে খাবারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। চলতে চলতে একটি সংকীর্ণ গলিতে প্রবেশ করল। সেখানে একটি খোলা দরজার ভেতর খাবারের স্তুপ দেখতে পেয়ে তা নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল। এক লুকমা মুখে রাখতেই তার মনে পড়ল, সে তো ইলম অর্জন করার জন্য এসেছে। ইলম হচ্ছে আলো আর এ খাবার থেকে মালিকের অনুমতি ছাড়া যা খাবে তা অন্তরের জন্য অন্ধকার হবে। আলো ও অন্ধকার এক জায়গায় একত্রিত হয় না। একটা আরেকটাকে তাড়িয়ে দেয়। এই ভেবে সে খাবার না খেয়েই শাইখের দারসে ফিরে আসলো। অথচ সে সময় তার ক্ষুধা কত মারাত্মক পর্যায়ের ছিল, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

দারস শেষে একজন মহিলা এসে শাইখের সাথে নিচু স্বরে কথা বললেন। উপস্থিত কেউই তার কথা শুনতে পায়নি। মহিলা চলে যাওয়ার পর শাইখ গরিব ছাত্রটিকে বললেন, 'বিয়ে করবে?' সে বলল, 'শাইখ কি আমার সাথে রসিকতা করছেন? ওয়াল্লাহি, গত তিনদিন থেকে আমার পেটে এক লুকমা খাবার যায়নি। এমন অবস্থায় আমি কীভাবে বিয়ে করব?' শাইখ বললেন, 'এই যে মহিলাটি এখানে এসেছিলেন, তার স্বামী গত হয়েছেন কিছুদিন আগে। মৃত্যুকালে তিনি একটি নেককার মেয়ে এবং অনেক ধন-সম্পদ রেখে গিয়েছেন। এখন তার মা চাইছেন একজন নেককার পুরুষের সাথে মেয়েটিকে বিয়ে দেবেন এবং ধন-সম্পদ তার হাতে দিয়ে দেবেন।' যুবক বলল, 'তাহলে ঠিক আছে।' এরপর

---

৩২৬. মিসরের দক্ষিণ ভাগ। দক্ষিণে নুবিয়া ও উত্তরে নিম্ন মিসরের মধ্যবর্তী নীলনদের দুই পার্শ্বস্থ এলাকা নিয়ে এই অঞ্চল গঠিত। (-অনুবাদক)

সবাই বেরিয়ে পড়ল। তার গন্তব্য ছিল ঠিক সেই ঘরটি, ইতিপূর্বে যে ঘর থেকে খাবার না খেয়ে যুবকটি চলে গিয়েছিল। ঘরটি দেখেই যুবক কেঁদে দিল। শাইখ বললেন, 'কাঁদছ কেন? এই বিয়েতে কি তুমি রাজি নও?' সে বলল, 'তা নয়: বরং একটু আগে ক্ষুধার তাড়নায় এই ঘরে ঠিক এই খাবার থেকে হারাম উপায়ে আমি খেতে যাচ্ছিলাম, পরে আল্লাহর ভয়ে তা পরিত্যাগ করেছি। এখন আল্লাহ তাআলা আমাকে হালাল উপায়ে সেই খাবার তো ফিরিয়ে দিয়েছেনই, সাথে আরও বড় পুরস্কার দান করেছেন!'

চেহারার নূর

কোনো ব্যক্তি যখন দুনিয়ার কোনো রাজার প্রতি নিবেদিত হয়, তখন তার মাঝে সেই রাজার প্রভাব স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি রাজাধিরাজের প্রতি নিবেদিত, তার মাঝে তো তাঁর প্রভাব আরও বেশি ফুটে উঠবে।

সৎকর্মশীলদের চেহারা চতুর্দশী চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল। ললাট তাদের সূর্যের চেয়ে আলোকিত।

হাসান বসরি ﷺ-কে বলা হলো, 'যারা রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে, তাদের চেহারা এত সুন্দর হয় কেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'কারণ তারা দয়াময় সত্তার সাথে একাকিত্বে সময় কাটায়; ফলে তিনি তাদের ওপর স্বীয় নুরের পোশাক পরিয়ে দেন।'[৩২৭]

কবি বলেন :

'আল্লাহর কিছু বান্দা আছে, যারা তাঁকে একনিষ্ঠভাবে ভালোবেসেছে। ফলে তাদের চেহারায় নুরের প্রলেপ লেগেছে। দুনিয়ার বিলাসিতা তারা পরিত্যাগ করেছে। বিনিময়ে তারা পেয়েছে মহামূল্য প্রতিদান। চোখের পানি ঝরিয়ে তারা প্রভুর সাথে প্রেমালাপ করে। চোখের পানিতে ধুয়ে তারা হয়ে গেল ঝকঝকে মুক্তোদানা।'

এরা সেই লোক, পুণ্যকর্মের বিনিময়ে যাদের চেহারা মৃত্যুর পূর্বেই দীপ্তিময় হয়ে উঠেছে এবং সিজদার মরূদ্যানে পাওয়া আল্লাহর নৈকট্যের নুরে নুরান্বিত হয়ে গেছে। যেন অন্ধকার যখন রাতের সাথে কোলাকুলি করে, তখন তারা চেহারাকে দিনের আলোয় আলোকিত করার পথ খুঁজে নেয়। অথচ সে সময়

৩২৭. আল-মুদহিশ, ইবনুল জাওজি : পৃ. ৫২৩।

অনেক মানুষ নিজেদের পাপ ও অপরাধের ময়লায় নিজেদের চেহারাকে কলুষিত ও বীভৎস করে, বাহ্যিকভাবে তার রং যতই সুন্দর হোক।

ইমাম তকিউদ্দিন আব্দুল গনি বিন আব্দুল ওয়াহিদ মাকদিসি ﷬-এর ব্যাপারে তুমি হয়তো শুনেছ। না শুনলে আমার কাছ থেকে শুনে নাও। ইমাম জাহাবি ﷬ তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, 'তিনি ছিলেন বিশালদেহী। তাঁর চেহারা থেকে যেন নুর ঠিকরে বের হতো।'[৩২৮]

'যেন সূর্য তাঁর ভেতর দিয়ে সৌন্দর্য হয়ে উদিত হয়েছে। কিংবা তাঁর মুখটাই যেন চতুর্দশীর চাঁদ।'

তাঁর নুরের রহস্য হলো, তিনি তাঁর সময়ের প্রতি খুব যত্নশীল ছিলেন। একটি ক্ষণও বেফায়দা অতিবাহিত হতে দিতেন না। ফজরের নামাজের পর কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং লোকদের কুরআন শোনাতেন। অনেক সময় মানুষকে শুনিয়ে একটি-দুটি হাদিসও পাঠ করতেন। তারপর উঠে অজু করতেন এবং জোহরের আগ পর্যন্ত সুরা ফাতিহা, নাস ও ফালাক দ্বারা ৩০০ রাকআত নামাজ পড়তেন। তারপর কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর জোহরের নামাজ আদায় করতেন। এরপর মাগরিব পর্যন্ত একনাগাড়ে হাদিস শোনানো ও অনুলিপির কাজে ব্যস্ত থাকতেন। যেদিন রোজা রাখতেন, সেদিন সূর্য ডোবার পর ইফতার করতেন। অন্যান্য দিন মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত নামাজ পড়তেন। ইশার নামাজের পর অর্ধরাত কিংবা অর্ধরাতের চেয়ে সামান্য বেশিক্ষণ পর্যন্ত ঘুমাতেন। অতঃপর ঘুম থেকে এমনভাবে উঠে যেতেন, যেন কোনো ব্যক্তি তাকে ডেকে দিয়েছে। অতঃপর অজু করে ফজর শুরু হওয়ার কাছাকাছি সময় পর্যন্ত নামাজ পড়তেন। নামাজের মাঝে মাঝে কয়েকবার অজু করতেন। অনেক সময় একরাতে সাত-আট বার অজু করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলতেন, 'শরীরের অঙ্গসমূহ ভিজা থাকলে নামাজ পড়তে আরাম লাগে।' এরপর ফজরের আগ পর্যন্ত অল্প সময়ের জন্য ঘুমাতেন। এটাই ছিল তাঁর দৈনন্দিন রুটিন।[৩২৯]

---

৩২৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২১/৪৪৬।
৩২৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২১/৪৫২-৪৫৩।

চিন্তা করে দেখো, তাঁর এত এত আমলের মধ্য থেকে কোন আমলটির বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে সেই নুর দান করেছেন। রাতজেগে নামাজ পড়া, কুরআন শিক্ষা দেওয়া, রোজা, অধিক অজু নাকি একসাথে সবগুলোর বিনিময়ে!?

হে ফকির বান্দা, দ্বীনের ব্যাপারে তোমার ভাইয়ের সাথে প্রতিযোগিতা করো। হতে পারে, তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি দয়া করবেন, যেভাবে তার প্রতি করেছেন। দ্বীনি বিষয়ে এক ভাই তোমার চেয়ে এগিয়ে গেছে; কিন্তু এর জন্য তোমার কোনো ঈর্ষা হচ্ছে না! কোথায় হারিয়ে ফেললে তোমার আত্মমর্যাদা? দুনিয়াকে নিয়েই কি তোমার সব ঈর্ষা ও আত্মমর্যাদাবোধ? তুমি কি তাহলে অনিত্য ও নশ্বর বস্তুর জন্য প্রতিযোগিতা করো? এই যদি হয় তোমার অবস্থা, তাহলে এখন থেকেই চেহারার নুর আনার জন্য আলো জ্বেলে দাও হে ভাই! এর জন্য কোন পথে চলতে হবে, সে পথ নিশ্চয় চিনে ফেলেছ এতক্ষণে।

নুরের দীপ্তি

ইবাদতের নুর স্থায়ী হওয়ার পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে বাড়তেও থাকে। এমনকি তার ঝলক চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছেয়ে যায়, যেভাবে ইতিপূর্বে কথা ও কাজে তার ঝলক ফুটে উঠেছিল। সুতরাং ভালো মানুষের চেহারায় যে দ্যুতি দেখা যায়, তা ইবাদতেরই নুরের আলোকচ্ছটা। ইবাদতগুজার বান্দা যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে, তখন সে ওহির আলোয় আলোকিত হয়, ইমানের দীপ্তিতে দীপ্তিমান হয়। ফলে তার চেহারায় এক অপার্থিব ঔজ্জ্বল্য ফুটে ওঠে। নবিজির চেহারায় নবুওয়াতের যে নুর ছিল, এই নুর সেই নুরেরই প্রতিবিম্ব। উম্মে মাবাদ খুজায়ি ﷺ নবিজির যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেখানে তিনি নবিজির চেহারার নুরের কথা বলেছেন। তাঁর স্বামী যখন তাকে বললেন, 'আমাকে তাঁর বর্ণনা দাও।' তখন তিনি বললেন :

'আমি স্পষ্ট উজ্জ্বলতার এবং লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী একজন সুপুরুষকে দেখেছি...।'[৩৩০]

ইবনে তাইমিয়া ﷺ অন্তর ও চেহারার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সংযোগের কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'অন্তরের মধ্যে যে আলো-অন্ধকার, কল্যাণ-অকল্যাণ থাকে, চোখ ও চেহারায় তা ছড়িয়ে পড়ে। অন্তরের সাথে এই দুই অঙ্গের সম্পর্ক বেশি।'[৩৩১]

একজন মুমিনই তার অন্তর্চক্ষু দিয়ে ইবাদতের এই ফসল ও নুর দেখতে পায়। ফলে সে এই গুপ্তধন ও মুগ্ধকর আলো কখনো হাতছাড়া হতে দেয় না। পুণ্যের বিনিময়ে পাপ করে আলোর বিনিময়ে অন্ধকার আনে না। বরং সে জনৈক মুমিন কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গায় :

'সৌন্দর্য ধরে রাখে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। নচেৎ তা হারিয়ে যায়। তাকওয়ার নুরই মানুষের চেহারায় লাবণ্য ও সৌন্দর্য আনে। আমল যদি সুন্দর না হয়, তাহলে চেহারায় বাহ্যিক সৌন্দর্য কোনো উপকার বয়ে আনে না। হে সুন্দর চেহারার অধিকারী, আল্লাহকে ভয় করো, যদি এই সৌন্দর্য চিরদিন ধরে রাখতে চাও। কারণ, তাকওয়া সুন্দরকে আরও সুন্দর করে তোলে। পক্ষান্তরে, গুনাহ সৌন্দর্যকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দেয়। পাপিষ্ঠের চেহারার দীপ্তি সরে গিয়ে বীভৎস হয়ে ওঠে। অতঃপর হৃদয়কেও পাল্টে দেয়। সুতরাং তাকওয়ার পথে ধাবিত হও। তখন তোমার আগামীটা সুখ ও আনন্দে ভরে উঠবে।'

---

৩৩০. দালায়িলুন নুবুওয়াহ, আবু নুআইম আস্ফাহানি : ১/২৩৭।

৩৩১. আল-ইসতিকামাহ : ১/৩৫৫। ৩৬ নং ফায়দা : বর্ণিত আছে যে, উমর বিন খাত্তাব ﷺ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারীকে শাস্তিস্বরূপ তার চেহারা কালো করে দেওয়ার এবং বাহনের ওপর উল্টো করে বেঁধে শাস্তি দিতেন। কেননা, শাস্তি গুনাহসম্পর্কিত একটি বিষয়। সুতরাং যেহেতু সে মিথ্যা বলার মাধ্যমে নিজের চেহারাকে কালো করেছে এবং কথাকে উল্টে দিয়েছে; তাই চেহারা কালো করে দেওয়া এবং বাহনের ওপর উল্টো করে বেঁধে দেওয়া হবে তার যথাযথ শাস্তি।

অনুগ্রহের বিনিময় অনুগ্রহই হয়

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

'অনুগ্রহের বদলা অনুগ্রহ ছাড়া কী হতে পারে?'[৩৩২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবু সাইদ খাজ্জার ﷺ বলতেন :

যে নিজের প্রবৃত্তি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, রবের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়াই তার পুরস্কার।

যে মাখলুকের সাথে অন্তরঙ্গতা ছিন্ন করেছে, বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের সাথে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হওয়াই তার পুরস্কার।

যে ধৈর্যের সাথে আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনে চলেছে, আল্লাহকে পাওয়াই তার পুরস্কার।

দুনিয়ার কষ্টের প্রতিদান আখিরাতের চিরশান্তি ছাড়া আর কী হতে পারে?

বিপদে যে সবর করেছে, আল্লাহর নৈকট্য ব্যতীত অন্যকিছু তার প্রতিদান হতে পারে না।[৩৩৩]

অধিক আমলের প্রতি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ কেমন আগ্রহী ছিলেন দেখুন। তিনি বলেন, 'এমন কোনো হাদিস আমি লিপিবদ্ধ করিনি, যে হাদিস অনুযায়ী আমি আমল করিনি। এমনকি আমার লিখিত একটি হাদিসে আছে, রাসুল ﷺ হিজামা করে আবু তাইবাকে এক দিনার দান করলেন। এ হাদিস

৩৩২. সুরা আর-রহমান, ৫৫ : ৬০।
৩৩৩. শুআবুল ইমান, আবু বকর বাইহাকি : ২/১৯।

অনুযায়ী আমল করার জন্য আমি হিজামা করিয়ে হিজামা থেরাপিস্টকে এক দিনার দিলাম।'[৩৩৪]

ইমাম আহমাদ ﵀ রাসুল ﷺ-এর প্রতিটি সুন্নাতের ওপর আমল করার প্রতি প্রলুব্ধ ছিলেন। শুধু সুন্নাত নয়; বরং তাঁর প্রতিটি সহজাত অভ্যাস অনুসরণের চেষ্টা করতেন তিনি। তাতে জীবনের ঝুঁকি থাকলেও।

ইবরাহিম বিন হানি ﵀ বলেন, আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ আমার কাছে তিনদিন আত্মগোপনে ছিলেন। তিনদিন পর তিনি আমাকে বললেন, 'আমার জন্য অন্য একটা জায়গা খুঁজে দেখো, আমি স্থানান্তরিত হব।' আমি বললাম, 'হে আবু আব্দুল্লাহ, এতে আপনার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে আমার ভয় হচ্ছে।' তিনি বললেন, 'নবিজি ﷺ গুহার মধ্যে তিনদিন আত্মগোপন করে ছিলেন। আমাদের উচিত হবে না যে, কেবল সুসময়ে আমার তাঁর সুন্নাহ মেনে চলব এবং কঠিন সময় তা ছেড়ে দেবো।'[৩৩৫]

'তাঁর ছিল সুউচ্চ মনোবল, যার উচ্চতার কোনো শেষ নেই। তাঁর সর্বনিম্ন সাহসিকতাটাও যুগের পরিধির চেয়ে বড় ছিল। তাঁর হাত ছিল উদার ও দানশীল। তাঁর উদারতার এক-দশমাংশও যদি ভূ-ভাগের কোনো অংশে রাখা হয়, তখন পৃথিবীর ভূ-ভাগ সাগরের চেয়ে উদার প্রমাণিত হবে।'

তাঁর কারামাত ও পুণ্যকর্মের ঝলক দেখুন :

ওয়ারকানি ﵀ বলেন, 'আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ যে রাতে ইনতিকাল করেন, সে রাতে বিশ হাজার ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অগ্নিউপাসক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। মুসলিম, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও অগ্নিউপাসক—সবাই তাঁকে হারানোর ব্যথায় মাতম করেছিল।'[৩৩৬]

ইবনুল জাওজি ﵀ বলেন, '৫৫৪ হিজরিতে বাগদাদে বন্যা হলে আমার সকল কিতাব বন্যার পানিতে ডুবে যায়। তবে আশ্চর্যজনকভাবে সেগুলো থেকে

---

৩৩৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২১৩।
৩৩৫. আল-আদাবুশ শারয়িয়্যাহ ওয়াল মিনাহিল মারয়িয়্যাহ : ২/২১।
৩৩৬. তারিখু বাগদাদ : ৫/১৮৮।

একটি খণ্ড অক্ষত থেকে যায়, যেটাতে ইমাম আহমাদ ﷺ-এর লিখিত দুটি পৃষ্ঠা ছিল।'[৩৩৭]

প্রধান বিচারপতি আলি বিন হাসান জাইনাবি ﷺ বলেন, 'একদা তাদের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। সেদিন ঘরে যত কিতাব ছিল, সব জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে একটি কিতাব রক্ষা পেয়ে যায়, যাতে ইমাম আহমাদ ﷺ-এর লিখিত একটি অংশ ছিল।'[৩৩৮]

শামসুদ্দিন জাহাবি ﷺ বলেন, '৭২০ হিজরির পরে বাগদাদে এক ভয়াবহ প্লাবন হয়। যে কবরস্থানে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ-এর কবর আছে, তার চতুষ্পার্শ্বে এক হাত পরিমাণ পানি উঠেছিল। অতঃপর আল্লাহর কুদরতে সে পানি থেমে যায় এবং ইমামের কবরের আশপাশের জমি প্লাবন থেকে সুরক্ষিত থাকে। বস্তুত এটা ছিল এক অলৌকিক ঘটনা।'[৩৩৯]

ফাতিমা বিনতে আহমাদ বিন হাম্বল ﷺ নিজ পিতা সম্পর্কে একটি আশ্চর্য ঘটনা বর্ণনা করেছেন :

আমার ভাই সালিহের ভাষায় আগুন লাগল। তিনি একটি সচ্ছল পরিবারের মেয়ে বিয়ে করেছিলেন। তারা তাকে প্রায় চার হাজার দিনার সমমূল্যের আসবাবপত্র হাদিয়া দিয়েছিল। সব আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সালিহ বলতে লাগলেন, 'যা কিছু হারিয়েছি কোনো কিছুর প্রতি আমার আফসোস নেই, তবে আমার পিতার একটি কাপড়ের জন্য আমার আফসোস হচ্ছে, যার ওপর তিনি নামাজ পড়তেন এবং তাঁর পরে বরকত লাভের জন্য আমিও নামাজ পড়তাম।' ফাতিমা বলেন, 'আগুন নিভে যাওয়ার পর লোকেরা বাড়িতে প্রবেশ করে দেখল, একটি খাটের ওপর কাপড়টি পড়ে আছে। তার আশপাশের সবকিছু জ্বলে ছাই হয়ে গেলেও কাপড়টি সম্পূর্ণ অক্ষত থেকে যায়।'[৩৪০]

---

৩৩৭. আল-আদাবুশ শারয়িয়্যাহ ওয়াল মিনাহিল মারয়িয়্যাহ : ২/১৩।
৩৩৮. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২৩০।
৩৩৯. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১১/২৩১।
৩৪০. আল-আদাবুশ শারয়িয়্যাহ ওয়াল মিনাহিল মারয়িয়্যাহ : ২/১২।

মাসব্যাপী বদদুআ

নেককার উজির ইয়াহইয়া বিন হুবাইরা ﷺ-এর কারামত ছিল একটি চমৎকার কারামত। তিনি আল্লাহর সাথে উত্তম আচরণ করেছেন। আল্লাহকে ভয় করেছেন এবং প্রজাদের প্রতি এমন ইনসাফ করেছেন যে, তাঁর চরিত্রকে মানুষ দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করে থাকে। বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের একটি প্রমাণ হলো, একদা তিনি কবুল হওয়ার দৃঢ় আশা নিয়ে এক মাস পর্যন্ত আল্লাহর কাছে একটি বিষয়ে দুআ করেছিলেন। সে দুআ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। ঘটনাটি ইবনুল জাওজি ﷺ বর্ণনা করেছেন :

যখন সুলতান মাসউদ সেলজুকি ও তাঁর অনুসারীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেল এবং তারা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করতে লাগল, তখন উজির ইয়াহইয়া বিন হুবাইরা এবং খলিফা মুকতাফি লি-আমরিল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা করলেন।

ইয়াহইয়া বলেন, 'অতঃপর আমি এ বিষয়টি নিয়ে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখলাম। বুঝতে পারলাম, সুলতানের যা দাপট, এই মুহূর্তে তাঁর বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে জড়ানো ঠিক হবে না। খফিলা মুকতাফির সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তাঁকে জানালাম, এ পরিস্থিতিতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করা এবং তাঁর ওপর পূর্ণরূপে ভরসা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আমার কথায় তিনি দ্বিমত করেননি। বললেন, আসলেই এর অন্য কোনো উপায় দেখছি না। অতঃপর আমি তাঁকে চিঠি লিখে জানালাম, রাসুল ﷺ রাল ও জিকওয়ান নামক দুই কবিলার জন্য মাসব্যাপী বদদুআ করেছিলেন। আমাদেরও তার জন্য মাসব্যাপী বদদুআ করতে হবে। খলিফা আমার প্রস্তাবে সম্মত হলেন।'

উজির বলেন, 'অতঃপর আমি প্রতিদিন রাতের শেষভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করতে শুরু করলাম। এভাবে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথেই মাসউদ মৃত্যুবরণ করলেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের দুআ কবুল করলেন এবং ইরাকের ওপর থেকে মাসউদ ও তার অনুসারীদের কালো হাত সরিয়ে দিলেন। এভাবে বিনা রক্তপাতে তাদের শাসিত ভূমির কর্তৃত্ব আল্লাহ তাআলা

আমাদের হাতে তুলে দিলেন। ঘটনাটি খলিফা ও উজিরের কারামত হিসেবে আলোচনা করা হয়।[৩৪১]

৩৪১. জাইলু তাবাকাতিল হানাবিলাহ : ১/১২৭-১২৮।

অধিক ফলদায়ক সৎকর্মসমূহ

ইবরাহিম বিন আলি মারসাদি ﷺ বলেন, 'আল্লাহকে তুমি চেনো, কিন্তু তাঁকে ভালোবাসো না; অথবা তাঁকে ভালোবাসো, কিন্তু তাঁর জিকির করো না; অথবা তাঁর জিকির করো, কিন্তু সে জিকিরে স্বাদ পাও না; অথবা জিকিরের স্বাদ পাও, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে ছাড়া অন্যকিছুতে মেতে থাকো—এমনটা হওয়া অসম্ভব।'[৩৪২]

আবু সুলাইমান দারানি ﷺ বলতেন, 'যে দিনের বেলা সৎকর্ম করে, তাকে রাতে সৎকর্ম করার তাওফিক দেওয়া হয়। অনুরূপভাবে যে রাতে সৎকর্ম করে, তাকে দিনে সৎকর্ম করার তাওফিক দেওয়া হয়।'[৩৪৩]

ভালো আমলের একটি উপকারিতা হচ্ছে, আমাদের মধ্যে কেউ যখন কোনো ভালো আমল করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে আরও একটি ভালো আমল করার তাওফিক দান করেন। সেই ভালো কাজ আরেকটি ভালো কাজকে টেনে আনে...এভাবে চলতে থাকে।

সুতরাং যদি তুমি রাতে কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) আদায় করার সুযোগ লাভ করতে চাও, তাহলে দিনের বেলায় দৃষ্টি নত রাখার ভালো কাজটি আগে করে নাও। যদি ফজরের নামাজের সাওয়াব অর্জন করতে আগ্রহী হও, তাহলে এর পূর্বে গোপনে সদাকা করার ভালো কাজটি সেরে নাও। যদি নামাজের মধ্যে খুশুখুজুর (একাগ্রতা ও বিনম্রতা) সাওয়াব লাভ করতে চাও, তাহলে সকাল সকাল মসজিদে চলে আসার ভালো কাজটি আগে করো।

---

৩৪২. শুআবুল ইমান : ২/১৮।
৩৪৩. সিফাতুস সাফওয়াহ : ২/৩৮৪।

জুবাইর বিন আওয়াম ﷺ ছিলেন একজন প্রকৃত আল্লাহওয়ালা বান্দা—যাঁর সৃষ্টি তো মাটি থেকে, তবে গঠিত হয়েছেন ইলমে ওহির নুর এবং কুরআনের মহত্ত্ব দ্বারা। তিনি তাঁর দীর্ঘ ইমানি জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি কথা বলেছেন। কথাটি এতটাই মূল্যবান যে, পারলে এটাকে গলায় ঝুলিয়ে রেখো। আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ-এর উদ্ধৃতিতে বাণীটি নিম্নরূপ :

'যখন তুমি কোনো মানুষকে কোনো উত্তম কাজ করতে দেখবে, তখন বুঝে নেবে, লোকটি এ ধরনের ভালো কাজ আরও অনেক করে। তেমনিভাবে কাউকে কোনো মন্দ কাজ করতে দেখলে বুঝে নেবে, সে এ ধরনের মন্দ কাজ আরও করে। কেননা, একটি ভালো কাজ তার মতো আরও অসংখ্য ভালো কাজের প্রমাণ বহন করে। অনুরূপভাবে একটি মন্দ কাজ তার মতো আরও অসংখ্য মন্দ কাজের অস্তিত্বের জানান দেয়।'[৩৪৪]

ইমাম ইবনুল কাইয়িম ﷺ আমাদের সামনে একটি উদাহরণ দিয়েছেন, যার সাহায্যে আমরা নিজেদের মনকে ভালো কাজ ও ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করতে পারি। তিনি বলেন, 'ইবাদতের সূচনা, ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা ও বৃদ্ধি পাওয়ার দৃষ্টান্ত হলো একটি খেজুরবিচি, যা রোপণ করা হয় অতঃপর ধীরে ধীরে সেটা গাছ হয়ে ওঠে। তারপর তুমি সেই গাছের ফল খাও এবং বিচি রোপণ করে দাও। সুতরাং যখনই তুমি একটি ভালো কাজ করবে, সে ভালো কাজের সাওয়াব অর্জন করার পাশাপাশি আরেকটি ভালো কাজের বীজ বপিত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে একটি পাপ আরেকটি পাপকে টেনে নিয়ে আসে। বুদ্ধিমানদের এ উদাহরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। উত্তম আমলের অন্যতম একটি উপকারিতা হচ্ছে, তার পরে আরও একটি উত্তম আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। একইভাবে মন্দ আমলের একটি অপকারিতা হচ্ছে, সেটি তার পরে আরেকটি মন্দ আমলকে টেনে আনে।'[৩৪৫]

আল্লাহর প্রকৃত বান্দাদের নেক আমলে ধারাবাহিকতা থাকে। তাদের সৎকর্মগুলো ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে বরকত তাদের কাছে এসে ভিড় জমায়। একপর্যায়ে তাদের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, ইবাদত-বন্দেগি তাদের

---

৩৪৪. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১/৩৪৯।

৩৪৫. আল-ফাওয়ায়িদ : পৃ. ৩৫, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ।

হৃদপিণ্ডের স্পন্দনে পরিণত হয়। অল্পক্ষণের জন্য ইবাদত বন্ধ থাকলে তাদের দম আটকে যায়। ইবাদত-বন্দেগিই হয় তাদের স্বভাব-প্রকৃতি। কোনো কারণে ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে এই প্রশস্ত পৃথিবী তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসে, যতক্ষণ না ইবাদতে ফিরে আসে।[৩৪৬]

নেক আমলে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফিকপ্রাপ্ত হওয়ার লক্ষণ। অনুগত বান্দা কোনো ভালো কাজ শুরু করলে তার প্রতিদানস্বরূপ আল্লাহ তাআলা যেসব পুরস্কার প্রদান করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, অপ্রত্যাশিতভাবে ভালো কাজ তোমার থেকে সংঘটিত হতে থাকবে এবং পাপ করার ইচ্ছা করা সত্ত্বেও তা থেকে তোমাকে বিরত রাখা হবে। সুসময়ে ও দুঃসময়ে আল্লাহর আশ্রয় নেওয়ার পথ তোমার জন্য সহজ হয়ে যাবে।[৩৪৭]

ধারাবাহিকতার রহস্য

ইবাদতে অটলতা ও ধারাবাহিকতার রহস্য হলো, যে ব্যক্তি এর প্রতি মনোযোগী হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে নানাভাবে সাহায্য করেন। তাঁর সাহায্যের একটি পন্থা হচ্ছে, ফেরেশতাদের মাধ্যমে সাহায্য করা। এটাই সবচেয়ে উত্তম সাহায্য। কারণ, ফেরেশতাগণ হলেন ইমানের যুদ্ধে শক্তিশালী সাহায্যকারী এবং আল্লাহর গোপন বাহিনী। তবে তাদের সহায়তা পাওয়ার জন্য শর্ত হলো, তোমাকে আগে সৎকর্ম শুরু করতে হবে।

বান্দার ইমানের তারতম্যভেদে তার প্রতি আল্লাহর সাহায্যের শক্তিও কমবেশি হয়। ইবনে তাইমিয়া ﷺ বলেন, 'আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন আসে ইমান অনুযায়ী। সুতরাং যার ইমান শক্তিশালী হয়, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সমর্থনে শক্তিশালী ফেরেশতা-বাহিনী প্রেরণ করা হয়। যার ইমান দুর্বল হয়, তার সাহায্যকারী ফেরেশতা-বাহিনীও তার ইমানের মতো দুর্বল হয়।'[৩৪৮]

---

৩৪৬. আল-জাওয়াবুল কাফি : পৃ. ৫৬, দারুল মারিফাহ।

৩৪৭. কুতুল কুলুব : ১/১১৫।

৩৪৮. আন-নাবওয়াত, ইবনে তাইমিয়া : ২/১০৬২।

আরেক জায়গায় তিনি পুণ্যকর্মের গুরুত্ব খুলে খুলে বর্ণনা করেছেন। শক্তিশালী ও উন্নত পুণ্যকর্ম করার পাশাপাশি অধিকহারে পুণ্যকর্ম করার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। বলেছেন, 'মানুষের পুণ্যকর্ম যখন শক্তিশালী হয়, তখন আল্লাহ তাআলা এমন শক্তিশালী ফেরেশতা-বাহিনী দ্বারা তার সমর্থন করেন, যারা শয়তানের ওপর বিজয় লাভ করেন। আর যদি পাপকর্ম শক্তিশালী হয়, তখন শয়তানের বাহিনী বিজয় ছিনিয়ে নেয়।'[৩৪৯]

এটা একটা যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তোমার বাহিনী ও সাহায্যকারীগণ তোমার বিজয়ের পথ রচনা করবে, যদি তারা শক্তিশালী হয়। তোমার আমল-ইবাদতই এ যুদ্ধের রসদ। ইবনুল কাইয়িম ﷺ-এর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতির সারকথা এটাই। তিনি বলেন, 'বান্দা যখনই তাঁর ইবাদতকে পূর্ণতার স্তরে নিয়ে যাবে, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সহযোগিতা লাভ করবে।'[৩৫০]

এমনকি যদি কখনো তার পদস্খলন হয় এবং গাফিল হয়ে কোনো গুনাহ করে বসে, তখনও আল্লাহ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। কারণ, আল্লাহর নিকট তার একটি মর্যাদা থাকে, যার কারণে আল্লাহ তাকে পৃথিবীতেই পাপের শাস্তি দিয়ে আখিরাতের জন্য সংশোধিত করে নেন।

ইবনুল কাইয়িম ﷺ বলেন, '...তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাকে—যে তাঁর কাছে সম্মানিত—সামান্য ভুলের জন্যও শাস্তি প্রদান করেন। ফলে সে সর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকে। পক্ষান্তরে যে বান্দা আল্লাহর কাছে ঘৃণিত, তার ও তার পাপের মাঝে আল্লাহ তাআলা অন্তরায় হন না। বরং সে যখনই নতুন কোনো গুনাহ করে, তখন আল্লাহ তাকে নতুন একটি নিয়ামত দানে ভূষিত করেন। তা দেখে সেই প্রবঞ্চিত বান্দাটি মনে করে যে, আল্লাহ তাকে ভালোবেসে এ নিয়ামত দান করেছেন। সে ঘুণাক্ষরেও ভাবে না যে, এটা মূলত তার প্রতি আল্লাহর অসম্মান ও অবজ্ঞার প্রদর্শন এবং এর মাধ্যমে তিনি তাকে কঠিন ও স্থায়ী আজাব দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন।'[৩৫১]

---

৩৪৯. আন-নাবওয়াত : ২/১০৬৩।

৩৫০. মাদারিজুস সালিকিন : ১/৯৭।

৩৫১. জাদুল মাআদ : ৩/৫০২।

হিদায়াতের মূল্য চেষ্টা ও সাধনা

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

'যারা আমার পথে জিহাদ করে (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়), তাদেরকে আমি অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।'[৩৫২]

সুদ্দি ﷺ-সহ আরও অনেক মুফাসসিরে কিরাম বলেন, 'এ আয়াত কিতাল ফরজ হওয়ার পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে।' সুতরাং এখানে 'জিহাদ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দ্বীনকে সাহায্য করা, বাতিলপন্থীদের প্রতিহত করা, জালিমদের মোকাবিলা করা, গাফিলদের পথ দেখানো এবং এসবের আগে, পরে ও পাশাপাশি অন্তরের সংযম ও সাধনা। আল্লাহ তাআলা এই জিহাদের পুরস্কারস্বরূপ হিদায়াত এবং হিদায়াতের ওপর অটলতা দান করেন। একাধিক মুফাসসিরের জবানিতে উল্লিখিত আয়াতের বিভিন্ন তাফসির (অর্থাৎ চেষ্টা ও সাধনার বিনিময়ে হিদায়াত লাভের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি) উল্লেখিত হয়েছে। নিচে কয়েকটি তুলে ধরা হলো :

- দারানি ﷺ-এর তাফসির : মৌলিক আমলসমূহ চেষ্টা ও সংযমের মাধ্যমে উত্তমরূপে আদায় করলে আমি আরও অধিক আমল করার তাওফিক দান করব।
- ফুজাইল ﷺ-এর তাফসির : যারা ইলম অর্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, আমি তাদের জন্য ইলম অনুযায়ী আমল করার ব্যবস্থা করে দেবো।
- সাহল ﷺ-এর তাফসির : যারা নববি পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রাম করবে, আমি তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করব।
- ইবনে আতা ﷺ-এর তাফসির : যারা আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে, আমি তাদেরকে আমার সন্তুষ্টিলাভের স্থান তথা জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেবো।

---

৩৫২. সূরা আল-আনকাবুত, ২৯ : ৬৯।

- ইবনে আব্বাস ﷺ-এর তাফসির : যারা আমার ইবাদতে চেষ্টা-সাধনা করে, আমি তাদেরকে আমার বিনিময় লাভ করার পথসমূহ দেখিয়ে দেবো।
- জুনাইদ ﷺ-এর তাফসির : যারা তাওবার মাধ্যমে চেষ্টা-সাধনা করে, আমি তাদেরকে ইখলাস ও নিষ্ঠা অর্জনের পথে পরিচালিত করব। অথবা যারা আমার সেবায় চেষ্টা-সাধনা করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার সাথে নিভৃতে আলাপের সৌভাগ্য অর্জনের পথে পরিচালিত করব।[৩৫৩]

আয়াত থেকে সূক্ষ্মভাবে একটি বিষয় বোঝা যায় যে, হিদায়াতের পন্থা কেবল একটি নয়; বরং কয়েকটি আছে। যেন আল্লাহর দিকে পৌঁছিয়ে দেওয়া পথসমূহ তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে এবং তার ওপর চলতে উদ্বুদ্ধ করছে। সুতরাং সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ জ্ঞান করো না। কারণ আল্লাহ তাআলা এতই দয়ালু যে, পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর বিনিময়ে এক পাপিষ্ঠ বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আরেক ব্যক্তিকে রাস্তা থেকে গাছের ডাল সরিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে ক্ষমা করেছিলেন। এভাবে দেখতে তুচ্ছ মনে হয়, এমন অনেক পুণ্যকর্মের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা অনেক বান্দাকে ক্ষমা করে দিয়ে থাকেন।

৩৫৩. তাফসিরুন নাসাফি (মাদারিকুত তানজিল ওয়া হাকায়িকুত তাওয়িল), দারুল কালিমিত তাইয়্যিব : ২/২৮৭।
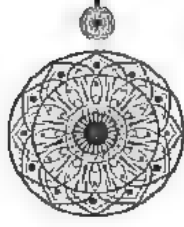
উত্তম পরিসমাপ্তি

সহিহ বুখারিতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ

'বস্তুত সকল কর্মের ফলাফল নির্ভর করে তার শেষ অবস্থার ওপর।'[৩৫৪]

ইবনে বাত্তাল ﷺ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দার আমলের শেষ অবস্থা কেমন হবে, তা গোপন রেখেছেন। এর পেছনে সূক্ষ্ম রহস্য আছে। তা হলো, কেউ যখন জানতে পারবে, তার সমাপ্তি ইমানের ওপর হবে, তখন তার মাঝে আত্মতৃপ্তি ও অলসতা বাসা বাঁধবে। অথবা যখন জানতে পারবে, তার পরিণতি হবে কুফরের ওপর, তখন তার নাফরমানি ও কুফরি আরও বেড়ে যাবে। তাই এ সম্পর্কিত জ্ঞানকে আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। কারও কাছে স্পষ্ট করেননি। যাতে বান্দারা ভয় ও আশার মাঝে থাকতে পারে। ফলে আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাও তার আমল নিয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভুগবে না এবং গুনাহগার বান্দাও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ থাকবে না। এতে প্রত্যেক বান্দার মাঝে বিনয়, নম্রতা ও আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা বিদ্যমান থাকবে।'[৩৫৫]

তবে পুণ্যকর্মের একটা বরকত হচ্ছে, তা তোমার পরিণামের আকৃতি তৈরি করে এবং সবার জন্য অবশ্যনির্ধারিত শেষযাত্রার চিত্র অঙ্কন করে। সুন্দর যাত্রা তার পথিকের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের শুভবার্তা দেয় এবং কুৎসিত যাত্রা তার পথিককে খারাপ গন্তব্যের দুঃসংবাদ শোনায়।[৩৫৬]

---

৩৫৪. সহিহুল বুখারি : ৬৬০৭।

৩৫৫. শারহু সহিহিল বুখারি, ইবনু বাত্তাল : ১০/২০৩-২০৪, মাকতাবাতু ইবনি রুশদ।

৩৫৬. ৩৭ নং ফায়দা : আবু মাসউদ আনসারি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'মৃত্যুর সময় হুজাইফা ﷺ কী বলেছেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'ভোররাত শুরু হলে তিনি বললেন, "আমি সেই সকাল থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই, যে সকাল আমাকে জাহান্নামে উপনীত করবে (কথাটি তিনবার বললেন)।"' অতঃপর বললেন, "আমার জন্য একজোড়া সাদা কাপড় কিনে আনো। কারণ, তা আমার গায়ে কিছুক্ষণের জন্যই রাখা হবে। এরপর হয়তো তার চেয়ে উত্তম জোড়া দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে

মরণোন্মুখ ব্যক্তির চারটি অবস্থা থেকে তার সমাপ্তির উত্তমত্ব কিংবা মন্দত্ব প্রকাশ পায় :

অন্তরের অবস্থা

মৃত্যুর সময় সে কি আল্লাহর সাক্ষাৎলাভের প্রতি অধীর আগ্রহী, না তাঁর থেকে দূরে থাকতে চাইছে? মৃত্যুর সময় সে কি তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, না দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে?

শরীরের অবস্থা

মৃত্যুর ফেরেশতা যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, তখন সে কি ইহরামরত কিংবা নামাজে দাঁড়ানো অথবা সিজদায় অবনত ছিল? কোনো ইবাদত শেষ করার পরপরই কি তার প্রাণ শরীর ত্যাগ করেছে? মৃত্যুর সময় তার দৃষ্টি কি কুরআনের পাতায় বিচরণ করছিল, না কোনো অশ্লীল ছবির ওপর নিবদ্ধ ছিল? মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তার জবান কি তাওহিদের কালিমা উচ্চারণ করতে পেরেছে, না তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে?

মৃত্যুবরণের স্থান

যে মাটির ওপর বান্দার মৃত্যু হয়, সে মাটি হয় তার পক্ষে সাক্ষী দেয় অথবা তার বিপক্ষে সাক্ষী দেয়। তার মৃত্যু কি কোনো মসজিদে হয়েছে, না কোনো মদ্যশালায়? যে পথে তার মৃত্যু হয়েছে, তা পুণ্যের পথ ছিল নাকি পাপের? মৃত্যুর সময় সে কি সৎ লোকদের সাথে ছিল, না অসৎ লোকদের?

অথবা মন্দ জোড়া দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে। (সিয়ারু আলামিন নুবালা : ২/৩৬৮)

মৃত্যুর সময়

তার মৃত্যুর দিনটি কী ছিল? তার মৃত্যু কি জুমআবার দিনে বা রাতে হয়েছে?[৩৫৭] কোনো বরকতময় সময়ে কি তাকে দাফন করা হয়েছে? কিংবা জুমআবারের দুআ কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্ত অথবা এ ধরনের অন্য কোনো মুহূর্তে কি তার দাফন সম্পন্ন হয়েছে?

সুতরাং রবের সাথে মিলিত হওয়ার যাত্রা যার শুভ হবে এবং উল্লিখিত চারটি শুভলক্ষণের কোনো একটি অর্জিত হবে, সেটা তার মৃত্যুপরবর্তী জীবন মূল্যবান পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার এবং স্থায়ী সুখ-শান্তির ঠিকানা হওয়ার সুসংবাদ। তবে কারও শেষযাত্রা অশুভ হওয়া মানে পরবর্তী জীবন মন্দ হওয়া নয়। কারণ অনেক সময় তার ভাগ্যে দয়ালু প্রতিপালকের রহমত ও ক্ষমা নসিব হয়। তার আমলের কারণে পাকড়াও হয়ে শাস্তি ভোগ করার সম্ভাবনাও থাকে। বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহর হাতে।

আবু জাফর তাসতুরি ﵀ বলেন, আমরা আবু জুরআ রাজি ﵀-এর নিকট গেলাম। তখন তাঁর মরণাপন্ন অবস্থা। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন একদল উলামায়ে কিরাম। তারা তাঁকে কালিমার তালকিন[৩৫৮] (মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিকে শুনিয়ে শুনিয়ে কালিমা পাঠ করা) করাতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর মতো বিদগ্ধ মুহাদ্দিসকে কালিমা তালকিন করানোর ব্যাপারে তারা লজ্জা ও ভয় অনুভব করতে লাগলেন। তাই তারা তালকিন-সম্পর্কিত হাদিস নিয়ে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে হিসেবে একজন আলিম হাদিস বর্ণনা করতে শুরু করলেন, 'আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন জাহহাক বিন মুখাল্লাদ আব্দুল হামিদ থেকে, তিনি জাফর থেকে, তিনি সালিহ থেকে...' লোকটি শেষ করার পূর্বেই আবু

৩৫৭. ৩৮ নং ফায়দা : জুমআর দিনে অথবা রাতে মৃত্যুবরণ করার ফজিলত সম্পর্কে রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

'প্রত্যেক মুসলিম যার মৃত্যু জুমআর দিনে অথবা রাতে হবে, আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের ফিতনা (আজাব) থেকে নিরাপদ রাখবেন।' (আব্দুল্লাহ বিন আমর ﵄ থেকে বর্ণিত। মুসনাদু আহমাদ : ৬৫৮২, সুনানুত তিরমিজি : ১০৭৪, হাদিসটি হাসান)

৩৫৮. তালকিন করার ব্যাপারে হাদিসে এসেছে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন :

'তোমরা তোমাদের মৃতদের (মৃত্যুপথযাত্রীদের) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"-এর তালকিন করাও।' (সহিহু মুসলিম : ৯১৬)

জুরআ ﷺ মরণাপন্ন অবস্থাতেই বলতে শুরু করলেন, 'আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন বুন্দার, বুন্দারকে আবু আসিম, তাঁকে আব্দুল হামিদ বিন জাফর, তাঁকে ইবনে আবি আরিব, তিনি কুসাইর বিন মুররাহ হাজরামি থেকে, তিনি মুআজ বিন জাবাল ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, (مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ...) 'যার সর্বশেষ কথা হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ..."[৩৫৯] এতটুকু পড়ে হাদিসের বাকি অংশ (دَخَلَ الْجَنَّةَ) 'সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' বলার পূর্বেই আবু জুরআ ﷺ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

মৃত্যুর সময় চোখ থেকে পার্থিব আবরণ সরে যাওয়ার পর অনেক নেককার লোক এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেছেন, যা সাধারণত আমরা দেখতে পাই না। শাইখুল ইসলাম আবুল ফাতহ নাসর বিন ইবরাহিম নাবুলুসি ﷺ থেকে এ ধরনেরই একটি ঘটনা বর্ণিত আছে : তাঁর মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্বে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'হে শ্রদ্ধেয়, আমাকে কিছুটা সময় দিন। আপনি যেমন (আমার প্রাণ কবজ করার জন্য) আদিষ্ট, তেমনই আমিও অন্য একটি বিষয়ে (সালাত আদায় করার জন্য) আদিষ্ট!' ঠিক তখনই মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আসরের আজান শোনা গেল। খাদিম তাঁকে বললেন, 'শাইখ, আজান হচ্ছে...' তিনি বললেন, 'আমাকে বসাও।' খাদিম নির্দেশ পালন করলেন। অতঃপর তিনি তাকবিরে তাহরিমা বলে হাত বাঁধলেন এবং সালাত সমাপ্ত করলেন। সালাত শেষ করার পরপরই তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।[৩৬০]

---

৩৫৯. শুআবুল ইমান : ৮৮০০, হাদিসটি সহিহ।
৩৯ নং ফায়দা : ফাতহুল বারি গ্রন্থে হাফিজ ইবনু হাজার আসকালানি ﷺ বলেন, এই হাদিস এবং এ ধরনের অন্যান্য হাদিসে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার অর্থ হলো শাহাদাতের কালিমাদ্বয় অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পুরোটা বলা। তাই রিসালাতের কালিমা বাদ দেওয়া মর্মে কোনো আপত্তি আসবে না। জাইন বিন মুনির ﷺ বলেন, সাধারণত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে পুরো কালিমায়ে শাহাদাতকেই বোঝানো হয়। (আওনুল মাবুদ : ৭/১০০)

৩৬০. সিয়ারু আলামিন নুবালা : ১৯/১৪৩।
৪০ নং ফায়দা : মৃত্যুর সময় নেককারদের প্রতি ফেরেশতাদের এমনই আন্তরিকতা থাকে। পক্ষান্তরে, যারা বদকার, ফেরেশতাগণ তাদের সাথে খুব রূঢ় আচরণ করেন। তাদের ও তাওবার মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। আল্লাহর শত্রু ফিরআওনের সাথে কী হয়েছিল, তা হাদিস থেকেই শুনুন : আল্লাহ তাআলা যখন ফিরআওনকে ডুবিয়ে দিলেন, তখন সে বলল, 'আমি বিশ্বাস স্থাপন করেছি যে, সেই সত্তা ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যে সত্তার ওপর বনি ইসরাইল বিশ্বাস স্থাপন করেছে। জিবরিল বলেন, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি যদি আমাকে সে সময় দেখতেন, যখন আমি সমুদ্র থেকে কালো কাদামাটি তুলে তার মুখে ঢুকিয়ে দিচ্ছিলাম; যাতে আল্লাহর রহমত তাকে আবৃত করে না নেয়।' (সুনানুত তিরমিজি : ৩১০৭, হাদিসটি সহিহ)

সংশয় নিরসন

নিচের হাদিসটি পড়ো :

وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ

'...অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতবাসীদের আমল করতে থাকে, এমনকি তার ও জান্নাতের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব থাকে, এমন সময় তার তাকদিরের লিখন তার ওপর বিজয়ী হয়; ফলে সে জাহান্নামিদের কাজ করতে থাকে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে।...'[৩৬১]

অবাক করে দেওয়ার মতো কথা, তাই না? এক ব্যক্তি ষাট বছর আল্লাহর ইবাদত করল; অথচ আল্লাহ তাআলা কিনা তার পরিণাম মন্দ করবেন? এক ব্যক্তি সারাজীবন জান্নাতিদের আমল করল; অথচ তার ঠিকানা হবে কিনা জাহান্নামে? এর পেছনের রহস্য ফুটে ওঠে অন্য একটি হাদিসে। হাদিসটি নিম্নরূপ :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجَنَّةِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ

'...মানুষের বাহ্যিক বিচারে অনেক সময় কোনো মানুষ জান্নাতবাসীদের মতো আমল করতে থাকে, আসলে সে জাহান্নামি হয়। অনুরূপভাবে মানুষের বাহ্যিক বিচারে কোনো মানুষ জাহান্নামবাসীদের মতো আমল করলেও প্রকৃতপক্ষে সে জান্নাতি হয়।'[৩৬২]

৩৬১. সহিহুল বুখারি : ৩৩৩২, সহিহু মুসলিম : ২৬৪৩, ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত।
৩৬২. সহিহুল বুখারি : ২৮৯৮, সহিহু মুসলিম : ১১২, সাহল বিন সাদ ﷺ থেকে বর্ণিত।

এই হাদিস থেকে বোঝা যায়, কোনো ব্যক্তি আজীবন জান্নাতিদের আমল করেও জাহান্নামি হওয়ার কারণ হচ্ছে, অন্তরের কপটতা ও পেটের নাড়িভুঁড়িতে লুকিয়ে থাকা রিয়া ও আত্মপ্রদর্শন। সারাজীবন সে যত আমল করেছে, একটাও নিরঙ্কুশভাবে আল্লাহর জন্য ছিল না; বরং লোকদেখানো ও মানুষের বাহবা কুড়ানোই তার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং প্রথমোক্ত হাদিস পড়ে আল্লাহর প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করার কোনোই সুযোগ নেই। তাঁর উদারতা ও বদান্যতার কোনো সীমা নেই। তাই বান্দার নিষ্ঠাপূর্ণ সৎকর্মের প্রতিদান তিনি শাস্তির মাধ্যমে দেবেন—এমনটি হতেই পারে না। কীভাবেই বা হবে? তিনি তো সেই মহান সত্তা, যিনি অল্প আমলের বিশাল প্রতিদান দেন, অধিকহারে পাপরাশি ক্ষমা করেন এবং কারও উত্তম আমলের সাওয়াব বিনষ্ট করেন না; বরং অসংখ্য-অগণিত গুণ সাওয়াব দান করেন।

সৎ বান্দা তার প্রতিপালকের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করে। আল্লাহ তাআলা যে প্রতিদানের ওয়াদা দিয়েছেন, তার আশায় আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে। শুধু তা-ই নয়; বরং এ সুসংবাদ তার আশাপাশের লোকদের মাঝেও ছড়িয়ে দেয়। তাদের মাঝে আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা জাগ্রত করে। কবি রাফিয়ি বলেন :

'যখন মাটি হবে আমার বিছানা এবং আমি চলে যাব দয়াবান প্রভুর সান্নিধ্যে। আমাকে তখন অভিনন্দন জানিয়ো বন্ধুরা। আর বোলো, সুসংবাদ তোমার জন্য! কারণ তুমি এক মহান দানশীল সত্তার মেহমান হয়েছ।'

দুটি চমৎকার পরিসমাপ্তি

বেশি দূরের নয়; বরং নিকট অতীতের দুজন ব্যক্তির চমৎকার পরিসমাপ্তির ঘটনা শোনাচ্ছি :

প্রথম ঘটনাটি মিসরের প্রখ্যাত বক্তা ও মিম্বরযোদ্ধা আব্দুল হামিদ কাশাকের। তিনি দুআর মধ্যে প্রায় সময় বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে ইমাম হিসেবে জীবিত রাখুন এবং ইমাম অবস্থায় আমার মৃত্যু করুন। রাব্বুল আলামিন, কিয়ামতের দিন আপনার উদ্দেশে সিজদাবনত অবস্থায় আমার হাশর করুন।'

১৯৯৬ ইসায়ির ৬ ডিসেম্বর। জুমআবার। তিনি বাড়িতে জুমআর সালাতের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এবং মসজিদে ফরজ আদায় করতে যাওয়ার পূর্বে বাড়িতে নফল পড়ছিলেন। যখন সালাতের দ্বিতীয় সিজদার জন্য কপাল মাটিতে ঠেকালেন, সেখান থেকে আর মাথা ওঠালেন না। সেই সিজদাতেই চলে গেলেন প্রেমময় প্রভুর সান্নিধ্যে। যেভাবে কামনা করতেন সেভাবেই পরিসমাপ্তি হলো জীবনের। যেন আল্লাহ তাআলা তাঁকে জীবন নামক পাঠশালায় অনন্য কৃতিত্ব লাভের ফলস্বরূপ নতুন একটি জীবন দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। যে জীবনে নেই কোনো কষ্ট ও ক্লান্তি; নেই কোনো ধরনের অন্যায়-অবিচার ও চিন্তা-পেরেশানি। বান্দা আল্লাহর কাছে আবদার করল, আর আল্লাহ তার আবদার পূরণ করলেন! বান্দা কসম দিয়ে আল্লাহর কাছে কিছু চাইল, আর তিনি ঠিক ঠিক দিয়ে দিলেন! কী মধুর এই চাওয়া! কত মধুর এই পাওয়া!

দ্বিতীয় ঘটনাটি ফিলিস্তিনের শাইখ আহমাদ ইয়াসিনের। আমি যখন গাজায় গেলাম, তখন শাইখুল মুজাহিদিন আহমাদ ইয়াসিন ﷬-এর ভাইদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। তারা আমাকে জানালেন যে, শাইখের শাহাদাতের কিছুদিন পূর্বে ডাক্তার তাদের বলেছিলেন, শাইখের স্বাস্থ্যের অবস্থা সংকটাপন্ন এবং অল্প কদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু আল্লাহর কী অনুগ্রহ! তিনি তাঁকে হৃদযন্ত্র-বিষয়ক জটিলতা এবং দুরারোগ্যব্যাধিতে ধুঁকেধুঁকে মারা যাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করালেন! শত্রুর ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে তিনি শহিদ হলেন। এভাবে শাইখ ভিন্ন একটি জায়গায় অমরত্ব লাভ করলেন। আমরা এক ধরনের চিন্তা করি; কিন্তু আল্লাহর

ফয়সালা হয় আরেক ধরনের। কী উত্তম হয় সেই ফয়সালা! কবি মুআররি এর যথাযথ চিত্রায়ণ করেছেন :

'আসলে মানুষকে চিরস্থায়ীভাবে বেঁচে থাকার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কিছু মানুষ ভুল বুঝেছে। তারা মনে করেছে, মৃত্যুই মানুষের শেষ ঠিকানা। অথচ মৃত্যু মানে হলো, আমলের জগৎ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য অথবা সৌভাগ্যের জগতে চলে যাওয়া।'

মারিফাত বা আল্লাহর পরিচয় ব্যতীত প্রকৃত আশা হয় না। যে তার রবকে চিনে না, সে আশার আলো দেখতে পায় না। ফলে রবের প্রতি নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে সে। (প্রিয় পাঠক) এ বই তোমার সামনে আশার অদৃশ্য আলোকে দৃশ্যমান করবে। সে আলোয় তুমি দেখতে পাবে আল্লাহর অশেষ দয়া ও মেহেরবানি। অনুভব করবে তাঁর ভালোবাসা ও উদারতার বিশালতা। এ বইয়ে তুমি পড়বে বাস্তব জীবনের অনেক গল্প, সৎকর্মশীল মানুষের সাক্ষ্য, পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা। এমনকি সমসাময়িক কিংবা নিকট অতীতের অনেকের জীবনের অভিজ্ঞতাও তুমি পড়বে এ বইয়ে। তাদের গল্প ও অভিজ্ঞতা তোমাকে আল্লাহর ভালোবাসার মিষ্টতা অনুভব করাবে। বাতলে দেবে শান্তি ও সুখের ঠিকানা...